স্বামি-শিষ্য-সংবাদ

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী

পূর্ব্ব কাণ্ড

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা

নিবেদন

'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' প্রকাশিত হইল। দেশ, সমাজ, আচার, নীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি যেসকল বিষয়ের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অনুধাবন এবং মীমাংসা করিতে যাইয়া মানব-মন সন্দেহে দোলায়মান হইয়া দিঙ্ নির্ণয়ে অক্ষম হয়, তত্তদ্বিষয় সম্বন্ধে পূজ্যপাদাচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীজীর অলৌকিক দূরদৃষ্টি এবং অসাধারণ বহুদর্শিতা তাঁহাকে কি মীমাংসায় উপনীত করাইয়াছিল, গ্রন্থকার এই পুস্তকে তাহারই কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার প্রযত্ন করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, যে শক্তিমান্ পুরুষের অদ্ভুত প্রতিভা এবং দিব্য চরিত্রবলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য, উভয় জগতের মনীষিগণই স্তম্ভিত হইয়া অনতিকাল-পূর্ব্বে তাঁহাকে উচ্চাসন প্রদান করিয়াছিলেন, সেই মহামহিম স্বামী শ্রীবিবেকানন্দ লোকচক্ষুর অন্তরালে, মঠে সর্ব্বদা কিরূপ উচ্চভাবে কালক্ষেপ করিতেন, কিরূপ স্নেহে তাঁহার শিষ্যবর্গকে সর্ব্বদা শিক্ষা-দীক্ষাদি প্রদান করিতেন, নিজ গুরুভ্রাতৃগণকে কিরূপ উচ্চ সম্মান প্রদান করিতেন এবং সর্ব্বোপরি নিজ গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে জীবনে-মরণে কিরূপ ভাবে অনুসরণ করিতেন, মধ্যে মধ্যে তদ্বিষয়ের রিচয়ও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রদান করা হইয়াছে। আবার স্বামীজীর মতামত লিপিবদ্ধ করিতে অগ্রসর হইবার গুরুতর দায়িত্ব অনুভব করিয়া গ্রন্থকার পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত, স্বামীজীর বেলুড়-মঠস্থ গুরুভ্রাতৃগণের দ্বারা সংশোধিত করাইয়া লইয়াছেন। গ্রন্থনিবদ্ধ বিষয়সকলের স্থানকালাদির নির্ণয়ও যথাসাধ্য বিভাগ করিয়া পুস্তকখানিকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আবার

গ্রন্থখানির আদিতে সমগ্র পুস্তকের বিস্তৃত সূচীপত্র এবং গ্রন্থমধ্যস্থ প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রারম্ভে তত্তদধ্যায়-নির্ণীত বিষয়সকলের বিস্তারিত বিবরণ দিয়া গ্রন্থনিবদ্ধ প্রত্যেক বিষয় সহজে ধরিবার পক্ষে পাঠকের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব গ্রন্থ-খানিকে সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ করিবার যে বিশেষ যত্ন করা হইয়াছে, ইহা বলা বাহুল্য। পরিশেষে এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, গ্রন্থকার পুস্তক-খানির সমুদয় স্বত্ব, বেলুড়-মঠের অধ্যক্ষের হস্তে শ্রীবিবেকানন্দের ঐ মঠস্থ স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণকল্পে নিজ গুরুভক্তি-নিদর্শনস্বরূপ প্রদান করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। অলমিতি—

বিনীত নিবেদক—

শ্রীসারদানন্দ

সূচীপত্র

পূর্ব্ব কাণ্ড

কাল—১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ

গ্রন্থখানির আদিতে সমগ্র পুস্তকের বিস্তৃত সূচীপত্র এবং গ্রন্থমধ্যস্থ প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রারম্ভে তত্তদধ্যায়-নির্ণীত বিষয়সকলের বিস্তারিত বিবরণ দিয়া গ্রন্থনিবদ্ধ প্রত্যেক বিষয় সহজে ধরিবার পক্ষে পাঠকের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব গ্রন্থখানিকে সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ করিবার যে বিশেষ যত্ন করা হইয়াছে, ইহা বলা বাহুল্য। পরিশেষে এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, গ্রন্থকার পুস্তকখানির সমুদয় স্বত্ব, বেলুড়-মঠের অধ্যক্ষের হস্তে শ্রীবিবেকানন্দের ঐ মঠস্থ স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণকল্পে নিজ গুরুভক্তি-নিদর্শনস্বরূপ প্রদান করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। অলমিতি—

বিনীত নিবেদক—

শ্রীসারদানন্দ

সূচীপত্র

পূর্ব্ব কাণ্ড

কাল—১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ

প্রথম বল্লী

প্রথম দর্শন

স্থান—কলিকাতা, ৺প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাটী, বাগবাজার

স্বামীজীর সহিত শিষ্যের প্রথম পরিচয়—'মিরর্‌-সম্পাদক শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেনের সহিত আলাপন—ইংলণ্ড ও আমেরিকার তুলনায় আলোচনা—ভারতবাসী কর্ত্তৃক পাশ্চাত্ত্যে ধর্ম্মপ্রচারের ভবিষ্যৎ ফল—ধর্ম্ম ও রাজনীতি-চর্চ্চার মধ্যে কোন্‌টির দ্বারা ভারতের ভাবী কল্যাণ—গোরক্ষাপ্রচারকের সহিত আলাপ—মানুষরক্ষা অগ্রে কর্ত্তব্য।

তিন-চারি দিন হইল স্বামীজী প্রথমবার বিলাত হইতে ভারতে ফিরিবার পর কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াছেন। বহুকাল পরে তাঁহার পুণ্যদর্শন লাভ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তদিগের এখন আর আনন্দের অবধি নাই। তাঁহাদিগের মধ্যে সঙ্গতিপন্নেরা আবার এখন নিজ নিজ বাটীতে স্বামীজীকে সাদর নিমন্ত্রণ করিয়া আপনা-দিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন। আজ মধ্যাহ্নে বাগবাজারের রাজবল্লভপাড়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে স্বামীজীর নিমন্ত্রণ। সংবাদ পাইয়া বহু ভক্ত আজ তাঁহার বাড়ীতে সমাগত হইতেছেন। শিষ্যও লোকমুখে সংবাদ পাইয়া মুখুয্যে মহাশয়ের বাড়ীতে বেলা প্রায় ২॥০টার সময় উপস্থিত হইল। স্বামীজীর সঙ্গে শিষ্যের এখনও আলাপ হয় নাই। শিষ্যের জীবনে স্বামীজীর দর্শনলাভ এই প্রথম।

শিষ্য উপস্থিত হইবামাত্র স্বামী তুরীয়ানন্দ তাহাকে স্বামীজীর নিকটে লইয়া যাইয়া পরিচয় করাইয়া দিলেন। স্বামীজী মঠে আসিয়া শিষ্যরচিত একটি 'শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্র' পাঠ করিয়া ইতঃপূর্ব্বেই তাহার বিষয় শুনিয়াছিলেন; শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তগরিষ্ঠ নাগ মহাশয়ের কাছে তাহার যে যাতায়াত আছে—ইহাও স্বামীজী জানিয়াছিলেন।

শিষ্য স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলে স্বামীজী তাহাকে সংস্কৃতে সম্ভাষণ করিয়া নাগ মহাশয়ের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহার অমানুষিক ত্যাগ, উদ্দাম, ভগবদনুরাগ ও দীনতার বিষয় উল্লেখ করিতে করিতে বলিলেন—"বয়ং তত্ত্বান্বেষাৎ হতাঃ মধুকর ত্বং খলু কৃতী"—(অভিজ্ঞানশকুন্তলম্)। কথাগুলি নাগ মহাশয়কে লিখিয়া জানাইতে শিষ্যকে আদেশ করিলেন। পরে বহু লোকের ভিড়ে আলাপ করিবার সুবিধা হইতেছে না দেখিয়া, তাহাকে ও স্বামী তুরীয়ানন্দকে পশ্চিমের ছোট ঘরে ডাকিয়া লইয়া যাইয়া শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া 'বিবেকচূড়ামণি'র এই কথাগুলি বলিতে লাগিলেন—

"মা ভৈষ্ট বিদ্বন্ তব নাস্ত্যপায়ঃ
সংসারসিন্ধোস্তরণেঽস্ত্যুপায়ঃ।
যেনৈব যাতা যতয়োঽস্য পারং
তমেব মার্গং তব নির্দিশামি॥"

—"হে বিদ্বন! ভয় করিও না, তোমার বিনাশ নাই; সংসার-সাগর-পারের উপায় আছে। যাহা অবলম্বন করিয়া শুদ্ধসত্ত্ব যোগিগণ এই সংসার-সাগর পার হইয়াছেন, সেই উৎকৃষ্ট পথ

আমি তোমায় নির্দ্দেশ করিয়া দিব”—এবং তাহাকে আচার্য্য শঙ্করের ‘বিবেকচূড়ামণি’ নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিতে আদেশ করিলেন।

শিষ্য কথাগুলি শুনিয়া ভাবিতে লাগিল, স্বামীজী তাহাকে ঐরূপে মন্ত্রদীক্ষাগ্রহণের জন্য সঙ্কেত করিতেছেন কি? শিষ্য তখন অতীব আচারী ও বেদান্তমতবাদী। গুরুকরণাদিতে এখনও তাহার মতি স্থির হয় নাই এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সে একান্ত পক্ষপাতী।

নানা প্রসঙ্গ চলিতেছে এমন সময় একজন আসিয়া সংবাদ দিল যে, ‘মিরর্’-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। স্বামীজী সংবাদবাহককে বলিলেন, “তাঁকে এখানে নিয়ে এসো।” নরেন্দ্র বাবু ছোট ঘরে আসিয়া বসিলেন এবং আমেরিকা ও ইংলণ্ড সম্বন্ধে স্বামীজীকে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। প্রশ্নোত্তরে স্বামীজী বলিলেন—“আমেরিকাবাসীর মত এমন সহৃদয়, উদারচিত্ত, অতিথিসৎকারপরায়ণ, নব নব ভাবগ্রহণে একান্ত সমুৎসুক জাতি জগতে আর দ্বিতীয় দেখা যায় না। আমেরিকায় যাহা কিছু কার্য্য হইয়াছে তাহা আমার শক্তিতে হয় নাই; আমেরিকাদেশের লোক এত সহৃদয় বলিয়াই তাঁহারা বেদান্ত-ভাব গ্রহণ করিয়াছেন।” ইংলণ্ডের কথা উপলক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “ইংরেজের মত **conservative** (প্রাচীন রীতিনীতির পক্ষপাতী) জাতি জগতে আর দ্বিতীয় নাই। তাহারা কোন নূতন ভাব সহজে গ্রহণ করিতে চায় না, কিন্তু অধ্যবসায়ের সহিত যদি তাহাদিগকে একবার কোন ভাব বুঝাইয়া দেওয়া যায়, তবে তাহারা কিছুতেই

তাহা আর ছাড়ে না। এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা অন্য কোন জাতিতে মিলে না। সেইজন্য তাহারা সভ্যতা ও শক্তিসঞ্চয়ে জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া দাঁড়াইয়াছে।"

অনন্তর, উপযুক্ত প্রচারক পাইলে আমেরিকা অপেক্ষা ইংলণ্ডেই বেদান্তকার্য্য স্থায়ী হইবার অধিকতর সম্ভাবনা জানাইয়া বলিলেন—"আমি কেবল কার্য্যের পত্তন মাত্র করিয়া আসিয়াছি। পরবর্ত্তী প্রচারকগণ ঐ পন্থা অনুসরণ করিলে কালে অনেক কার্য্য হইবে।"

নরেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইরূপ ধর্ম্মপ্রচার দ্বারা ভবিষ্যতে আমাদের কি আশা আছে?"

স্বামীজী বলিলেন, "আমাদের দেশে আছে মাত্র এই বেদান্ত-ধর্ম্ম। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার তুলনায় আমাদের এখন আর কিছু নাই বললেই হয়। কিন্তু এই সার্ব্বভৌম বেদান্তবাদ—যাহাতে সকল মতের, সকল পথের লোককেই ধর্ম্মলাভে সমান অধিকার প্রদান করে—ইহার প্রচারে পাশ্চাত্ত্য সভ্য জগৎ জানিতে পারিবে ভারতবর্ষে এক সময়ে কি আশ্চর্য্য ধর্ম্মভাবের স্ফুরণ হইয়াছিল এবং এখনও রহিয়াছে। এই মতের চর্চ্চায় পাশ্চাত্ত্য জাতির আমাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি হইবে—অনেকটা এখনই হইয়াছে। এইরূপে যথার্থ শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি লাভ করিতে পারিলে আমরা তাহাদের নিকট ঐহিক জীবনের বিজ্ঞানাদি শিক্ষা করিয়া জীবন-সংগ্রামে অধিকতর পটু হইব। পক্ষান্তরে, তাহারা আমাদের নিকট এই বেদান্তমত শিক্ষা করিয়া পারমার্থিক কল্যাণলাভে সমর্থ হইবে।"

নরেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাস করিলেন, "এই আদান-প্রদানে আমাদের

রাজনৈতিক কোন উন্নতির আশা আছে কি ?" স্বামীজী বলিলেন, "ওরা (পাশ্চাত্ত্যেরা) মহাপরাক্রান্ত বিরোচনের সন্তান; ওদের শক্তিতে পঞ্চভূত ক্রীড়াপুত্তলিকাবৎ হইয়া কার্য্য করিতেছে; আপনারা যদি মনে করেন—আমরা এদের সঙ্গে সংঘর্ষে ঐ স্থূল পাঞ্চভৌতিক শক্তিপ্রয়োগ করিয়াই একদিন স্বাধীন হইব তবে আপনারা নেহাৎ ভুল বুঝিতেছেন। হিমালয়ের সামনে সামান্য উপলখণ্ড যেরূপ, উহাদের ও আমাদের ঐ শক্তি-প্রয়োগকুশলতায় তদ্রূপ প্রভেদ। আমার মত কি জানেন? আমরা এইরূপে বেদান্তোক্ত ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য পাশ্চাত্ত্য জগতে প্রচার করিয়া, ঐ মহাশক্তিধরগণের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া ধর্ম্মবিষয়ে চিরদিন ওদের গুরুস্থানীয় থাকিব এবং ওরা ইহলৌকিক অন্যান্য বিষয়ে আমাদের গুরু থাকিবে। ধর্ম্ম জিনিসটা ওদের হাতে ছেড়ে দিয়ে ভারতবাসী যেদিন পাশ্চাত্ত্যের পদতলে ধর্ম্ম শিখতে বসবে, সেইদিন এ অধঃপতিত জাতির জাতিত্ব একেবারে ঘুচে যাবে। দিনরাত চীৎকার করে ওদের 'এ দেও, ও দেও' বললে কিছু হবে না। এই আদান-প্রদানরূপ কার্য্য দ্বারা যখন উভয় পক্ষের ভিতর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির একটা টান দাঁড়াবে তখন আর চেঁচামেচি করতে হবে না। ওরা আপনা হতেই সব করবে। আমার বিশ্বাস এইরূপে ধর্ম্মের চর্চ্চায় ও বেদান্তধর্ম্মের বহুল প্রচারে এদেশ ও পাশ্চাত্ত্য দেশ উভয়েরই বিশেষ লাভ। রাজনীতিচর্চ্চা এর তুলনায় আমার নিকট গৌণ (secondary) উপায় বলিয়া বোধ হয়। আমি এই বিশ্বাস কার্য্যে পরিণত করিতে জীবনক্ষয় করবো।

আপনারা ভারতের কল্যাণ অন্যভাবে সাধিত হবে বুঝে থাকেন ত অন্যভাবে কার্য্য করে যান।"

নরেন্দ্র বাবু স্বামীজীর কথায় অবিসম্বাদী সম্মতি প্রকাশ করিয়া কিছুক্ষণ বাদে উঠিয়া গেলেন। শিষ্য স্বামীজীর পূর্ব্বোক্ত কথা-সকল শুনিয়া অবাক হইয়া তাঁহার দীপ্ত মূর্ত্তির দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল।

নরেন্দ্র বাবু চলিয়া গেলে পর, গোরক্ষিণী সভার জনৈক উদ্যোগী প্রচারক স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করিতে উপস্থিত হইলেন। পুরা না হইলেও ইঁহার বেশভূষা অনেকটা সন্ন্যাসীর মত—মাথায় গেরুয়া রঙ্গের পাগড়ি বাঁধা—দেখিলেই বুঝা যায় ইনি হিন্দুস্থানী। গোরক্ষা-প্রচারকের আগমনবার্ত্তা পাইয়া স্বামীজী বাহিরের ঘরে আসিলেন। প্রচারক স্বামীজীকে অভিবাদন করিয়া গোমাতার একখানি ছবি তাঁহাকে উপহার দিলেন। স্বামীজী উহা হাতে লইয়া নিকটবর্ত্তী অপর এক ব্যক্তির হাতে দিয়া তাঁহার সহিত নিম্নলিখিত আলাপ করিয়াছিলেন:

স্বামীজী। আপনাদের সভার উদ্দেশ্য কি?

প্রচারক। আমরা দেশের গোমাতাগণকে কসাইয়ের হাত থেকে রক্ষা করিয়া থাকি। স্থানে স্থানে পিঞ্জরাপোল স্থাপন করা হইয়াছে—সেখানে রুগ্ন, অকর্ম্মণ্য এবং কসাইয়ের হাত হইতে ক্রীত গোমাতাগণ প্রতিপালিত হয়।

স্বামীজী। এ অতি উত্তম কথা। আপনাদের আয়ের পন্থা কি?

প্রচারক। দয়াপরবশ হইয়া আপনাদের ন্যায় মহাপুরুষ যাহা কিছু দেন, তাহা দ্বারাই সভার ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ হয়।

স্বামীজী। আপনাদের গচ্ছিত কত টাকা আছে ?

প্রচারক। মাড়োয়ারী বণিকসম্প্রদায় এ কার্য্যের বিশেষ পৃষ্ঠ-পোষক। তাঁহারা এই সৎকার্য্যে বহু অর্থ দিয়াছেন।

স্বামীজী। মধ্য-ভারতে এবার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। ভারত গভর্ণমেণ্ট ৯ লক্ষ লোকের অনশনে মৃত্যুর তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। আপনাদের সভা এই দুর্ভিক্ষকালে কোন সাহায্যদানের আয়োজন করিয়াছে কি ?

প্রচারক। আমরা দুর্ভিক্ষাদিতে সাহায্য করি না। কেবলমাত্র গোমাতৃগণের রক্ষাকল্পেই এই সভা স্থাপিত।

স্বামীজী। যে দুর্ভিক্ষে আপনাদের জাতভাই মানুষ লক্ষ লক্ষ মৃত্যুমুখে পতিত হইল, সামর্থ্য সত্ত্বেও আপনারা এই ভীষণ দুর্দ্দিনে তাহাদিগকে অন্ন দিয়া সাহায্য করা উচিত মনে করেন নাই ?

প্রচারক। না ; লোকের কর্ম্মফলে—পাপে এই দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল হইয়াছে।

প্রচারকের কথা শুনিয়া স্বামীজীর বিশাল নয়নপ্রান্তে যেন অগ্নিকণা স্ফুরিত হইতে লাগিল ; মুখ আরক্তিম হইল। কিন্তু মনের ভাব চাপিয়া বলিলেন, "যে সভা-সমিতি মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে না, নিজের ভাই অনশনে মরিতেছে দেখিয়াও তাহার প্রাণরক্ষার জন্য এক মুষ্টি অন্ন না দিয়া পশুপক্ষি-রক্ষার জন্য রাশি রাশি অন্ন বিতরণ করে, তাহার সহিত আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই—তাহা দ্বারা সমাজের বিশেষ কিছু উপকার হয় বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। কর্ম্মফলে মানুষ মরছে

—এইরূপে কর্ম্মের দোহাই দিলে জগতে কোন বিষয়ের জন্য চেষ্টা-চরিত্র করাটাই একেবারে বিফল বলে সাব্যস্ত হয়। আপনাদের পশুরক্ষা কাজটাও বাদ যায় না। ঐ কাজ সম্বন্ধেও বলা যেতে পারে—গোমাতারা আপন আপন কর্ম্মফলেই কসাইদের হাতে যাচ্ছেন ও মচ্ছেন, আমাদের উহাতে কিছু করবার প্রয়োজন নাই।"

প্রচারক একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "হাঁ, আপনি যা বলছেন তা সত্য, কিন্তু শাস্ত্র বলে—গরু আমাদের মাতা।"

স্বামীজী হাসতে হাসতে বললেন, "হাঁ, গরু আমাদের যে মা, তা আমি বিলক্ষণ বুঝিয়াছি—তা না হইলে এমন সব কৃতী সন্তান আর কে প্রসব করবেন?"

হিন্দুস্থানী প্রচারক ঐ বিষয়ে আর কিছু না বলিয়া—বোধ হয় স্বামীজীর বিষম বিদ্রূপ তিনি বুঝিতেই পারিলেন না—স্বামীজীকে বলিলেন যে, এই সমিতির উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার কাছে কিছু ভিক্ষাপ্রার্থী।

স্বামীজী। আমি ত সন্ন্যাসী ফকির লোক। আমি কোথায় অর্থ পাবো, যাতে আপনাদের সাহায্য করবো? তবে আমার হাতে যদি কখনও অর্থ হয়, অগ্রে মানুষের সেবায় ব্যয় করবো; মানুষকে আগে বাঁচাতে হবে—অন্নদান, বিদ্যাদান, ধর্ম্মদান করতে হবে। এসব করে যদি অর্থ বাকী থাকে তবে আপনাদের সমিতিতে কিছু দেওয়া যাবে।

কথা শুনিয়া প্রচারক মহাশয় স্বামীজীকে অভিবাদনান্তে প্রস্থান করিলেন। তখন স্বামীজী আমাদিগকে বলিতে লাগিলেন,

"কি কথাই বল্‌লে! বলে কি না—কর্ম্মফলে মানুষ মরছে, তাদের দয়া করে কি হবে? দেশটা যে অধঃপাতে গেছে ইহাই তার চূড়ান্ত প্রমাণ। তোদের হিন্দুধর্ম্মের কর্ম্মবাদ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে দেখলি? মানুষ হয়ে মানুষের জন্যে যাদের প্রাণ না কাঁদে, তারা কি আবার মানুষ?"

এই কথা বলিতে বলিতে স্বামীজীর সর্ব্বাঙ্গ যেন ক্ষোভে, দুঃখে শিহরিয়া উঠিল। অনন্তর স্বামীজী তামাক টানিতে টানিতে শিষ্যকে বলিলেন, "আবার আমার সঙ্গে দেখা করো।"

শিষ্য। আপনি কোথায় থাকিবেন? হয়ত কোন বড় মানুষের বাড়ীতে থাকিবেন, আমাকে তথায় যাইতে দিবে ত?

স্বামীজী। সম্প্রতি আমি কখন আলামবাজার মঠে ও কখন কাশীপুরে গোপাললাল শীলের বাগানবাড়ীতে থাকব। তুমি সেখানে যেও।

শিষ্য। মহাশয়, আপনার সঙ্গে নির্জ্জনে কথা কহিতে বড় ইচ্ছা হয়।

স্বামীজী। তাই হবে—একদিন রাত্রিতে যেও। খুব বেদান্তের কথা হবে।

শিষ্য। মহাশয়, আপনার সঙ্গে কতকগুলি ইংরেজ ও আমেরিকান আসিয়াছে শুনিয়াছি, তাহারা আমার বেশভূষা ও কথাবার্ত্তায় রুষ্ট হইবে না ত?

স্বামীজী। তারাও সব মানুষ—বিশেষতঃ বেদান্তধর্ম্মনিষ্ঠ। তোমার সঙ্গে আলাপ করে তারা খুশি হবে।

শিষ্য। মহাশয়, বেদান্তে যে সব অধিকারীর লক্ষণ আছে, তাহা আপনার পাশ্চাত্ত্য শিষ্যদের ভিতরে কিরূপে আসিল? শাস্ত্রে

বলে—অধীতবেদবেদান্ত, কৃতপ্রায়শ্চিত্ত, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠানকারী, আহার-বিহারে পরম সংযত, বিশেষতঃ চতুঃসাধন-সম্পন্ন না হইলে বেদান্তের অধিকারী হয় না। আপনার পাশ্চাত্ত্য শিষ্যেরা একে অব্রাহ্মণ, তাহাতে অশন-বসনে অনাচারী ; তাহারা বেদান্তবাদ বুঝিল কি করিয়া ?

স্বামীজী। তাদের সঙ্গে আলাপ করেই বুঝতে পারবে তারা বেদান্ত বুঝেছে কি না।

স্বামীজী বোধ হয় এতক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে, শিষ্য একজন নিষ্ঠাবান, আচারী হিন্দু। অনন্তর স্বামীজী কয়েকজন শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তপরিবেষ্টিত হইয়া বাগবাজারের শ্রীযুক্ত বলরাম বসু মহাশয়ের বাটীতে গেলেন। শিষ্য বটতলায় একখানা 'বিবেক-চূড়ামণি' গ্রন্থ ক্রয় করিয়া দর্জিপাড়ায় নিজ বাসার দিকে অগ্রসর হইল।

দ্বিতীয় বল্লী

স্থান—কলিকাতা হইতে কাশীপুর যাইবার পথে ও ৺গোপাললাল শীলের বাগানে

বর্ষ—১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ

চেতনের লক্ষণ জীবন-সংগ্রাম-পটুতা—মনুষ্যজাতির জীবনীশক্তি-পরীক্ষারও ঐ নিয়ম—ভারতের জড়ত্বের কারণ, আপনাকে শক্তিহীন মনে করা—প্রত্যেকের ভিতরেই অনন্ত শক্তির উৎসস্বরূপ আত্মা বিদ্যমান—উহা দেখাইতে বুঝাইতেই মহাপুরুষদিগের আগমন—ধর্ম্ম অনুভূতির বিষয়—তীব্র ব্যাকুলতাই ধর্ম্মলাভের উপায়—বর্ত্তমান যুগে গীতোক্ত কর্ম্মের আবশ্যকতা—গীতাকার শ্রীকৃষ্ণের পূজা চাই—রজোগুণের উদ্দীপনা দেশে প্রয়োজন।

স্বামীজী অদ্য শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ[১] মহাশয়ের বাটীতে মধ্যাহ্নে বিশ্রাম করিতেছিলেন। শিষ্য সেখানে আসিয়া প্রণাম করিয়া দেখিল, স্বামীজী তখন গোপাললাল শীলের বাগানবাড়ীতে যাইবার জন্য প্রস্তুত। গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। শিষ্যকে বলিলেন, "চল্ আমার সঙ্গে"। শিষ্য সম্মত হইলে স্বামীজী তাহাকে সঙ্গে লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন, গাড়ী ছাড়িল। চিৎপুরের রাস্তায় আসিয়া গঙ্গাদর্শন হইবামাত্র স্বামীজী আপন মনে সুর করিয়া পড়িতে লাগিলেন, "গঙ্গা-তরঙ্গ-রমণীয়-জটা-কলাপং" ইত্যাদি। শিষ্য মুগ্ধ হইয়া সে অদ্ভুত স্বরলহরী নিঃশব্দে শুনিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এইরূপে গত হইলে একখানা রেলের ইঞ্জিন চিৎপুর 'হাইড্রলিক্ ব্রিজের' দিকে যাইতেছে দেখিয়া স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, "দেখ দেখি কেমন সিঙ্গির মত যাচ্ছে।" শিষ্য বলিলেন—"উহা ত জড়।

১ বাঙ্গালার সুবিখ্যাত নট ও নাটকরচয়িতা শ্রীরামকৃষ্ণভক্তাগ্র ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

উহার পশ্চাতে মানুষের চেতনশক্তি ক্রিয়া করিতেছে, তবে ত উহা চলিতেছে? ঐরূপে চলায় উহার নিজের বাহাদুরি আর কি আছে?”

স্বামীজী। বল্ দেখি চেতনের লক্ষণ কি?

শিষ্য। কেন মহাশয়, যাহাতে বুদ্ধিপূর্ব্বক ক্রিয়া দেখা যায় তাহাই চেতন।

স্বামীজী। যাহাই nature-এর against-এ rebel করে (প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে) তাহাই চেতন, তাহাতেই চৈতন্যের বিকাশ রয়েছে। দেখ্ না, একটা সামান্য পিঁপড়ে মারতে যা, সেও জীবনরক্ষার জন্য একবার rebel (লড়াই) করবে। যেখানে struggle (চেষ্টা বা পুরুষকার), যেখানে rebellion (বিদ্রোহ), সেইখানেই জীবনের চিহ্ন—সেইখানেই চৈতন্যের বিকাশ।

শিষ্য। মানুষের ও মনুষ্যজাতিসমূহের সম্বন্ধেও কি ঐ নিয়ম খাটে, মহাশয়?

স্বামীজী। খাটে কি না একবার জগতের ইতিহাসটা পড়ে দেখ্ না। দেখ্ বি, তোরা ছাড়া আর সকল জাতি সম্বন্ধেই ঐ কথা খাটে। তোরাই কেবল জগতে আজকাল জড়বৎ পড়ে আছিস্। তোদের hypnotise (মন্ত্রমুগ্ধ) করে ফেলেছে। বহু প্রাচীনকাল থেকে তোদের অপরে বলেছে—তোরা হীন, তোদের কোন শক্তি নাই। তোরাও তাই শুনে আজ হাজার বচ্ছর হতে চলল ভাবছিস—আমরা হীন, সকল বিষয়ে অকর্ম্মণ্য! ভেবে ভেবে তাই হয়ে পড়েছিস্।

(আপনার শরীর দেখাইয়া) এ দেহও ত তোদের দেশের মাটি থেকেই জন্মেছে?—আমি কিন্তু কখনও ওরূপ ভাবি নাই। তাই দেখ্‌না তাঁর (ঈশ্বরের) ইচ্ছায়, যারা আমাদের চিরকাল হীন মনে করে, তারাই আমাকে দেবতার মত খাতির করেছে ও করছে। তোরাও যদি ঐরূপ ভাবতে পারিস যে, 'আমাদের ভিতর অনন্ত শক্তি, অপার জ্ঞান, অদম্য উৎসাহ আছে' এবং অনন্তের ঐ শক্তি জাগাতে পারিস ত তোরাও আমার মত হতে পারিস।

শিষ্য। ঐরূপ ভাবিবার শক্তি কোথায়, মহাশয়? বাল্যকাল হইতেই ঐ কথা শুনায় ও বুঝাইয়া দেয় এমন শিক্ষক বা উপদেষ্টাই বা কোথায়? লেখাপড়া করা আজকাল কেবল চাকরিলাভের জন্য, এই কথাই আমরা সকলের নিকট হইতে শুনিয়াছি ও শিখিয়াছি।

স্বামীজী। তাই ত আমরা এসেছি অন্যরূপ শিখাতে ও দেখাতে। তোরা আমাদের কাছ থেকে ঐ তত্ত্ব শেখ, বোঝ, অনুভূতি কর—তারপর নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে ঐ ভাব ছড়িয়ে দে। সকলকে গিয়ে বল্—'ওঠ, জাগ, আর ঘুমিও না; সকল অভাব, সকল দুঃখ ঘুচাবার শক্তি তোমাদের নিজেদের ভিতর রয়েছে, এ কথা বিশ্বাস কর, তাহলেই ঐ শক্তি জেগে উঠবে।' ঐ কথা সকলকে বল্ ও সেই সঙ্গে সাদা কথায় বিজ্ঞান, দর্শন, ভূগোল ও ইতিহাসের মূল কথাগুলি mass-এর (সাধারণের) ভেতর ছড়িয়ে দে। আমি অবিবাহিত যুবকদের নিয়ে একটি centre

(শিক্ষাকেন্দ্র) তৈয়ার করবো—প্রথম তাদের শেখাব, তার পর তাদের দিয়ে এই কাজ করাব মতলব করেছি।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, ঐরূপ করা ত অনেক অর্থসাপেক্ষ, টাকা কোথায় পাইবেন?

স্বামীজী। তুই কি বলছিস? মানুষেই ত টাকা করে। টাকায় মানুষ করে, একথা কবে কোথায় শুনেছিস? তুই যদি মন মুখ এক করতে পারিস, কথায় ও কাজে এক হতে পারিস ত জলের মত টাকা আপনা-আপনি তোর পায়ে এসে পড়বে।

শিষ্য। আচ্ছা মহাশয়, না হয় স্বীকারই করিলাম যে, টাকা আসিল এবং আপনি ঐরূপে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন; তাহাতেই বা কি? ইতঃপূর্ব্বেও কত মহাপুরুষ কত ভাল ভাল কাজ করিয়া গিয়াছিলেন, সে সব এখন কোথায়? আপনার প্রতিষ্ঠিত কার্য্যেরও সময়ে ঐরূপ দশা হইবে, নিশ্চয়। তবে ঐরূপ উদ্যমের আবশ্যকতা কি?

স্বামীজী। পরে কি হবে সর্ব্বদা একথাই যে ভাবে, তার দ্বারা কোন কার্য্যই হতে পারে না। যা সত্য বলে বুঝেছিস তা এখনি কোরে ফেল্; পরে কি হবে না হবে সে কথা ভাববার দরকার কি? এতটুকু ত জীবন—তার ভিতর অত ফলাফল খতালে কি কোন কাজ হতে পারে? ফলাফলদাতা একমাত্র তিনি (ঈশ্বর) যাহা হয় করবেন; সে কথায় তোর কাজ কি? তুই ওদিকে না দেখে কেবল কাজ করে যা।

বলিতে বলিতে গাড়ী বাগানবাড়ীতে পঁহুছিল। কলিকাতা হইতে অনেক লোক স্বামীজীকে দর্শন করিতে সেদিন বাগানে আসিয়াছেন। স্বামীজী গাড়ী হইতে নামিয়া ঘরের ভিতর যাইয়া বসিলেন এবং তাঁহাদিগের সকলের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন; স্বামীজীর বিলাতী শিষ্য গুডউইন সাহেব (Goodwin) মূর্ত্তিমতী সেবার ন্যায় অনতিদূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন; ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার সহিত পরিচয় হওয়ায় শিষ্য তাঁহারই নিকট উপস্থিত হইল এবং উভয়ে মিলিয়া স্বামীজীর সম্বন্ধে নানাপ্রকার কথোপকথনে নিযুক্ত হইল।

সন্ধ্যার পর স্বামীজী শিষ্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুই কি কঠোপনিষদ্ কণ্ঠস্থ করেছিস্?"

শিষ্য। না মহাশয়, শাঙ্করভাষ্যসমেত উহা পড়িয়াছি মাত্র।

স্বামীজী। উপনিষদের মধ্যে এমন সুন্দর গ্রন্থ আর দেখা যায় না। ইচ্ছা হয় তোরা এখানা কণ্ঠে করে রাখিস। নচিকেতার ন্যায় শ্রদ্ধা, সাহস, বিচার ও বৈরাগ্য জীবনে আনবার চেষ্টা কর্—শুধু পড়লে কি হবে।

শিষ্য। কৃপা করুন, যাহাতে দাসের ঐ সকল অনুভূতি হয়।

স্বামীজী। ঠাকুরের কথা শুনেছিস ত? তিনি বলতেন, 'কৃপা বাতাস ত বইছেই, তুই পাল তুলে দে না।' কেউ কাকেও কিছু করে দিতে পারে কি রে বাপ? আপনার নিয়তি আপনার হাতে—গুরু এইটুকু কেবল বুঝিয়ে দেন মাত্র। বীজের শক্তিতেই গাছ হয়, জলবায়ু কেবল উহার সহায়ক মাত্র।

শিষ্য। বাহিরের সহায়তারও আবশ্যক আছে, মহাশয় ?

স্বামীজী। তা আছে, তবে কি জানিস—ভিতরে পদার্থ না থাকলে শত সহায়তায়ও কিছু হয় না। তবে সকলেরই আত্মানুভূতির একটা সময় আসে, কারণ সকলেই ব্রহ্ম। উচ্চনীচ-প্রভেদ করাটা কেবল ঐ ব্রহ্মবিকাশের তারতম্যে মাত্র। সময়ে সকলেরই পূর্ণ বিকাশ হয়। তাই শাস্ত্র বলেছেন, 'কালেনাত্মনি বিন্দতি'।

শিষ্য। কবে আর ঐরূপ হবে, মহাশয় ? শাস্ত্রমুখে শুনি, কত জন্ম আমরা অজ্ঞানতায় কাটাইয়াছি।

স্বামীজী। ভয় কি! এবার যখন এখানে এসে পড়েছিস, তখন এইবারেই হয়ে যাবে। মুক্তি—সমাধি—এসব কেবল ব্রহ্ম-প্রকাশের পথের প্রতিবন্ধগুলি দূর করে দেওয়া মাত্র। নতুবা আত্মা সূর্য্যের মত সর্ব্বদা জ্বলছেন। অজ্ঞানমেঘে তাঁকে ঢেকেছে মাত্র। সেই মেঘও সরিয়ে দেওয়া আর সূর্য্যেরও প্রকাশ হওয়া। তখনি "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ" ইত্যাদি অবস্থা হওয়া। যত পথ দেখছিস সবই এই পথের প্রতিবন্ধ দূর করতে উপদেশ দিচ্ছে। যে যে-ভাবে আত্মানুভব করেছে, সে সেই-ভাবে উপদেশ দিয়ে গিয়েছে। উদ্দেশ্য সকলেরই কিন্তু আত্মজ্ঞান—আত্মদর্শন। ইহাতে সর্ব্বজাতি—সর্ব্বজীবের সমান অধিকার। ইহাই সর্ব্ববাদিসম্মত মত।

শিষ্য। মহাশয়, শাস্ত্রের ঐ কথা যখন পড়ি বা শুনি, তখন আজও আত্মবস্তুর প্রত্যক্ষ হইল না ভাবিয়া প্রাণ যেন ছট্‌ফট্‌ করে।

স্বামীজী। এরই নাম ব্যাকুলতা। ঐটে যত বেড়ে যাবে ততই প্রতিবন্ধরূপ মেঘ কেটে যাবে। ততই শ্রদ্ধায় সমাধান হবে। ক্রমে আত্মা করতলামলকবৎ প্রত্যক্ষ হবেন। অনুভূতিই ধর্ম্মের প্রাণ। কতকগুলি আচার-নিয়ম সকলেই মেনে চলতে পারে। কতকগুলি বিধি-নিষেধ সকলেই পালন করতে পারে, কিন্তু অনুভূতির জন্য কয়জন লোক ব্যাকুল হয়? ব্যাকুলতা—ঈশ্বরলাভ বা আত্মজ্ঞানের জন্য উন্মাদ হওয়াই যথার্থ ধর্ম্ম-প্রাণতা। গোপীদিগের ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্য যেমন উদ্দাম উন্মত্ততা ছিল, আত্মদর্শনের জন্যও সেইরূপ ব্যাকুলতা চাই। গোপীদিগের মনেও একটু একটু পুরুষ-মেয়ে-ভেদ ছিল। ঠিক ঠিক আত্মজ্ঞানে লিঙ্গভেদ একেবারেই নাই।

বলিতে বলিতে 'গীতগোবিন্দ' সম্বন্ধে কথা তুলিয়া স্বামীজী বলিতে লাগিলেন—

"জয়দেবই সংস্কৃত ভাষার শেষ কবি। তবে জয়দেব ভাবাপেক্ষা অনেক স্থলে jingling of words (শ্রুতিমধুর বাক্যবিন্যাসের) দিকে বেশী নজর রেখেছেন। দ্যাখ্, দেখি গীতগোবিন্দের 'পততি পতত্রে' ইত্যাদি শ্লোকে অনুরাগ-ব্যাকুলতার কি culmination (পরাকাষ্ঠা) কবি দেখিয়েছেন? আত্মদর্শনের জন্য ঐরূপ অনুরাগ হওয়া চাই, প্রাণের ভিতরটা ছট্‌ফট্ করা চাই। আবার বৃন্দাবনলীলার কথা ছেড়ে কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ কেমন হৃদয়গ্রাহী তাও দ্যাখ্—অমন ভয়ানক যুদ্ধকোলাহলেও কৃষ্ণ কেমন স্থির, গম্ভীর—শান্ত! যুদ্ধক্ষেত্রেই অর্জ্জুনকে গীতা বলছেন!—ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম যুদ্ধ করতে লাগিয়ে দিচ্ছেন! এই

ভয়ানক যুদ্ধের প্রবর্ত্তক হয়েও নিজে শ্রীকৃষ্ণ কেমন কর্ম্মহীন—অস্ত্র ধরলেন না! যে দিকে চাইবি দেখ্‌বি শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র perfect (সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ)। জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি, যোগ—তিনি যেন সকলেরই মূর্ত্তিমান বিগ্রহ! শ্রীকৃষ্ণের এই ভাবটিরই আজকাল বিশেষভাবে আলোচনা চাই; এখন বৃন্দাবনের বাঁশীবাজান কৃষ্ণকেই কেবল দেখ্‌লে চলবে না, তাতে জীবের উদ্ধার হবে না। এখন চাই গীতারূপ-সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা; ধনুর্ধারী রাম, মহাবীর, মা কালী এঁদের পূজা। তবে ত লোকে মহা উদ্যমে কর্ম্মে লেগে শক্তিমান হয়ে উঠবে। আমি বেশ করে বুঝে দেখেছি এদেশে এখন যারা ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে, তাদের অনেকেই full of morbidity—cracked brains অথবা fanatic (মজ্জাগত দুর্ব্বলতা, মস্তিষ্ক-বিকার অথবা বিচারশূন্য উৎসাহসম্পন্ন)—মহা রজোগুণের উদ্দীপনা ভিন্ন এখন তোদের না আছে ইহকাল, না আছে পরকাল। দেশ ঘোর তমোতে ছেয়ে ফেলেছে। ফলও তাই হচ্ছে—ইহজীবনে দাসত্ব, পরলোকে নরক।”

শিষ্য। পাশ্চাত্ত্যদেশীয়দের রজোভাব দেখিয়া আপনার কি আশা হয়, তাহারা ক্রমে সাত্ত্বিক হইবে?

স্বামীজী। নিশ্চয়; মহারজোগুণসম্পন্ন তারা এখন ভোগের শেষ সীমায় উঠেছে। তাদের যোগ হবে না ত কি পেটের দায়ে লালায়িত তোদের হবে? তাদের উৎকৃষ্ট ভোগ দেখে আমার মেঘদূতের ‘বিদ্যুদ্বন্তঃ ললিতবসনাঃ’ ইত্যাদি চিত্র মনে পড়ে। আর তোদের ভোগের ভিতর হচ্ছে কি না, স্যাঁতস্যাঁতে

ঘরে ছেঁড়া কেঁথায় শুয়ে বছরে বছরে শোরের মত বংশবৃদ্ধি —begetting a band of famished beggars and slaves (ক্ষুধাতুর ভিক্ষুক ও দাসকুলের জন্ম দেওয়া)! তাই বলছি এখন মানুষকে রজোগুণে উদ্দীপিত করে কর্ম্মপ্রাণ করতে হবে। কর্ম্ম—কর্ম্ম—কর্ম্ম—এখন আর 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়', উহা ভিন্ন উদ্ধারের আর অন্য পথ নাই।

শিষ্য। মহাশয়, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কি রজোগুণসম্পন্ন ছিলেন?

স্বামীজী। ছিলেন না? এই ত ইতিহাস বলছে তাঁরা কত দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছেন—তিব্বত, চীন, সুমাত্রা, সুদূর জাপানে পর্য্যন্ত ধর্ম্মপ্রচারক পাঠিয়েছেন। রজোগুণের ভিতর দিয়ে না গেলে উন্নতি হবার জো আছে কি?

কথায় কথায় রাত্রি আগত হইল। এমন সময় মিস্ মূলার (Miss Muller) আসিয়া পঁহুছিলেন। ইনি একজন ইংরেজ রমণী; স্বামীজীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্না। স্বামীজী শিষ্যকে ইঁহার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। অল্পক্ষণ বাক্যালাপের পরেই মিস্ মূলার (Miss Muller) উপরে চলিয়া গেলেন।

স্বামীজী। দেখছিস কেমন বীরের জাত এরা?—কোথায় বাড়ী ঘর—বড় মানুষের মেয়ে—তবু ধর্ম্মলাভের আশায় কোথায় এসে পড়েছে।

শিষ্য। হাঁ মহাশয়, আপনার ক্রিয়াকলাপ কিন্তু আরও অদ্ভুত! কত সাহেব মেম আপনার সেবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত—একালে ইহা বড়ই আশ্চর্য্য কথা।

স্বামীজী। (আপনার দেহ দেখাইয়া) শরীর যদি থাকে, তবে

আরও কত দেখবি; উৎসাহী ও অনুরাগী কতকগুলি যুবক পেলে আমি দেশটাকে তোলপাড় করে দেব। মান্দ্রাজে জন কতক আছে। কিন্তু বাঙ্গলায় আমার আশা বেশী। এমন পরিষ্কার মাথা অন্য কোথাও প্রায় জন্মে না। কিন্তু এদের muscles-এ (মাংসপেশীতে) শক্তি নাই। Brain (মস্তিষ্ক) ও muscles (মাংসপেশীসমূহ) সমানভাবে develop (পূর্ণাবয়বসম্পন্ন) হওয়া চাই। Iron nerves with a well intelligent brain and the whole world is at your feet. (দৃঢ়বদ্ধশরীর ও বিশেষ বুদ্ধিসম্পন্ন হলে জগৎকে পদানত করা যায়)।

সংবাদ আসিল, স্বামীজীর খাবার প্রস্তুত হইয়াছে। স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, "চল্, আমার খাওয়া দেখবি।" আহার করিতে করিতে তিনি বলিতে লাগিলেন—"মেলাই তেল চর্ব্বি খাওয়া ভাল নয়। লুচি হতে রুটি ভাল। লুচি রোগীর আহার। মাছ, মাংস, fresh vegetable (তাজা তরি-তরকারি) খাবি, মিষ্টি কম।" বলিতে বলিতে প্রশ্ন করিলেন, "হ্যাঁরে, ক'খানা রুটি খেয়েছি? আর কি খেতে হবে?" কত খাইয়াছেন তাহা স্বামীজীর স্মরণ নাই। ক্ষুধা আছে কিনা তাহাও বুঝিতে পারিতেছেন না! কথা কহিতে কহিতে তাঁহার শরীরজ্ঞান এতটা কমিয়া গিয়াছে!

আরও কিছু খাইয়া স্বামীজী আহার শেষ করিলেন। শিষ্যও বিদায় গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় ফিরিল। গাড়ী না পাওয়ায় পদব্রজে চলিল। চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিল, কাল আবার কখন স্বামীজীকে দর্শন করিতে আসিবে।

তৃতীয় বল্লী

স্থান—কাশীপুর, ৺গোপাললাল শীলের বাগান

বর্ষ—১৮৯৭

স্বামীজীর অদ্ভুত শক্তির প্রকাশ—কলিকাতার বড়বাজার-পল্লীর বিশিষ্ট হিন্দুস্থানী পণ্ডিতগণের স্বামীজীকে দেখিতে আগমন—পণ্ডিতগণের সহিত স্বামীজীর সংস্কৃতভাষায় শাস্ত্রালাপ—স্বামীজীর সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের ধারণা—গুরুভ্রাতাগণের স্বামীজীর প্রতি ভালবাসা—সভ্যতা কাহাকে বলে—ভারতের প্রাচীন সভ্যতার বিশেষত্ব—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আগমনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সম্মিলনে নবযুগাবির্ভাব—পাশ্চাত্ত্য ধার্ম্মিক লোকের বাহ্যিক চালচলন সম্বন্ধে ধারণা—ভাবসমাধি ও নির্ব্বিকল্প-সমাধির প্রভেদ—শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভাবরাজ্যের রাজা—ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষই যথার্থ লোকগুরু—কুলগুরুপ্রথার অপকারিতা—ধর্ম্মগ্লানি দূর করিতেই ঠাকুরের আগমন—স্বামীজী পাশ্চাত্ত্যে ঠাকুরকে কিভাবে প্রচার করিয়াছিলেন।

স্বামীজী প্রথমবার বিলাত হইতে ফিরিয়া কয়েক দিন কাশীপুরে ৺গোপাললাল শীলের বাগানে অবস্থান করিয়াছিলেন। শিষ্য তখন প্রতিদিন তথায় যাতায়াত করিত। শুধু শিষ্য কেন, স্বামীজীর দর্শনমানসে তখন বহু উৎসাহী যুবকের তথায় ভিড় হইত। Miss Muller (মিস্ মূলার) স্বামীজীর সঙ্গে আসিয়া এখানেই প্রথম অবস্থান করিয়াছিলেন; শিষ্যের গুরুভ্রাতা Goodwin (গুডউইন সাহেব) এই বাগানেই স্বামীজীর সঙ্গে থাকিতেন।

স্বামীজীর সুখ্যাতি তখন ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত। সুতরাং কেহ ঔৎসুক্যের বশবর্ত্তী হইয়া, কেহ তত্ত্বান্বেষী হইয়া, কেহ বা স্বামীজীর জ্ঞান-গরিমা পরীক্ষা করিতে তখন স্বামীজীকে দর্শন করিতে আসিত।

শিষ্য দেখিয়াছে, প্রশ্নকর্ত্তারা স্বামীজীর শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত এবং তাঁহার উক্তির প্রতিভায় বড় বড় দার্শনিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ নির্ব্বাক হইয়া অবস্থান করিত। স্বামীজীর কণ্ঠে বীণাপাণি যেন সর্ব্বদা অবস্থান করিতেন। এই বাগানে অবস্থানকালে তাঁহার অলৌকিক যোগদৃষ্টিরও সময়ে সময়ে পরিচয় পাওয়া যাইত।[১]

কলিকাতা বড়বাজারে বহু পণ্ডিতের বাস। অর্থবান মাড়োয়ারী বণিকগণের অন্নেই ইঁহারা প্রতিপালিত। ঐ সকল বেদজ্ঞ এবং দার্শনিক পণ্ডিতগণও এ সময়ে স্বামীজীর সুনাম অবগত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কতিপয় বিশিষ্ট পণ্ডিত স্বামীজীর সঙ্গে তর্ক করিবার মানসে একদিন এই বাগানে উপস্থিত হন। শিষ্য সেদিন তথায় উপস্থিত ছিল।

আগন্তুক পণ্ডিতগণের সকলেই সংস্কৃতভাষায় অনর্গল কথাবার্ত্তা বলিতে পারিতেন। তাঁহারা আসিয়াই মণ্ডলীপরিবেষ্টিত স্বামীজীকে সম্ভাষণ করিয়া সংস্কৃতভাষায় কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। স্বামীজীও সংস্কৃতেই তাঁহাদিগকে উত্তর দিতে লাগিলেন। কোন্ বিষয় লইয়া স্বামীজীর সঙ্গে সেদিন পণ্ডিতগণের বাদানুবাদ হয়, তাহা শিষ্যের ইদানীং স্মরণ নাই। তবে এই পর্য্যন্ত স্মরণ হয় যে, পণ্ডিতেরা

---

১ এই বাগানে অবস্থানকালে স্বামীজী একদিন একটি প্রেতাত্মার ছিন্নমুণ্ড দেখিতে পান। সে যেন করুণকণ্ঠে সদ্যোমৃত্যুর মুখ হইতে প্রাণভিক্ষা করিতেছিল। অনুসন্ধান করিয়া স্বামীজী পরে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, সত্য-সত্যই ঐ বাগানে কোন ব্রাহ্মণের অপঘাতে মৃত্যু হয়। এই ঘটনা তিনি পরে তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণের কাছে প্রকাশ করেন।

সকলেই প্রায় একসঙ্গে চীৎকার করিয়া সংস্কৃতে স্বামীজীকে দার্শনিক কূট প্রশ্নসমূহ করিতেছিলেন এবং স্বামীজী প্রশান্ত গম্ভীর ভাবে ধীরে ধীরে তাঁহাদিগকে ঐ বিষয়ক নিজ মীমাংসাদ্যোতক সিদ্ধান্তগুলি বলিতেছিলেন। ইহাও বেশ মনে আছে যে, স্বামীজীর সংস্কৃতভাষা পণ্ডিতগণের ভাষা অপেক্ষা শ্রুতিমধুর ও সুললিত হইতেছিল। পণ্ডিতগণও ঐ কথা পরে স্বীকার করিয়াছিলেন।

সংস্কৃতভাষায় স্বামীজীকে ঐরূপে অনর্গল কথাবার্ত্তা কহিতে দেখিয়া তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণও সেদিন স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। কারণ, গত ছয় বৎসর কাল ইউরোপ ও আমেরিকায় অবস্থানকালে স্বামীজী যে সংস্কৃত-আলোচনার তেমন সুবিধা পান নাই, তাহা সকলেরই জানা ছিল। শাস্ত্রদর্শী এইসকল পণ্ডিতের সঙ্গে ঐরূপ তর্কালাপে সেদিন সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিল, স্বামীজীর মধ্যে অদ্ভুত শক্তির স্ফুরণ হইয়াছে। সেদিন ঐ সভায় রামকৃষ্ণানন্দ, যোগানন্দ, নির্ম্মলানন্দ, তুরীয়ানন্দ ও শিবানন্দ স্বামী মহারাজগণ উপস্থিত ছিলেন।

স্বামীজী পণ্ডিতগণের সহিত বাদে সিদ্ধান্তপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং পণ্ডিতগণ পূর্ব্বপক্ষবাদী হইয়াছিলেন। শিষ্যের মনে পড়ে, বিচারকালে স্বামীজী এক স্থলে 'অস্তি' স্থলে 'স্বস্তি' প্রয়োগ করায় পণ্ডিতগণ হাসিয়া উঠেন; তাহাতে স্বামীজী তৎক্ষণাৎ বলেন, 'পণ্ডিতানাং দাসোঽহং ক্ষন্তব্যমেতৎ স্খলনম্"—আমি পণ্ডিতগণের দাস; আমার এই ব্যাকরণস্খলন ক্ষমা করুন। পণ্ডিতেরাও স্বামীজীর ঈদৃশ দীন ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া যান। অনেকক্ষণ বাদানুবাদের পরিশেষে সিদ্ধান্তপক্ষের মীমাংসা পর্য্যাপ্ত বলিয়া পণ্ডিতগণ

স্বীকার করিলেন এবং প্রীতিসম্ভাষণ করিয়া গমনোদ্যত হইলেন। দুই-চারি জন আগন্তুক ভদ্রলোক ঐ সময় তাঁহাদিগের পশ্চাৎ গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়গণ, স্বামীজীকে কিরূপ বোধ হইল?" তদুত্তরে বয়োজ্যেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়াছিলেন, "ব্যাকরণে গভীর ব্যুৎপত্তি না থাকিলেও স্বামীজী শাস্ত্রের গূঢ়ার্থদ্রষ্টা, মীমাংসা করিতে অদ্বিতীয় এবং স্বীয় প্রতিভাবলে বাদখণ্ডনে অদ্ভুত পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন।"

স্বামীজীর উপর তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণের সর্ব্বদা কি অদ্ভুত ভালবাসাই দেখা যাইত! পণ্ডিতগণের সঙ্গে স্বামীজীর যখন খুব তর্ক বাধিয়া গিয়াছে তখন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে হলের উত্তর পাশের ঘরে বসিয়া শিষ্য জপ করিতে দেখিতে পায়। পণ্ডিতগণের গমনান্তে শিষ্য তাঁহাকে ঐ বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসায় জানিতে পারে যে, স্বামীজীর জয়লাভের জন্যই তিনি একান্তমনে ঠাকুরের পাদপদ্মে জানাইতেছিলেন।

পণ্ডিতগণ চলিয়া গেলে শিষ্য স্বামীজীর নিকট শ্রবণ করে যে, পূর্ব্বপক্ষকারী উক্ত পণ্ডিতগণ পূর্ব্বমীমাংসাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। স্বামীজী উত্তরমীমাংসা পক্ষ-অবলম্বনে তাঁহাদিগের নিকট জ্ঞান-কাণ্ডের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছিলেন এবং পণ্ডিতগণও স্বামীজীর সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ব্যাকরণগত একটি ভুল ধরিয়া পণ্ডিতগণ যে স্বামীজীকে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, তাহাতে স্বামীজী বলেন যে, অনেক বৎসর যাবৎ সংস্কৃতে কথাবার্ত্তা না বলায় তাঁহার ঐরূপ ভ্রম হইয়াছিল। পণ্ডিত-গণের উপর সেজন্য তিনি কিছুমাত্র দোষার্পণ করেন নাই। ঐ

বিষয়ে স্বামীজী ইহাও কিন্তু বলিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্ত্যদেশে বাদের মূল বিষয় ছাড়িয়া ঐরূপে ভাষায় সামান্য ভুল ধরা প্রতিপক্ষের পক্ষে মহা অসৌজন্যজ্ঞাপক। সভ্যসমাজ ঐরূপ স্থলে ভাবটাই লয়—ভাষার দিকে লক্ষ্য করে না। "তোদের দেশে কিন্তু খোসা লইয়াই মারামারি চলছে—ভিতরকার শস্যের কেহই অনুসন্ধান করে না।" এই বলিয়া স্বামীজী শিষ্যের সঙ্গে সেদিন সংস্কৃতে আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। শিষ্যও ভাঙ্গা ভাঙ্গা সংস্কৃতে জবাব দিতে লাগিল। তথাপি তিনি তাহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঐদিন হইতে শিষ্য স্বামীজীর অনুরোধে তাঁহার সঙ্গে প্রায়ই মধ্যে মধ্যে দেবভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত।

'সভ্যতা' কাহাকে বলে—তদুত্তরে সেদিন স্বামীজী বলেন যে, যে সমাজ বা যে জাতি আধ্যাত্মিক ভাবে যত অগ্রসর, সে সমাজ ও সে জাতি তত সভ্য। নানা কল-কারখানা করিয়া ঐহিক জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিতে পারিলেই যে জাতি বিশেষ সভ্য হইয়াছে তাহা বলা চলে না। বর্ত্তমান পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা লোকের হাহাকার ও অভাবই দিন দিন বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে। পরন্তু ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা সর্ব্বসাধারণকে আধ্যাত্মিক উন্নতির পন্থা প্রদর্শন করিয়া লোকের ঐহিক অভাব এককালে দূর করিতে না পারিলেও অনেকটা কমাইতে নিঃসন্দেহে সমর্থ হইয়াছিল। ইদানীন্তন কালে ঐ উভয় সভ্যতার একত্র সংযোগ করিতেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। একালে একদিকে যেমন লোককে কর্ম্ম-তৎপর হইতে হইবে, অপরদিকে তাঁহাকে তেমনি গভীর অধ্যাত্ম-

জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। এইরূপে ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অন্যোন্যসংমিশ্রণে জগতে যে নবযুগের অভ্যুদয় হইবে, একথা স্বামীজী সেদিন বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। ঐ কথা বুঝাইতে বুঝাইতে একস্থলে স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "আর এক কথা—ওদেশের লোকেরা ভাবে, যে যত ধর্ম্মপরায়ণ হবে, সে বাহিরের চালচলনে তত গম্ভীর হবে; মুখে অন্য কথাটি থাকবে না। একদিকে আমার মুখে উদার ধর্ম্মকথা শুনে ওদেশের ধর্ম্মযাজকেরা যেমন অবাক্ হয়ে যেতো, বক্তৃতান্তে বন্ধুবান্ধবদের সহিত ফষ্টিনাষ্টি করতে দেখে আবার তেমনি অবাক্ হয়ে যেতো। মুখের উপর কখন কখন বলেও ফেল্‌তো, 'স্বামীজী, আপনি একজন ধর্ম্মযাজক, সাধারণ লোকের মত এরূপ হাসি-তামাসা করা আপনার উচিত নয়। আপনার ওরূপ চপলতা শোভা পায় না।' তদুত্তরে আমি বলতাম, 'We are children of bliss—why should we look morose and sombre?' (আমরা আনন্দের সন্তান, আমরা বিরস বদনে থাক্‌ব কেন?) ঐ কথা শুনে তারা মর্ম্মগ্রহণ করতে পারত কি না সন্দেহ।"

সেদিন স্বামীজী ভাবসমাধি ও নির্ব্বিকল্পসমাধি সম্বন্ধেও নানা কথা বলিয়াছিলেন। যতদূর সাধ্য নিম্নে তাহার পুনরাবৃত্তি করা গেল।

"মনে কর, একজন হনুমানের মত ভক্তিভাবে ঈশ্বরের সাধনা করছে। ভাবের যত গাঢ়তা হতে থাকবে ঐ সাধকের চলন-বলন, ভাবভঙ্গী, এমন কি শারীরিক গঠনাদিও ঐরূপ হয়ে আসবে। 'জাত্যন্তরপরিণাম' ঐরূপেই হয়। ঐরূপ একটা ভাব নিয়ে সাধক ক্রমে তদাকারাকারিত হয়ে যায়। কোন প্রকার ভাবের

চরমাবস্থার নামই 'ভাবসমাধি'। আর 'আমি দেহ নই', 'মন নই', 'বুদ্ধি নই'—এইরূপে 'নেতি', 'নেতি' করতে করতে জ্ঞানী সাধক চিন্মাত্রসত্তায় অবস্থিত হলে নির্ব্বিকল্পসমাধিলাভ হয়। এক একটা ভাব নিয়েই সিদ্ধ হতে বা ঐ ভাবের চরমাবস্থায় পৌছতে কত জন্মের চেষ্টা লাগে। ভাবরাজ্যের রাজা আমাদের ঠাকুর কিন্তু আঠারটি ভাবে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। ভাবমুখে না থাকলে তাঁর শরীর থাকত না—একথাও ঠাকুর বলতেন।"

কথায় কথায় শিষ্য ঐদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মহাশয়, ওদেশে কিরূপ আহারাদি করিতেন?"

স্বামীজী। ওদেশের মতই খেতুম। আমরা সন্ন্যাসী, আমাদের কিছুতেই জাত যায় না।

এদেশে তিনি ভবিষ্যতে কি প্রণালীতে কার্য্য করিবেন, তৎসম্বন্ধেও ঐদিন স্বামীজী বলেন যে, মান্দ্রাজ ও কলিকাতায় দুইটি কেন্দ্র করিয়া সর্ব্ববিধ লোককল্যাণার্থ নূতন ধরণে সাধুসন্ন্যাসী তৈয়ারী করিবেন। আরও বলিলেন যে, destruction দ্বারা বা প্রাচীন রীতিসমূহ অযথা ভাঙ্গিয়া সমাজ বা দেশের উন্নতি করা যায় না। সর্ব্বকালে সর্ব্বদিনে উন্নতিলাভ constructive process-এর দ্বারা অর্থাৎ প্রাচীন রীতি প্রভৃতিকে নূতনভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া গড়িয়াই হইয়াছে। ভারতবর্ষের ধর্ম্মপ্রচারক মাত্রই পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে ঐরূপে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। একমাত্র বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম destructive (প্রাচীন রীতিনীতির ধ্বংসকারী) ছিল। সেইজন্য ঐ ধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে।

শিষ্যের মনে হয়, স্বামীজী ঐভাবে কথা কহিতে কহিতে বলিতে

লাগিলেন—একটি জীবের মধ্যে ব্রহ্মবিকাশ হইলে হাজার হাজার লোক সেই আলোকে পথ পাইয়া অগ্রসর হয়। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরাই একমাত্র লোকগুরু। একথা সর্ব্বশাস্ত্রে ও যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হয়। অবৈদিক অশাস্ত্রীয় কুলগুরুপ্রথা স্বার্থপর ব্রাহ্মণেরাই এদেশে প্রচলন করিয়াছে। সেই জন্যই সাধন করিয়াও লোক এখন সিদ্ধ বা ব্রহ্মজ্ঞ হইতে পারিতেছে না। ধর্ম্মের এইসকল গ্লানি দূর করিতেই ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ শরীরধারণ করিয়া বর্ত্তমান যুগে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার প্রদর্শিত সার্ব্বভৌম মত জগতে প্রচারিত হইলে জগতের এবং জীবের মঙ্গল হইবে। এমন অদ্ভুত মহাসমন্বয়াচার্য্য বহুশতাব্দী যাবৎ ভারতবর্ষে ইতঃপূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন নাই।

স্বামীজীর একজন গুরুভ্রাতা এই সময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ওদেশে সর্ব্বদা সর্ব্বসমক্ষে ঠাকুরকে অবতার বলিয়া প্রচার করিলে না কেন?"

স্বামীজী। ওরা দর্শন-বিজ্ঞানের বড় বড়াই করে। তাই যুক্তি তর্ক দর্শন বিজ্ঞান দিয়ে ওদের জ্ঞানগরিমা চূর্ণ করে দিতে না পারলে কোন কিছু প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তর্কে খেই হারিয়ে যারা যথার্থ তত্ত্বান্বেষী হয়ে আমার কাছে আসতো, তাদের কাছে ঠাকুরের কথা কইতুম। নতুবা একেবারে অবতারবাদের কথা বললে ওরা বলতো, 'ও আর তুমি নূতন কি বলছো— আমাদের প্রভু ঈশাই ত রয়েছেন।'

তিন-চারি ঘণ্টাকাল ঐরূপে মহানন্দে অতিবাহিত করিয়া শিষ্য সেদিন অন্যান্য আগন্তুক ব্যক্তিদিগের সহিত কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিল।

চতুর্থ বল্লী

স্থান—শ্রীনবগোপাল ঘোষের বাড়ী
রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া

বর্ষ—১৮৯৮ (জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী)

নবগোপাল বাবুর বাটীতে ঠাকুরপ্রতিষ্ঠা—স্বামীজীর দীনতা—নবগোপাল বাবুর পরিবারস্থ সকলের শ্রীরামকৃষ্ণপ্রাণতা—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রণাম-মন্ত্র।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল ঘোষ মহাশয় ভাগীরথীর পশ্চিম পারে হাওড়ার অন্তর্গত রামকৃষ্ণপুরে নূতন বসতবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উক্ত বাটীর নিমিত্ত জমি ক্রয় করিবার সময় স্থানটির 'রামকৃষ্ণপুর' নাম জানিয়া তিনি বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন; কারণ ঐ গ্রামের নাম করিলেই তাঁহার ইষ্টদেবের কথা স্মরণে আসিবে। বাড়ী তৈয়ার হওয়ার কয়েকদিন পরেই স্বামীজী প্রথমবার বিলাত হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। সুতরাং ঘোষজ ও তাঁহার গৃহিণীর একান্ত ইচ্ছা—স্বামীজী দ্বারা বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিগ্রহ স্থাপন করিবেন। ঘোষজ মঠে যাইয়া ঐ কথা কয়েকদিন পূর্ব্বে উত্থাপন করিয়াছিলেন। স্বামীজীও তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। নবগোপাল বাবুর বাটীতে আজ তদুপলক্ষে উৎসব—মঠধারী সন্ন্যাসী ও ঠাকুরের গৃহী ভক্তগণ সকলেই আজ তথায় ঐ জন্য সাদরে নিমন্ত্রিত। বাড়ীখানি আজ ধ্বজপতাকায় পরিশোভিত, সামনের ফটকে পূর্ণঘট, কদলীবৃক্ষ, দেবদারুপাতার তোরণ এবং আম্রপত্রের ও পুষ্পমালার সারি। 'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনিতে রামকৃষ্ণপুর আজ প্রতিধ্বনিত।

মঠ হইতে তিনখানি ডিঙ্গি ভাড়া করিয়া স্বামীজী-সমভিব্যাহারে মঠের যাবতীয় সন্ন্যাসী ও বালকব্রহ্মচারিগণ রামকৃষ্ণপুরের ঘাটে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজীর পরিধানে গেরুয়া রঙ্গের বহির্বাস, মাথায় পাগড়ি—খালি পা। রামকৃষ্ণপুরের ঘাট হইতে তিনি যে পথে নবগোপাল বাবুর বাড়ীতে যাইবেন, সেই পথের দুইধারে অগণ্য লোক তাঁহাকে দর্শন করিবে বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ঘাটে নামিয়াই স্বামীজী "দুখিনী ব্রাহ্মণীকোলে কে শুয়েছে আলো করে, কেরে ওরে দিগম্বর এসেছে কুটীরঘরে" গানটি করিয়া স্বয়ং খোল বাজাইতে বাজাইতে অগ্রসর হইলেন; আর দুই-তিন খানা খোলও সঙ্গে সঙ্গে বাজিতে লাগিল এবং সমবেত ভক্তগণের সকলেই সমস্বরে ঐ গান গাহিতে গাহিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। উদ্দাম নৃত্য ও মৃদঙ্গধ্বনিতে পথ ঘাট মুখরিত হইয়া উঠিল; যাইতে যাইতে দলটি শ্রীযুক্ত রামলাল ডাক্তার বাবুর বাড়ীর কাছে অল্পক্ষণ দাঁড়াইল। রামলাল বাবুও শশব্যস্তে বাটীর বাহির হইয়া সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। লোকে মনে করিয়াছিল—স্বামীজী কত সাজসজ্জা ও আড়ম্বরে অগ্রসর হইবেন। কিন্তু যখন দেখিল, তিনি অন্যান্য মঠধারী সাধুগণের ন্যায় সামান্য পরিচ্ছদে খালি পায়ে মৃদঙ্গ বাজাইতে বাজাইতে আসিতেছেন, তখন অনেকে তাঁহাকে প্রথম চিনিতেই পারিল না এবং অপরকে জিজ্ঞাসা করিয়া পরিচয় পাইয়া বলিতে লাগিল, 'ইনিই বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ!' স্বামীজীর এই অমানুষিক দীনতা দেখিয়া সকলেই একবাক্যে প্রশংসা করিতে এবং 'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনিতে গ্রাম্য পথ মুখরিত করিতে লাগিল।

গৃহীর আদর্শস্থল নবগোপাল বাবুর প্রাণ আজ আনন্দে ভরিয়া গিয়াছে। ঠাকুর ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গগণের সেবার জন্য বিপুল আয়োজন করিয়া তিনি চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিয়া তত্ত্বাবধান করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে 'জয় রাম', 'জয় রাম' বলিয়া উল্লাসে চীৎকার করিতেছেন।

ক্রমে দলটি নবগোপাল বাবুর বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র গৃহমধ্যে শাঁক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। স্বামীজী মৃদঙ্গ নামাইয়া বৈঠকখানার ঘরে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া ঠাকুরঘর দেখিতে উপরে চলিলেন। ঠাকুরঘরখানি মর্ম্মর প্রস্তরে গ্রথিত। মধ্যস্থলে সিংহাসন, তদুপরি ঠাকুরের পোরসিলেনের প্রতিমূর্ত্তি। হিন্দুর ঠাকুরপূজায় যে যে উপকরণের আবশ্যক, আয়োজনে তাহার কোন অঙ্গে কোন ত্রুটি নাই। স্বামীজী দেখিয়া বিশেষ প্রসন্ন হইলেন।

নবগোপাল বাবুর গৃহিণী অপরাপর কুলবধূগণের সহিত স্বামীজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন এবং পাখা লইয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন।

স্বামীজীর মুখে সকল বিষয়ের সুখ্যাতি শুনিয়া গৃহিণীঠাকুরাণী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমাদের সাধ্য কি যে ঠাকুরের সেবাধিকার লাভ করি? সামান্য ঘর, সামান্য অর্থ—আপনি আজ নিজে কৃপা করিয়া ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমাদের ধন্য করুন।"

স্বামীজী তদুত্তরে রহস্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমাদের ঠাকুর ত এমন মারবেলপাথর-মোড়া ঘরে চৌদ্দপুরুষে বাস

করেন নি। সেই পাড়াগাঁয়ে খোড়ো ঘরে জন্ম; যেন-তেন করে দিন কাটিয়ে গেছেন। এখানে এমন উত্তম সেবায় যদি তিনি না থাকেন ত আর কোথায় থাকবেন?" সকলেই স্বামীজীর কথা শুনিয়া হাস্য করিতে লাগিল। এইবার বিভূতিভূষাঙ্গ স্বামীজী সাক্ষাৎ মহাদেবের ন্যায় পূজকের আসনে বসিয়া ঠাকুরকে আবাহন করিলেন।

পরে স্বামী প্রকাশানন্দ স্বামীজীর কাছে বসিয়া মন্ত্রাদি বলিয়া দিতে লাগিলেন। পূজার নানা অঙ্গ ক্রমে সমাধা হইল এবং নীরাজনের শাঁক-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। স্বামী প্রকাশানন্দই উহা সম্পাদন করিলেন।

নীরাজনান্তে স্বামীজী পূজার ঘরে বসিয়া বসিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের প্রণতিমন্ত্র মুখে মুখে এইরূপ রচনা করিয়া দিলেন—

"স্থাপকায় চ ধর্ম্মস্য সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥"

সকলেই এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলে শিষ্য ঠাকুরের একটি স্তব পাঠ করিল। এইরূপে পূজা সম্পন্ন হইল। নীচে সমাগত ভক্তমণ্ডলী অতঃপর কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। স্বামীজী উপরেই রহিলেন, বাড়ীর মেয়েরা স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া ধর্ম্মসংক্রান্ত নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

শিষ্য পরিবারস্থ সকলের রামকৃষ্ণগতপ্রাণতা দেখিয়া অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল এবং ইঁহাদিগের সঙ্গে আপন নরজন্ম সার্থক বোধ করিতে লাগিল।

অনন্তর ভক্তগণ প্রসাদ গ্রহণ করিয়া আচমনান্তে নীচে গিয়া খানিক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ক্রমে সন্ধ্যাগমে সেই ভক্তসঙ্ঘ ছোট ছোট দলবদ্ধ হইয়া নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিতে লাগিল। শিষ্য ও স্বামীজীর সঙ্গে গাড়ীতে করিয়া রামকৃষ্ণপুরের ঘাটে নৌকায় উঠিল এবং আনন্দে নানা কথা কহিতে কহিতে বাগবাজারের দিকে অগ্রসর হইল।

পঞ্চম বল্লী

স্থান—দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী ও আলমবাজার মঠ।

বর্ষ—১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ, মার্চ্চ মাস

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের শেষ জন্মোৎসব—ধর্ম্মরাজ্যে উৎসব-পার্ব্বণাদির প্রয়োজন—অধিকারিভেদে সকল প্রকার লোকব্যবহারের আবশ্যকতা—স্বামীজীর ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্য একটি নূতন সম্প্রদায়গঠন নহে।

স্বামীজী যে সময়ে ইংলণ্ড হইতে প্রথমবার ফিরিয়া আসেন, তখন আলমবাজারে রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠিত ছিল। মঠের বাড়ীটাকে লোকে 'ভূতের বাড়ী' বলিত। কিন্তু সন্ন্যাসিগণের সংসর্গে ঐ ভূতের বাড়ী রামকৃষ্ণতীর্থরূপে পরিণত হইয়াছিল। তথায় কত সাধন-ভজন, কত জপ-তপস্যা, কত শাস্ত্রপ্রসঙ্গ ও নামকীর্ত্তন হইয়াছিল, তাহার আর পরিসীমা নাই। কলিকাতায় রাজোচিত অভ্যর্থনা লাভ করিয়া স্বামীজী ঐ ভগ্ন মঠেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। আর, কলিকাতার অধিবাসিগণ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া একমাস কাল থাকিবার জন্য তাঁহার নিমিত্ত কলিকাতার উত্তরে কাশীপুরে গোপাললাল শীলের বাগানবাটীতে যে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, সেস্থানেও মধ্যে মধ্যে আসিয়া অবস্থান করিয়া দর্শনোৎসুক জনসঙ্ঘের সহিত ধর্ম্মালাপাদি করত তাহাদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব নিকটবর্ত্তী। দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে এবার উৎসবের বিপুল আয়োজন হইয়াছে। রামকৃষ্ণসেবকগণের ত কথাই নাই, ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিমাত্রেরই আনন্দ ও উৎসাহের পরিসীমা নাই। কারণ বিশ্ববিজয়ী স্বামীজী

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভবিষ্যদ্বাণী সফল করিয়া এ বৎসর প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণ আজ তাঁহাকে পাইয়া যেন শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গসুখ অনুভব করিতেছেন। কালীমন্দিরের দক্ষিণে বিস্তৃত রন্ধনশালায় ভোগ প্রস্তুত হইতেছে। স্বামীজী তাঁহার কয়েক-জন গুরুভ্রাতাসহ বেলা ৯টা—১০টা আন্দাজ উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার নগ্ন পদ, শীর্ষে গৈরিকবর্ণের উষ্ণীষ। জনসঙ্ঘ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে—তাঁহার সেই অনিন্দিত রূপ দর্শন করিবে, সেই পাদপদ্ম স্পর্শ করিবে এবং তাঁহার শ্রীমুখের সেই জ্বলন্ত অগ্নিশিখাসম বাণী শুনিয়া ধন্য হইবে বলিয়া। তাই আজ আর স্বামীজীর তিলার্দ্ধ বিশ্রামের সময় নাই। মা কালীর মন্দিরের সম্মুখে অসংখ্য লোক। স্বামীজী শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র শির অবনত হইল। পরে ৺রাধাকান্তজীউকে প্রণাম করিয়া তিনি এইবার ঠাকুরের বাসগৃহে আগমন করিলেন। সে প্রকোষ্ঠে এখন আর তিলমাত্র স্থান নাই। 'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনিতে কালীবাড়ীর দিঙ্‌মুখসকল মুখরিত হইতেছে। শত সহস্র দর্শককে ক্রোড়ে করিয়া বার বার কলিকাতা হইতে হোর্ মিলার কোম্পানীর জাহাজ যাতায়াত করিতেছে। নহবতের তানতরঙ্গে সুরধুনী নৃত্য করিতেছেন। উৎসাহ, আকাঙ্ক্ষা, ধর্ম্মপিপাসা ও অনুরাগ মূর্ত্তিমান্ হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণরূপে ইতস্ততঃ বিরাজ করিতেছে। এবারকার এই উৎসব প্রাণে বুঝিবার জিনিস—ভাষায় ব্যক্ত করিবার নহে!

স্বামীজীর সহিত আগত দুইটি ইংরেজ মহিলাও উৎসবে আসিয়াছেন। তাঁহাদের সহিত পরিচয় শিষ্যের এখনও হয় নাই।

স্বামীজী তাঁহাদের সঙ্গে করিয়া পবিত্র পঞ্চবটী ও বিল্বমূল দর্শন করাইতেছেন। স্বামীজীর সঙ্গে এখনও তেমন বিশেষ পরিচয় না হইলেও শিষ্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া ঐ উৎসবসম্বন্ধীয় স্বরচিত একটি সংস্কৃত স্তব স্বামীজীর হস্তে প্রদান করিল। স্বামীজীও উহা পড়িতে পড়িতে পঞ্চবটীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে শিষ্যের দিকে একবার তাকাইয়া বলিলেন, "বেশ হয়েছে, আরও লিখবে।"

পঞ্চবটীর একপার্শ্বে ঠাকুরের গৃহী ভক্তগণের সমাবেশ হইয়াছিল। গিরিশ বাবু[১] পঞ্চবটীর উত্তরে গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া বসিয়া ছিলেন এবং তাঁহাকে ঘিরিয়া অন্যান্য ভক্তগণ শ্রীরামকৃষ্ণ-গুণগানে ও কথাপ্রসঙ্গে আত্মহারা হইয়া বসিয়াছিলেন। ইত্যবসরে বহুজনসমভিব্যাহারে স্বামীজী গিরিশ বাবুর নিকট উপস্থিত হইয়া "এই যে ঘোষজ!" বলিয়া গিরিশ বাবুকে প্রণাম করিলেন। গিরিশ বাবুও তাঁহাকে করযোড়ে প্রতিনমস্কার করিলেন। গিরিশ বাবুকে পূর্ব্ব কথা স্মরণ করাইয়া স্বামীজী বলিলেন, "ঘোষজ,. সেই একদিন আর এই একদিন।" গিরিশ বাবুও স্বামীজীর কথায় সম্মতি জানাইয়া বলিলেন, "তা বটে; তবু এখনও সাধ যায় আরও দেখি।" এইরূপে উভয়ের মধ্যে যে-সকল কথা হইল তাহার মর্ম্ম বাহিরের লোকের অনেকেই পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন না। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর স্বামীজী পঞ্চবটীর উত্তর-পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত বিল্ববৃক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন। স্বামীজী চলিয়া যাইলে গিরিশ বাবু উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া

১ মহাকবি ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ

বলিলেন, "একদিন হরমোহন (মিত্র) কি খবরের কাগজ দেখে এসে বললে যে, স্বামীজীর নামে আমেরিকায় কি একটা কুৎসা রটেছে। আমি তখন তাকে বলেছিলেম, নরেনকে যদি নিজচক্ষে কিছু অন্যায় করতে দেখি তবে বলবো আমার চক্ষের দোষ হয়েছে— চোক্ উপড়ে ফেলবো। ওরা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তোলা মাখন, ওরা কি আর জলে মেশে? যে-কেউ ওদের দোষ ধরতে যাবে, তাদের নরক হবে।" এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময়ে স্বামী নিরঞ্জনানন্দ গিরিশ ঘোষ মহাশয়ের কাছে আসিলেন এবং একটা থেলো হুঁকা লইয়া তামাক খাইতে খাইতে কলম্বো হইতে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন-কাল পর্য্যন্ত ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে জনসাধারণ শ্রীস্বামীজীকে যে অপূর্ব্বভাবে আদর-অভ্যর্থনাদি করিয়াছে এবং তিনি তাহাদের যে-সকল অমূল্য উপদেশ বক্তৃতাচ্ছলে বলিয়াছেন, তাহার কতক কতক বর্ণনা করিতে লাগিলেন। গিরিশ বাবু শুনিতে শুনিতে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন।

সেদিন দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাড়ীর সর্ব্বত্রই একটা দিব্যভাবের বন্যা ঐরূপে বহিয়া যাইতেছিল। এইবার সেই বিরাট জনসঙ্ঘ স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিতে উদ্‌গ্রীব হইয়া দণ্ডায়মান হইল। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও স্বামীজী লোকের কলরবের অপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা করিতে পারিলেন না। অগত্যা বক্তৃতার উদ্যম পরিত্যাগ করিয়া তিনি আবার ইংরেজ মহিলা দুইটিকে সঙ্গে লইয়া ঠাকুরের সাধনস্থান দেখাইতে ও শ্রীঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত ও অন্তরঙ্গগণের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিতে লাগিলেন। ইংরেজ মহিলারা ধর্ম্ম-শিক্ষার জন্য তাঁহার সঙ্গে দূর দেশ হইতে আসিয়াছেন দেখিয়া

দর্শকগণের মধ্যে কেহ কেহ আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার অদ্ভুত শক্তির কথা বলাবলি করিতে লাগিল।

বেলা তিনটার পর স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, "একখানা গাড়ী আখ্‌—মঠে যেতে হবে।" অনন্তর আলমবাজার পর্য্যন্ত যাইবার ভাড়া দুই আনা ঠিক করিয়া শিষ্য গাড়ী লইয়া উপস্থিত হইলে স্বামীজী স্বয়ং গাড়ীর একদিকে বসিয়া এবং স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও শিষ্যকে অন্যদিকে বসাইয়া আলমবাজার মঠের দিকে আনন্দে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন, "কেবল abstract idea (জীবনে ও কার্য্যে অপরিণত ভাব) নিয়ে পড়ে থাকলে কি হবে? এইসকল উৎসব প্রভৃতিরও দরকার; তবে ত mass-এর ভেতর এইসকল ভাব ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়বে। এই যে হিন্দুদের বার মাসে তের পার্ব্বণ—এর মানেই হচ্ছে ধর্ম্মের বড় বড় ভাবগুলি ক্রমশঃ লোকের ভেতর প্রবেশ করিয়ে দেওয়া। ওর একটা দোষও আছে। সাধারণলোকে ঐ-সকলের প্রকৃত ভাব না বুঝে ঐসকলে মত্ত হয়ে যায়, আর ঐ উৎসব-আমোদ থেমে গেলেই আবার যা, তাই হয়। সেজন্য ওগুলি ধর্ম্মের বহিরাবরণ, প্রকৃত ধর্ম্ম ও আত্মজ্ঞানকে ঢেকে রেখে দেয়, এ কথা সত্য।

"কিন্তু যারা ধর্ম্ম কি, আত্মা কি, এসব কিছুমাত্র বুঝতে পারে না, তাঁরা ঐ উৎসব-আমোদের মধ্য দিয়ে ক্রমে ধর্ম্ম বুঝতে চেষ্টা করে। মনে কর্, এই যে আজ ঠাকুরের জন্মোৎসব হয়ে গেল, এর মধ্যে যারা সব এসেছে তারা ঠাকুরের বিষয় একবারও ভাববে। যাঁর নামে এত লোক একত্রিত হয়েছিল, তিনি কে,

তাঁর নামেই বা এত লোক এল কেন—একথা তাদের মনে উদয় হবে। যাদের তাও না হবে, তারাও এই কীর্ত্তন দেখতে ও প্রসাদ পেতেও অন্ততঃ বছরে একবার আসবে আর ঠাকুরের ভক্তদের দেখে যাবে। তাতে তাদের উপকার বই অপকার হবে না।”

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, ঐ উৎসব-কীর্ত্তনই যদি সার বলিয়া কেহ বুঝিয়া লয়, তবে সে আর অধিক অগ্রসর হইতে পারে কি? আমাদের দেশে ষষ্ঠীপূজা, মঙ্গলচণ্ডীর পূজা প্রভৃতি যেমন নিত্যনৈমিত্তিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহাও সেইরূপ একটা হইয়া দাঁড়াইবে। মরণ পর্য্যন্ত লোকে ঐসব করিয়া যাইতেছে, কিন্তু কই এমন লোক ত দেখিলাম না, যে ঐসকল পূজা করিতে করিতে ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া উঠিল!

স্বামীজী। কেন? এই যে ভারতে এত ধর্ম্মবীর জন্মেছিলেন—তাঁরা ত সকলে ঐগুলিকে ধরে উঠেছেন এবং অত বড় হয়েছেন। ঐগুলিকে ধরে সাধন করতে করতে যখন আত্মার দর্শনলাভ হয়, তখন আর ঐ সকলে আঁট থাকে না। তবু লোকসংস্থিতির জন্য অবতারকল্প মহাপুরুষেরাও ঐগুলি মেনে চলেন।

শিষ্য। লোক-দেখান মানিতে পারেন—কিন্তু আত্মজ্ঞের কাছে যখন এ সংসারই ইন্দ্রজালবৎ অলীক বোধ হয়, তখন তাঁহাদের কি আবার ঐসকল বাহ্য লোকব্যবহারকে সত্য বলিয়া মনে হইতে পারে?

স্বামীজী। কেন পারবে না? সত্য বলতে আমরা যা বুঝি তাও ত relative—দেশকালপাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন। অতএব সকল

ব্যবহারেরই প্রয়োজন আছে অধিকারিভেদে। ঠাকুর যেমন বলতেন, "মা কোন ছেলেকে পোলাও কালিয়া রেঁধে দেন, কোন ছেলেকে বা সাগুপথ্য দেন"—সেইরূপ।

শিষ্য কথাটি এতক্ষণে বুঝিয়া স্থির হইল। দেখিতে দেখিতে গাড়ী আলমবাজার মঠে উপস্থিত। শিষ্য গাড়ীভাড়া দিয়া স্বামীজীর সঙ্গে মঠের ভিতরে চলিল এবং স্বামীজীর পিপাসা পাওয়ায় জল আনিয়া দিল। স্বামীজী জলপান করিয়া জামা খুলিয়া ফেলিলেন এবং মেজেতে পাতা সতরঞ্চির উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ পার্শ্বে বসিয়া বলিতে লাগিলেন, "এমন ভিড় উৎসবে আর কখন হয় নি। যেন কলকাতাটা ভেঙ্গে এসেছিল।"

স্বামীজী। তা হবে না? এর পর আরও কত কি হবে!

শিষ্য। মহাশয়, প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়েই দেখা যায় কোন না কোন বাহ্য উৎসব-আমোদ আছেই। কিন্তু কাহারও সঙ্গে কাহারও মিল নাই। এমন যে উদার মহম্মদের ধর্ম্ম, তাহার মধ্যেও ঢাকা শহরে দেখিয়াছি শিয়াসুন্নীতে লাঠালাঠি হয়।

স্বামীজী। সম্প্রদায় হলেই ওটা অল্পাধিক হবে। তবে এখানকার ভাব কি জানিস্?—সম্প্রদায়বিহীনতা। আমাদের ঠাকুর ঐটেই দেখাতে জন্মেছিলেন। তিনি সব মানতেন—আবার বলতেন, "ব্রহ্মজ্ঞানের দিক দিয়ে দেখলে ওসকলই মিথ্যা মায়া মাত্র।"

শিষ্য। মহাশয়, আপনার কথা বুঝিতে পারিতেছি না; মধ্যে মধ্যে আমার মনে হয়, আপনারাও এইরূপে উৎসব-প্রচারাদি করিয়া

ঠাকুরের নামে আর একটা সম্প্রদায়ের সূত্রপাত করিতেছেন। আমি নাগ মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, ঠাকুর কোন দলভুক্ত ছিলেন না। শাক্ত, বৈষ্ণব, ব্রহ্মজ্ঞানী, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলের ধর্ম্মকেই তিনি বহুমান দিতেন।

স্বামীজী। তুই কি করে জান্‌লি, আমরা সকল ধর্ম্মমতকে ঐরূপে বহুমান দিই নাই ?

এই বলিয়া স্বামীজী নিরঞ্জন মহারাজকে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ওরে, এ বাঙ্গাল বলে কি ?"

শিষ্য। মহাশয়, কৃপা করিয়া ঐ কথা আমায় বুঝাইয়া দিন।

স্বামীজী। তুই ত আমার বক্তৃতা পড়েছিস্। কই, কোথায় ঠাকুরের নাম করেছি ? খাঁটি উপনিষদের ধর্ম্মই ত জগতে বলে বেড়িয়েছি।

শিষ্য। তা বটে। কিন্তু আপনার সঙ্গে পরিচিত হইয়া দেখিতেছি, আপনার রামকৃষ্ণগত প্রাণ। যদি ঠাকুরকে ভগবান বলিয়াই জানিয়া থাকেন, তবে কেন ইতরসাধারণকে তাহা একেবারে বলিয়া দিন না।

স্বামীজী। আমি যা বুঝেছি তা বলছি। তুই যদি বেদান্তের অদ্বৈতমতটিকে ঠিক ধর্ম্ম বলে বুঝে থাকিস্, তা হলে লোককে তা বুঝিয়ে দে না কেন ?

শিষ্য। আগে অনুভব করিব, তবে ত বুঝাইব। ঐ মত আমি শুধু পড়িয়াছি মাত্র।

স্বামীজী। তবে আগে অনুভূতি কর্। তারপর লোককে বুঝিয়ে দিবি। এখন লোকে প্রত্যেকে যে এক একটা মতে বিশ্বাস

কোরে চলে যাচ্ছে—তাতে তোর ত বলবার কিছু অধিকার নাই। কারণ, তুইও ত এখন তাদের মত একটা ধর্ম্মমতে বিশ্বাস করে চলেছিস্ বই ত নয়।

শিষ্য। হাঁ, আমিও একটা বিশ্বাস করিয়া চলিয়াছি বটে; কিন্তু আমার প্রমাণ—শাস্ত্র। আমি শাস্ত্রের বিরোধী মত মানি না।

স্বামীজী। শাস্ত্র মানে কি? উপনিষদ্ প্রমাণ হলে, বাইবেল জেন্দাবেস্তাই বা প্রমাণ হবে না কেন?

শিষ্য। এইসকল গ্রন্থের প্রামাণ্য স্বীকার করিলেও বেদের মত উহারা ত আর প্রাচীন গ্রন্থ নহে। আবার আত্মতত্ত্ব-সমাধান বেদে যেমন আছে, এমন ত আর কোথাও নাই।

স্বামীজী। বেশ, তোর কথা নয় মেনেই নিলুম। কিন্তু বেদ ভিন্ন আর কোথাও যে সত্য নাই, একথা বলবার তোর কি অধিকার?

শিষ্য। বেদ ভিন্ন অন্য সকল ধর্ম্মগ্রন্থে সত্য থাকিতে পারে, তদ্বিষয়ের বিরুদ্ধে আমি কিছু বলিতেছি না; কিন্তু আমি উপনিষদের মতই মেনে যাব। আমার এতে খুব বিশ্বাস।

স্বামীজী। তা কর্, তবে আর কারও যদি ঐরূপ কোন মতে 'খুব' বিশ্বাস হয়, তবে তাকেও ঐ বিশ্বাসে চলে যেতে দিস্। দেখ্‌বি—পরে তুই ও সে এক জায়গায় পৌঁছিবি। মহিম্নস্তবে পড়িস্ নি?—"ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।"

ষষ্ঠ বল্লী

স্থান—আলমবাজার মঠ

বর্ষ—১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ, মে মাস

স্বামীজীর শিষ্যকে দীক্ষাদান—দীক্ষার পূর্ব্বে প্রশ্ন—যজ্ঞসূত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বেদের কথা—আপনার মোক্ষ ও জগতের কল্যাণ-চিন্তনে যাহাতে সর্ব্বদা মনকে নিবিষ্ট রাখে তাহাই দীক্ষা—পাপ-পুণ্যের উৎপত্তি 'অহং'-ভাব হইতে—ক্ষুদ্র আমিত্বের ত্যাগেই আত্মার প্রকাশ—মনের লোপেই যথার্থ আমিত্বের প্রকাশ—সেই 'আমি'র স্বরূপ—'কালেনাত্মনি বিন্দতি।'

স্বামীজী দার্জ্জিলিং হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। আলমবাজার মঠেই অবস্থান করিতেছেন। গঙ্গাতীরে কোন স্থানে মঠ উঠাইয়া লইবার জল্পনা হইতেছে। শিষ্য আজকাল প্রায়ই মঠে তাঁহার নিকটে যাতায়াত করে ও মধ্যে মধ্যে রাত্রিতে অবস্থানও করিয়া থাকে। শিষ্যের জীবনের প্রথম পথ-প্রদর্শক নাগ মহাশয় তাহাকে মন্ত্র-দীক্ষা দেন নাই এবং মন্ত্রগ্রহণের কথা তুলিলে স্বামীজীর কথা পাড়িয়া তাহাকে বলিতেন, "স্বামীজী মহারাজ জগতের গুরু হইবার যোগ্য।" দীক্ষাগ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া শিষ্য সেজন্য স্বামীজীকে দার্জ্জিলিং-এ ইতঃপূর্ব্বে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিল। স্বামীজী তদুত্তরে লিখেন, "নাগ মহাশয়ের আপত্তি না হইলে তোমাকে অতি আনন্দের সহিত দীক্ষিত করিব।" চিঠিখানি শিষ্যের নিকটে এখনও আছে।

১৩০৩ সালের ১৯শে বৈশাখ। স্বামীজী আজ শিষ্যকে দীক্ষা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আজ শিষ্যের জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ দিন। শিষ্য প্রত্যূষে গঙ্গাস্নানান্তে কতকগুলি লিচু ও অন্য

দ্রব্যাদি কিনিয়া বেলা ৮টা আন্দাজ আলমবাজার মঠে উপস্থিত হইয়াছে। শিষ্যকে দেখিয়া স্বামীজী রহস্য করিয়া বলিলেন, "আজ তোকে 'বলি' দিতে হবে—না?"

স্বামীজী শিষ্যকে ঐ কথা বলিয়া আবার হাস্যমুখে সকলের সঙ্গে আমেরিকার নানা প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মজীবনগঠন করিতে হইলে কিরূপ একনিষ্ঠ হইতে হয়, গুরুতে কিরূপ অচল বিশ্বাস ও দৃঢ় ভক্তিভাব রাখিতে হয়, গুরুবাক্যে কিরূপ আস্থা স্থাপন করিতে হয় এবং গুরুর জন্য কিরূপে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইতে হয়—এসকল প্রসঙ্গও সঙ্গে সঙ্গে হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি শিষ্যকে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া তাহার হৃদয় পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, "আমি তোকে যখন যে কাজ করতে বলব, তখনি তা যথাসাধ্য করবি ত? যদি গঙ্গায় ঝাঁপ দিলে বা ছাদের উপর থেকে লাফিয়ে পড়লে তোর মঙ্গল হবে বুঝে তাই করতে বলি, তাহলে তাও অবিচারে করতে পারবি ত? এখনও ভেবে দেখ.; নইলে সহসা গুরু বলে গ্রহণ করতে এগুস্ নি।" এইরূপে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া স্বামীজী শিষ্যের মনের বিশ্বাসের দৌড়টা বুঝিতে লাগিলেন। শিষ্যও নতশিরে 'পারিব' বলিয়া প্রতি প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিল।

স্বামীজী। যিনি এই সংসার-মায়ার পারে নিয়ে যান, যিনি কৃপা করে সমস্ত মানসিক আধিব্যাধি বিনষ্ট করেন, তিনিই যথার্থ গুরু। আগে শিষ্যেরা 'সমিৎপাণি' হয়ে গুরুর আশ্রমে গমন করত। গুরু অধিকারী বলে বুঝলে তাকে দীক্ষিত করে বেদপাঠ করাতেন এবং কায়মনোবাক্যদণ্ড-রূপ ব্রতের চিহ্নস্বরূপ

ত্রিরাবৃত্ত মৌঞ্জিমেখলা তার কোমরে বেঁধে দিতেন। ঐটে দিয়ে শিষ্যেরা কৌপিন এঁটে বেঁধে রাখত। সেই মৌঞ্জিমেখলার স্থানে পরে যজ্ঞসূত্র বা পৈতে পরার পদ্ধতি হয়।

শিষ্য। তবে কি মহাশয়, আমাদের ন্যায় সুতার পৈতা পরাটা বৈদিক প্রথা নয়?

স্বামীজী। বেদে কোথাও সুতোর পৈতের কথা নাই। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনও লিখেছেন—"অস্মিন্নেব সময়ে যজ্ঞসূত্রং পরিধাপয়েৎ।" সুতোর পৈতের কথা গোভিল গৃহ্যসূত্রেও নাই। গুরুসমীপে এই প্রথম বৈদিক সংস্কারই শাস্ত্রে 'উপনয়ন' বলে উক্ত হয়েছে। কিন্তু আজকাল দেশের কি দুরবস্থাই না হয়েছে! শাস্ত্রপথ পরিত্যাগ করে কেবল কতকগুলো দেশাচার, লোকাচার ও স্ত্রী-আচারে দেশটা ছেয়ে ফেলেছে। তাই ত তোদের বলি, তোরা প্রাচীনকালের মত শাস্ত্রপথ ধরে চল্। নিজেরা শ্রদ্ধাবান হয়ে দেশে শ্রদ্ধা আনয়ন কর্। নচিকেতার মত শ্রদ্ধা হৃদয়ে আন্। নচিকেতার মত যমলোকে চলে যা—আত্মতত্ত্ব জানবার জন্য, আত্মা-উদ্ধারের জন্য, এই জন্ম-মরণ-প্রহেলিকার যথার্থ মীমাংসার জন্য যমের মুখে গেলে যদি সত্যলাভ হয়, তা'হলে নির্ভীক হৃদয়ে যমের মুখে যেতে হবে। ভয়ই ত মৃত্যু। ভয়ের পরপারে যেতে হবে। আজ থেকে ভয়শূন্য হ। যা চলে—আপনার মোক্ষ ও পরার্থে দেহ দিতে। কি হবে কতকগুলো হাড়মাসের বোঝা বয়ে? ঈশ্বরার্থে সর্ব্বস্বত্যাগরূপ মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করে দধীচি মুনির মত পরার্থে হাড়মাস দান কর্। শাস্ত্রে বলে, যাঁরা অধীত-

বেদবেদান্ত, যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞ, যাঁরা অপরকে অভয়ের পারে নিতে সমর্থ, তাঁরাই যথার্থ গুরু; তাঁদের পেলেই দীক্ষিত হবে—"নাত্র কার্য্যবিচারণা।" এখন সেটা কেমন দাঁড়িয়েছে জানিস্—"অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।"

বেলা প্রায় নয়টা হইয়াছে। স্বামীজী আজ গঙ্গায় না যাইয়া বাড়ীতেই স্নান করিলেন। স্নানান্তে নূতন একখানি গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া মৃদুপদে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করত পূজার আসনে উপবেশন করিলেন। শিষ্য ঠাকুরঘরে প্রবেশ না করিয়া বাহিরেই প্রতীক্ষা করিয়া রহিল; স্বামীজী ডাকিলে তবে যাইবে। এইবার স্বামীজী ধ্যানস্থ হইলেন—মুক্তপদ্মাসন, ঈষন্মুদ্রিতনয়ন, যেন দেহমনপ্রাণ সকল স্পন্দহীন হইয়া গিয়াছে। ধ্যানান্তে স্বামীজী শিষ্যকে 'বাবা আয়' বলিয়া ডাকিলেন। শিষ্য স্বামীজীর সস্নেহ আহ্বানে মুগ্ধ হইয়া যন্ত্রবৎ ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিল। ঠাকুরঘরে প্রবেশমাত্র স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, "দোরে খিল দে।" সেইরূপ করা হইলে বলিলেন, "স্থির হয়ে আমার বাম পাশে বোস্।" স্বামীজীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া শিষ্য আসনে উপবেশন করিল। তাহার হৃৎপিণ্ড তখন কি এক অনির্ব্বচনীয় অপূর্ব্ব ভাবে দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। অনন্তর স্বামীজী তাঁহার পদ্মহস্ত শিষ্যের মস্তকে স্থাপন করিয়া শিষ্যকে কয়েকটি গুহ্য কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং শিষ্য ঐ বিষয়ের যথাসাধ্য উত্তর দান করিলে মহাবীজমন্ত্র তাহার কর্ণমূলে তিনবার উচ্চারণ করিলেন এবং পরে শিষ্যকে তিনবার উহা উচ্চারণ করিতে বলিলেন। অনন্তর সাধনা সম্বন্ধে সামান্য উপদেশ প্রদান করিয়া স্থির হইয়া অনিমেষনয়নে

শিষ্যের নয়নপানে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। শিষ্যের মন এখন স্তব্ধ ও একাগ্র হওয়ায় সে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। কতকক্ষণ এভাবে কাটিল, তাহা কিছুমাত্র বুঝিতে পারিল না। অনন্তর স্বামীজী বলিলেন, "গুরুদক্ষিণা দে।" শিষ্য বলিল, "কি দিব ?" শুনিয়া স্বামীজী অনুমতি করিলেন, "যা, ভাণ্ডার থেকে কোন ফল নিয়ে আয়।" শিষ্য দৌড়িয়া ভাণ্ডারে গেল এবং ১০টা লিচু লইয়া পুনরায় ঠাকুরঘরে আসিল। স্বামীজীর হস্তে সেগুলি দিবামাত্র তিনি একটি একটি করিয়া সেইগুলি সমস্ত খাইয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, "যা, তোর গুরুদক্ষিণা দেওয়া হয়ে গেল।" শিষ্য ঠাকুরঘরে স্বামীজীর নিকটে যখন দীক্ষিত হইতেছিল, তখন মঠের অপর এক ব্যক্তি সহসা দীক্ষিত হইতে কৃতসংকল্প হইয়া দ্বারে বাহিরে দণ্ডায়মান ছিলেন। স্বামী শুদ্ধানন্দ তখন ব্রহ্মচারিরূপে মঠভুক্ত হইলেও ইতঃপূর্ব্বে তান্ত্রিকী দীক্ষাগ্রহণ করেন নাই ; শিষ্যকে অদ্য ঐভাবে দীক্ষিত হইতে দেখিয়া তিনিও এখন ঐবিষয়ে উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন এবং দীক্ষাগ্রহণ করিয়া শিষ্য ঠাকুরঘর হইতে নির্গত হইবামাত্র ঐ ঘরে স্বামীজীর নিকটে উপস্থিত হইয়া আপন অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। স্বামীজীও স্বামী শুদ্ধানন্দের আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া ঐ বিষয়ে সম্মত হইয়া পুনরায় পূজার আসন গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর শুদ্ধানন্দজীকে দীক্ষাদান করিয়া স্বামীজী কতক্ষণ পরে বাহিরে আসিলেন এবং আহারান্তে শয়ন করিয়া কিছুকাল বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। শিষ্যও ইতোমধ্যে স্বামী শুদ্ধানন্দের সহিত স্বামীজীর পাত্রাবশেষ সাহ্লাদে গ্রহণ করিয়া আসিয়া তাঁহার পদতলে উপবিষ্ট হইল এবং ধীরে ধীরে তাঁহার পাদসংবাহনে নিযুক্ত রহিল।

বিশ্রামান্তে স্বামীজী উপরের বৈঠকখানাঘরে আসিয়া বসিলেন, শিষ্যও এই সময়ে অবসর বুঝিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, পাপপুণ্যের ভাব কোথা হইতে আসিল ?"

স্বামীজী। বহুত্বের ভাব থেকেই এই সব বেরিয়েছে। মানুষ একত্বের দিকে যত এগিয়ে যায়, তত 'আমি-তুমি' ভাব— যা থেকে এই সব ধর্ম্মাধর্ম্ম-দ্বন্দ্বভাবসকল এসেছে, কমে যায়। 'আমা থেকে অমুক ভিন্ন'—এই ভাবটা মনে এলে তবে অন্য সব দ্বন্দ্বভাবের বিকাশ হতে থাকে এবং একত্বের সম্পূর্ণ অনুভবে মানুষের আর শোক-মোহ থাকে না—"তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।"

যত প্রকার দুর্ব্বলতার অনুভবকেই পাপ বলা যায় (weakness is sin)। এই দুর্ব্বলতা থেকেই হিংসা-দ্বেষাদির উন্মেষ হয়। তাই দুর্ব্বলতা বা weakness-এরই নাম পাপ। ভিতরে আত্মা সর্ব্বদা জ্বল্ জ্বল্ করছে—সে দিকে না চেয়ে হাড়মাসের কিস্তূতকিমাকার খাঁচা এই জড় শরীরটার দিকেই সবাই নজর দিয়ে 'আমি' 'আমি' করছে! ঐটেই হচ্ছে সকল প্রকার দুর্ব্বলতার গোড়া। ঐ অভ্যাস থেকেই জগতে ব্যবহারিক ভাব বেরিয়েছে। পরমার্থভাব ঐ দ্বন্দ্বের পারে বর্ত্তমান।

শিষ্য। তাহা হইলে এইসকল ব্যবহারিক সত্তা কি সত্য নহে ?

স্বামীজী। যতক্ষণ 'আমি' জ্ঞান আছে, ততক্ষণ সত্য। আর যখনই আমি 'আত্মা' এই অনুভব, তখনই এই ব্যবহারিক সত্তা মিথ্যা। লোকে যে পাপ পাপ বলে, সেটা weakness-এর ফল—'আমি

দেহ' এই অহং-ভাবেরই রূপান্তর। যখন 'আমি আত্মা' এই ভাবে মন নিশ্চল হবে, তখন তুই পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত হয়ে যাবি। ঠাকুর বলতেন, "'আমি' মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।"

শিষ্য। মহাশয়, 'আমি'-টা যে মরিয়াও মরে না! এটাকে মারা বড় কঠিন।

স্বামীজী। এক ভাবে খুব কঠিন আবার আর এক ভাবে খুব সোজা। 'আমি' জিনিসটা কোথায় আছে, বুঝিয়ে দিতে পারিস? যে জিনিসটে নাই, তার আবার মারামারি কি? আমিত্বরূপ একটা মিথ্যা ভাবে মানুষ hypnotised (মন্ত্রমুগ্ধ) হয়ে আছে মাত্র। ঐ ভূতটা ছাড়লেই সব স্বপ্ন ভেঙ্গে যায় ও দেখা যায়—এক আত্মা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলে রয়েছেন। এইটি জানতে হবে, প্রত্যক্ষ করতে হবে। যত কিছু সাধনভজন—এ আবরণটা কাটাবার জন্য। ওটা গেলেই চিৎ-সূর্য্য আপনার প্রভায় আপনি জ্বল্‌ছে দেখতে পাবি। কারণ, আত্মাই একমাত্র স্বয়ংজ্যোতিঃ—স্বসংবেদ্য। যে জিনিসটে স্বসংবেদ্য, তাকে অন্য কিছুর সহায়ে কি করে জানতে পারা যাবে? শ্রুতি তাই বলছেন, "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ।" তুই যা কিছু জানছিস, তা মনরূপ কারণ-সহায়ে। মন ত জড়; তার পেছনে শুদ্ধ আত্মা থাকাতেই মনের দ্বারা কার্য্য হয়। সুতরাং মন দ্বারা সে আত্মাকে কিরূপে জানবি? তবে এইটেমাত্র জানা যায় যে, মন শুদ্ধাত্মার নিকট পৌঁছুতে পারে না, বুদ্ধিটাও পৌঁছুতে পারে না। জানাজানিটা এই পর্য্যন্ত। তারপর মন যখন বিকল্প বা বৃত্তিহীন

হয়, তখনই মনের লোপ হয় এবং তখনি আত্মা প্রত্যক্ষ হন। ঐ অবস্থাকেই ভাষ্যকার শঙ্কর 'অপরোক্ষানুভূতি' বলে বর্ণনা করেছেন।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, মনটাই ত 'আমি'। সেই মনটার যদি লোপ হয়, তবে 'আমি'টাও ত আর থাকিবে না।

স্বামীজী। তখন যে অবস্থা, সেটাও যথার্থ 'আমিত্বের' স্বরূপ। তখন যে 'আমি'টা থাকবে, সেটা সর্ব্বভূতস্থ, সর্ব্বগ—সর্ব্বান্তরাত্মা। যেন ঘটাকাশ ভেঙ্গে মহাকাশ—ঘট ভাঙ্গলে তার ভিতরকার আকাশেরও কি বিনাশ হয় রে? যে ক্ষুদ্র 'আমি'টাকে তুই দেহবদ্ধ মনে করছিলি, সেটাই ছড়িয়ে এইরূপে সর্ব্বগত আমিত্ব বা আত্মারূপে প্রত্যক্ষ হয়। অতএব মনটা রইল বা গেল, তাতে যথার্থ 'আমি' বা আত্মার কি?

যা বলছি তা কালে প্রত্যক্ষ হবে—'কালেনাত্মনি বিন্দতি।' শ্রবণ-মনন করতে করতে কালে এই কথা ধারণা হয়ে যাবে—আর মনের পারে চলে যাবি। তখন আর এ প্রশ্ন করবার অবসর থাকবে না।

শিষ্য শুনিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। স্বামীজী আস্তে আস্তে ধূমপান করিতে করিতে পুনরায় বলিলেন—"এই সহজ বিষয়টা বুঝাতে কত শাস্ত্রই না লেখা হয়েছে, তবু লোকে তা বুঝতে পারছে না!—আপাতমধুর কয়েকটা রূপার চাকৃতি আর মেয়ে-মানুষের ক্ষণভঙ্গুর রূপ নিয়ে দুর্লভ মানুষজন্মটা কেমন কাটিয়ে দিচ্ছে! মহামায়ার আশ্চর্য্য প্রভাব! মা! মা!!"

সপ্তম বল্লী

স্থান—কলিকাতা

বর্ষ—১৮৯৭

রামকৃষ্ণদেবের ভক্তদিগকে আহ্বান করিয়া স্বামীজীর কলিকাতায় 'রামকৃষ্ণ মিশন' সমিতি গঠন করা—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উদার ভাবপ্রচার সম্বন্ধে মতামত—স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কি ভাবে দেখিতেন—শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বামীজীকে কি ভাবে দেখিতেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীযোগানন্দ স্বামীর কথা—নিজ ঈশ্বরাবতারত্ব সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা—অবতারত্বে বিশ্বাস করা কঠিন, দেখিলেও হয় না ; একমাত্র কৃপাসাপেক্ষ—কৃপার স্বরূপ ও কীদৃশ ব্যক্তি ইহা লাভ করে—স্বামীজী ও গিরিশ বাবুর কথোপকথন।

স্বামীজী কয়েক দিন হইতে বাগবাজারে ৺বলরাম বাবুর বাটীতে অবস্থান করিতেছেন। পরমহংসদেবের গৃহী ভক্তদিগকে তিনি আজ একত্রিত হইতে আহ্বান করায়, ৩টার পর বৈকালে ঠাকুরের বহু ভক্ত ঐ বাড়ীতে জড় হইয়াছেন। স্বামী যোগানন্দও তথায় উপস্থিত আছেন। স্বামীজীর উদ্দেশ্য একটি সমিতি গঠিত করা। সকলে উপবেশন করিলে পর স্বামীজী বলিতে লাগিলেন ঃ

"নানাদেশ ঘুরে আমার ধারণা হয়েছে, সঙ্ঘ ব্যতীত কোন বড় কাজ হতে পারে না। তবে আমাদের মত দেশে প্রথম হতে সাধারণতন্ত্রে সঙ্ঘ তৈরী করা, বা সাধারণের সম্মতি (ভোট্) নিয়ে কাজ করাটা তত সুবিধাজনক বলে মনে হয় না। ও-সব দেশের (পাশ্চাত্ত্যের) নরনারী সমধিক শিক্ষিত—আমাদের মত দ্বেষপরায়ণ নহে। তারা গুণের সম্মান করতে শিখেছে। এই

দেখুন না কেন, আমি একজন নগণ্য লোক, আমাকে ওদেশে কত আদরযত্ন করেছে। এদেশে শিক্ষাবিস্তারে যখন ইতরসাধারণ লোক সমধিক সহৃদয় হবে, যখন মত-ফতের সংকীর্ণ গণ্ডির বাইরে চিন্তা প্রসারিত করতে শিখবে, তখন সাধারণতন্ত্রমতে সঙ্ঘের কার্য্য চালাতে পারবে। সেইজন্য এই সঙ্ঘের একজন dictator বা প্রধান পরিচালক থাকা চাই। সকলকে তাঁর আদেশ মেনে চলতে হবে। তারপর কালে সকলের মত লয়ে কার্য্য করা হবে।

"আমরা যাঁর নামে সন্ন্যাসী হয়েছি, আপনারা যাঁকে জীবনের আদর্শ করে সংসারাশ্রমে কার্য্যক্ষেত্রে রয়েছেন, যাঁর দেহাবসানের বিশ বৎসরের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জগতে তাঁর পুণ্য নাম ও অদ্ভুত জীবনের আশ্চর্য্য প্রসার হয়েছে, এই সঙ্ঘ তাঁরই নামে প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা প্রভুর দাস। আপনারা একার্য্যে সহায় হোন।"

শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত গৃহিগণ এ প্রস্তাব অনুমোদন করিলে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ভাবী কার্য্যপ্রণালী আলোচিত হইতে লাগিল। সঙ্ঘের নাম রাখা হইল—রামকৃষ্ণ প্রচার বা রামকৃষ্ণ মিশন। উহার উদ্দেশ্য প্রভৃতি আমরা উহার মুদ্রিত বিজ্ঞাপন হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

উদ্দেশ্য : মানবের হিতার্থ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যে-সকল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং কার্য্যে তাঁহার জীবনে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার প্রচার এবং মনুষ্যের দৈহিক, মানসিক ও পারমার্থিক উন্নতিকল্পে যাহাতে সেই সকল তত্ত্ব প্রযুক্ত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সাহায্য করা এই 'প্রচারের' (মিশনের) উদ্দেশ্য।

ব্রত : জগতের যাবতীয় ধর্ম্মমতকে এক অক্ষয় সনাতন ধর্ম্মের রূপান্তরমাত্র-জ্ঞানে সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে আত্মীয়তা-স্থাপনের জন্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যে কার্য্যের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহার পরিচালনাই এই 'প্রচারের' (মিশনের) ব্রত।

কার্য্যপ্রণালী : মনুষ্যের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিদ্যাদানের উপযুক্ত লোক শিক্ষিতকরণ, শিল্প ও শ্রমোপজীবিকার উৎসাহবর্দ্ধন এবং বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্ম্মভাব রামকৃষ্ণজীবনে যেরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল, তাহা জনসমাজে প্রবর্ত্তন।

ভারতবর্ষীয় কার্য্য : ভারতবর্ষের নগরে নগরে আচার্য্যব্রত-গ্রহণাভিলাষী গৃহস্থ বা সন্ন্যাসীদিগের শিক্ষার আশ্রমস্থাপন এবং যাহাতে তাঁহারা দেশদেশান্তরে গিয়া জনগণকে শিক্ষিত করিতে পারেন, তাহার উপায়-অবলম্বন।

বিদেশীয় কার্য্যবিভাগ : ভারতবহির্ভূত প্রদেশসমূহে 'ব্রতধারী'-প্রেরণ এবং তত্তৎদেশে স্থাপিত আশ্রমসকলের সহিত ভারতীয় আশ্রমসকলের ঘনিষ্ঠতা ও সহানুভূতিবর্দ্ধন এবং নূতন নূতন আশ্রমসংস্থাপন।

স্বামীজী স্বয়ং উক্ত সমিতির সাধারণ সভাপতি হইলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ কলিকাতাকেন্দ্রের সভাপতি এবং স্বামী যোগানন্দ তাঁহার সহকারী হইলেন। বাবু নরেন্দ্রনাথ মিত্র এটর্ণী মহাশয় ইহার সেক্রেটারী, ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ ও বাবু শরচ্চন্দ্র সরকার সহকারী সেক্রেটারী এবং শিষ্য শাস্ত্রপাঠকরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন; সঙ্গে সঙ্গে এই নিয়মটিও বিধিবদ্ধ হইল যে, প্রতি রবিবার ৪টার

পর ৺বলরাম বাবুর বাড়ীতে সমিতির অধিবেশন হইবে। পূর্ব্বোক্ত সভার পরে তিন বৎসর পর্য্যন্ত 'রামকৃষ্ণ মিশন' সমিতির অধিবেশন প্রতি রবিবারে ৺বলরাম বসু মহাশয়ের বাড়ীতে হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, স্বামীজী যতদিন না পুনরায় বিলাত গমন করিয়াছিলেন, ততদিন সুবিধামত সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া কখনও উপদেশদান এবং কখনও বা কিন্নরকণ্ঠে গান করিয়া শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করিতেন।

সভাভঙ্গের পর সভ্যগণ চলিয়া গেলে যোগানন্দ স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, "এইরূপে কার্য্য ত আরম্ভ করা গেল; এখন ছ্যাখ্, ঠাকুরের ইচ্ছায় কতদূর হয়ে দাঁড়ায়।"

স্বামী যোগানন্দ। তোমার এ সব বিদেশী ভাবে কার্য্য করা হচ্ছে। ঠাকুরের উপদেশ কি এরূপ ছিল?

স্বামীজী। তুই কি করে জান্‌লি এ সব ঠাকুরের ভাব নয়? অনন্তভাবময় ঠাকুরকে তোরা তোদের গণ্ডিতে বুঝি বদ্ধ করে রাখতে চাস্? আমি এ গণ্ডি ভেঙ্গে তাঁর ভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব। ঠাকুর আমাকে তাঁর পূজা, পাঠ প্রবর্ত্তনা করতে কখনও উপদেশ দেন নাই। তিনি সাধনভজন, ধ্যানধারণা ও অন্যান্য উচ্চ উচ্চ ধর্ম্মভাব সম্বন্ধে যে-সকল উপদেশ দিয়ে গেছেন, সেইগুলি উপলব্ধি করে জীবকে তা শিক্ষা দিতে হবে। অনন্ত মত, অনন্ত পথ। সম্প্রদায়পূর্ণ জগতে আর একটি নূতন সম্প্রদায় গঠিত করে যেতে আমার জন্ম হয় নাই। প্রভুর পদতলে আশ্রয় পেয়ে

আমরা ধন্য হয়েছি। ত্রিজগতের লোককে তাঁর ভাবসমূহ দিতেই আমাদের জন্ম।

যোগানন্দ স্বামী কথার প্রতিবাদ না করায় স্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেন: "প্রভুর দয়ার নিদর্শন ভূয়োভূয়ঃ এ জীবনে পেয়েছি। তিনি পেছনে দাঁড়ায়ে এসব কার্য্য করিয়ে নিচ্ছেন। যখন ক্ষুধায় কাতর হয়ে গাছতলায় পড়ে থাকতুম, যখন কৌপীন আঁটবার বস্ত্র ছিল না, যখন কপর্দ্দকশূন্য হয়ে পৃথিবীভ্রমণে কৃতসংকল্প, তখনও ঠাকুরের দয়ায় সর্ব্ববিষয়ে সহায়তা পেয়েছি। আবার যখন এই বিবেকানন্দকে দর্শন করতে চিকাগোর রাস্তায় লাঠালাঠি হয়েছে, যে সম্মানের শতাংশের একাংশ পেলে সাধারণ মানুষ উন্মাদ হয়ে যায়, ঠাকুরের কৃপায় তখন সে সম্মানও অক্লেশে হজম করেছি—প্রভুর ইচ্ছায় সর্ব্বত্র বিজয়! এবার এদেশে কিছু কার্য্য করে যাব, তোরা সন্দেহ ছেড়ে আমার কার্য্যে সাহায্য কর, দেখবি তাঁর ইচ্ছায় সব পূর্ণ হয়ে যাবে।"

স্বামী যোগানন্দ। তুমি যা ইচ্ছে করবে, তাই হবে। আমরা ত চিরদিন তোমারই আজ্ঞানুবর্ত্তী। ঠাকুর যে তোমার ভিতর দিয়ে এ সকল করছেন, মাঝে মাঝে তা বেশ দেখতে পাচ্ছি। তবু কি জান, মধ্যে মধ্যে কেমন খট্‌কা আসে—ঠাকুরের কার্য্য-প্রণালী অন্যরূপ দেখেছি কি না। তাই মনে হয়, আমরা তাঁর শিক্ষা ছেড়ে অন্য পথে চলছি না ত? তাই তোমায় অন্যরূপ বলি ও সাবধান করে দিই।

স্বামীজী। কি জানিস, সাধারণ ভক্তেরা ঠাকুরকে যতটুকু বুঝেছে, প্রভু বাস্তবিক ততটুকু নন। তিনি অনন্তভাবময়।

ব্রহ্মজ্ঞানের ইয়ত্তা হয় ত, প্রভুর অগম্য ভাবের ইয়ত্তা নাই। তাঁর কৃপাকটাক্ষে লাখ বিবেকানন্দ এখনি তৈরী হতে পারে। তবে তিনি তা না করে ইচ্ছা করে এবার আমার ভিতর দিয়ে আমাকে যন্ত্র করে এইরূপ করাচ্ছেন—তা আমি কি করব, বল ?

এই বলিয়া স্বামীজী কার্য্যান্তরে অন্যত্র গেলেন। স্বামী যোগানন্দ *শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন, "আহা, নরেনের বিশ্বাসের কথা শুনলি ? বলে কি না ঠাকুরের কৃপাকটাক্ষে লাখ বিবেকানন্দ তৈরী হতে* পারে! কি গুরুভক্তি! আমাদের উহার শতাংশের একাংশ ভক্তি যদি হত ত ধন্য হতুম।"

শিষ্য। মহাশয়, স্বামীজীর সম্বন্ধে ঠাকুর কি বলিতেন ?

যোগানন্দ। তিনি বলতেন, 'এমন আধার এ যুগে জগতে আর কখন আসে নি।' কখনও বলতেন, 'নরেন পুরুষ—তিনি প্রকৃতি—নরেন তাঁর শ্বশুর ঘর।' কখনও বলতেন, 'অখণ্ডের থাক।' কখনও বলতেন, 'অখণ্ডের ঘরে—যেখানে দেবদেবী-সকলও ব্রহ্ম হতে নিজের নিজের অস্তিত্ব পৃথক রাখতে পারেন নাই, লীন হয়ে গেছেন—সাত জন ঋষিকে আপন আপন অস্তিত্ব পৃথক রেখে ধ্যানে নিমগ্ন দেখেছি; নরেন তাঁদেরই একজনের অংশাবতার।' কখন বলতেন, 'জগৎপালক নারায়ণ নর ও নারায়ণ নামে যে দুই ঋষিমূর্ত্তি পরিগ্রহ করে জগতের কল্যাণের জন্য তপস্যা করেছিলেন, নরেন সেই নর ঋষির অবতার।' কখনো বলতেন, 'শুকদেবের মত মায়া স্পর্শ করতে পারে নি।'

শিষ্য। ঐ কথাগুলি কি সত্য? না—ঠাকুর ভাবমুখে এক এক সময়ে এক এক রূপ বলিতেন?

যোগানন্দ। তাঁর কথা সব সত্য। তাঁর শ্রীমুখে ভ্রমেও মিথ্যা কথা বেরুত না।

শিষ্য। তাহা হইলে সময় সময় ঐরূপ ভিন্নরূপ বলিতেন কেন?

যোগানন্দ। তুই বুঝতে পারিস নি। নরেনকে ঐ সকলের সমষ্টি-প্রকাশ বলতেন। নরেনের মধ্যে ঋষির বেদজ্ঞান, শঙ্করের ত্যাগ, বুদ্ধের হৃদয়, শুকদেবের মায়ারাহিত্য ও ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ এক সঙ্গে রয়েছে, দেখতে পাচ্ছিস না? ঠাকুর তাই মধ্যে মধ্যে ঐরূপ নানা ভাবে কথা কইতেন। যা বলতেন, সব সত্য।

শিষ্য শুনিয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিল। ইতোমধ্যে স্বামীজী ফিরিয়া আসিয়া শিষ্যকে বলিলেন, "তোদের ওদেশে ঠাকুরের নাম বিশেষভাবে লোকে জানে কি?"

শিষ্য। মহাশয়, এক নাগ মহাশয়ই ওদেশ হইতে ঠাকুরের কাছে আসিয়াছিলেন; তাঁহার কাছে শুনিয়া এখন অনেকের ঠাকুরের বিষয় জানিতে কৌতূহল হইয়াছে। কিন্তু ঠাকুর যে ঈশ্বরাবতার একথা ওদেশের লোকেরা এখনও জানিতে পারে নাই, কেহ কেহ উহা শুনিলেও বিশ্বাস করে না।

স্বামীজী। ও কথা বিশ্বাস করা কি সহজ ব্যাপার? আমরা তাঁকে হাতে নেড়েচেড়ে দেখলুম, তাঁর নিজ মুখে ঐ কথা বারম্বার শুনলুম, চব্বিশ ঘণ্টা তাঁর সঙ্গে বসবাস করলুম তবু আমাদেরও মধ্যে মধ্যে সন্দেহ আসে। তা—অন্যে পরে কা কথা।

শিষ্য। মহাশয়, ঠাকুর যে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্, এ কথা তিনি আপনাকে নিজ মুখে কখনও বলিয়াছিলেন কি ?

স্বামীজী। কতবার বলেছেন। আমাদের সব্বাইকে বলেছেন। তিনি যখন কাশীপুরের বাগানে—যখন শরীর যায় যায় তখন আমি তাঁর বিছানার পাশে একদিন মনে মনে ভাবছি, এই সময় যদি বলতে পার 'আমি ভগবান', তবে বিশ্বাস করব 'তুমি সত্যসত্যই ভগবান'। তখন শরীর যাবার দুই দিন মাত্র বাকী। ঠাকুর তখন হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে বললেন, "যে রাম, যে কৃষ্ণ—সে-ই ইদানীং এ শরীরে রামকৃষ্ণ—তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।" আমি শুনে অবাক হয়ে রইলুম। প্রভুর শ্রীমুখে বার বার শুনেও আমাদেরই এখনও পূর্ণ বিশ্বাস হলো না—সন্দেহ, নিরাশায় মন মধ্যে মধ্যে আন্দোলিত হয়—ত অপরের কথা আর কি বলব ? আমাদেরই মত দেহবান্ এক ব্যক্তিকে ঈশ্বর বলে নির্দ্দেশ করা ও বিশ্বাস করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। সিদ্ধ, ব্রহ্মজ্ঞ—এসব বলে ভাবা চলে। তা যাই কেন তাঁকে বল্ না, ভাব্ না—মহাপুরুষ বল্, ব্রহ্মজ্ঞ বল্, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু ঠাকুরের মত এমন পুরুষোত্তম জগতে ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও আগমন করেন নাই। সংসারে ঘোর অন্ধকারে এখন এই মহাপুরুষই জ্যোতিঃস্তম্ভ-স্বরূপ। এঁর আলোতেই মানুষ এখন সংসার-সমুদ্রের পারে চলে যাবে।

শিষ্য। মহাশয়, আমার মনে হয়, কিছু না দেখিলে শুনিলে যথার্থ বিশ্বাস হয় না। শুনিয়াছি, মথুর বাবু ঠাকুরের সম্বন্ধে

কত কি দেখিয়াছিলেন! তাই ঠাকুরে তাঁর এত বিশ্বাস হইয়াছিল।

স্বামীজী। যার বিশ্বাস হয় না, তার দেখলেও বিশ্বাস হয় না, মনে করে মাথার ভুল, স্বপ্ন ইত্যাদি। দুর্য্যোধনও বিশ্বরূপ দেখেছিল—অর্জ্জুনও দেখেছিল। অর্জ্জুনের বিশ্বাস হল। দুর্য্যোধন ভেল্কিবাজি ভাবলে। তিনি না বুঝালে কিছু বলবার বা বুঝবার জো নাই। না দেখে না শুনে কারও ষোলআনা বিশ্বাস হয়; কেউ বার বৎসর সামনে থেকে নানা বিভূতি দেখেও সন্দেহে ডুবে থাকে। সার কথা হচ্ছে—তাঁর কৃপা; তবে লেগে থাকতে হবে, তবে তাঁর কৃপা হবে।

শিষ্য। কৃপার কি কোন নিয়ম আছে, মহাশয়?

স্বামীজী। হাঁও বটে, নাও বটে।

শিষ্য। কিরূপ?

স্বামীজী। যারা কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা পবিত্র, যাদের অনুরাগ প্রবল, যারা সদসৎবিচারবান্ ও ধ্যানধারণায় রত, তাদের উপরই ভগবানের কৃপা হয়। তবে ভগবান প্রকৃতির সকল নিয়মের (natural law) বাইরে, কোন নিয়ম-নীতির বশীভূত নন—ঠাকুর যেমন বলতেন, "তাঁর ছেলের স্বভাব"—সেজন্য দেখা যায় কেউ কোটী জন্ম ডেকে ডেকেও তাঁর সাড়া পায় না, আবার যাকে আমরা পাপী তাপী নাস্তিক বলি, তার ভিতরে সহসা চিৎপ্রকাশ হয়ে যায়—তাকে ভগবান অযাচিত কৃপা করে বসেন। তার আগের জন্মের সুকৃতি

ছিল, একথা বলতে পারিস্; কিন্তু এ রহস্য বোঝা কঠিন। ঠাকুর কখনও বলতেন, "তাঁর প্রতি নির্ভর কর্। ঝড়ের এঁটো পাতা হয়ে যা", আবার কখনও বলতেন, "তাঁর কৃপা-বাতাস ত বইছেই, তুই পাল তুলে দে না।"

শিষ্য। মহাশয়, এ ত মহা কঠিন কথা। কোন যুক্তিই যে এখানে দাঁড়ায় না।

স্বামীজী। যুক্তিতর্কের সীমা মায়াধিকৃত জগতে, দেশ-কাল-নিমিত্তের গণ্ডির মধ্যে। তিনি দেশকালাতীত। তাঁর law (নিয়ম)-ও বটে, আবার তিনি law (নিয়ম)-এর বাইরেও বটে; প্রকৃতির যা কিছু নিয়ম তিনিই করেছেন, হয়েছেন; আবার সে সকলের বাইরেও রয়েছেন। তিনি যাকে কৃপা করেন, সে তন্মুহূর্ত্তে নিয়মের গণ্ডির বাইরে (beyond law) চলে যায়। সেইজন্য কৃপার কোন condition (বাঁধাধরা নিয়ম) নাই; কৃপাটা হচ্ছে তাঁর খেয়াল। এই জগৎ-সৃষ্টিটাই সব তাঁর খেয়াল—"লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্।" যিনি খেয়াল করে এমন জগৎ গড়তে-ভাঙ্গতে পারেন, তিনি কি আর কৃপা করে মহাপাপীকেও মুক্তি দিতে পারেন না? তবে যে কারুকে সাধনভজন করিয়ে নেন ও কারুকে করান না, সেটাও তাঁর খেয়াল—তাঁর ইচ্ছা।

শিষ্য। মহাশয়, বুঝিতে পারিলাম না।

। বুঝে আর কি হবে? যতটা পারিস্ তাঁতে মন লাগিয়ে থাক্। তা হলেই এই জগৎভেল্কি আপনি-আপনি ভেঙ্গে যাবে। তবে লেগে থাকতে হবে। কাম-কাঞ্চন থেকে

মন সরিয়ে নিতে হবে, সদসৎবিচার সর্ব্বদা করতে হবে, 'আমি দেহ নই'—এইরূপ বিদেহ ভাবে অবস্থান করতে হবে, 'আমি সর্ব্বগ আত্মা'—এইটি অনুভব করতে হবে। এইরূপে লেগে থাকার নামই পুরুষকার। ঐরূপে পুরুষকারের সহায়ে তাঁতে নির্ভর আসবে—সেটাই হল পরম পুরুষার্থ।

স্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেন, "তাঁর কৃপা তোদের প্রতি না থাকলে তোরা এখানে আস্‌বি কেন? ঠাকুর বলতেন, 'যাদের প্রতি ঈশ্বরের কৃপা হয়েছে, তারা এখানে আসবেই আসবে; যেখানে-সেখানে থাক্ বা যাই করুক না কেন, এখানকার কথায়, এখানকার ভাবে সে অভিভূত হবেই হবে।' তোর কথাই ভেবে দেখ্ না, যিনি কৃপাবলে সিদ্ধ—যিনি প্রভুর কৃপা সম্যক বুঝেছেন, সেই নাগ মহাশয়ের সঙ্গলাভ কি ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন হয়? 'অনেক-জন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্'—জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি থাকলে তবে অমন মহাপুরুষের দর্শনলাভ হয়। শাস্ত্রে উত্তমা ভক্তির যে-সকল লক্ষণ দেখা যায়, নাগ মহাশয়ের সেগুলি সব ফুটে বেরিয়েছে। ঐ যে বলে 'তৃণাদপি সুনীচেন,' তা একমাত্র নাগ মহাশয়েই প্রত্যক্ষ করা গেল। তোদের বাঙ্গাল দেশ ধন্য—নাগ মহাশয়ের পাদস্পর্শে পবিত্র হয়ে গেছে।"

বলিতে বলিতে স্বামীজী মহাকবি শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের বাড়ী বেড়াইয়া আসিতে চলিলেন। সঙ্গে স্বামী যোগানন্দ ও শিষ্য। গিরিশ বাবুর বাড়ী উপস্থিত হইয়া উপবেশন করিয়া স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, "জি. সি., মনে আজকাল কেবল উঠছে—এটা কার, সেটা করি, তাঁর কথা জগতে ছড়িয়ে দেই, ইত্যাদি।

আবার ভাবি—এতে বা ভারতে আর একটা সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়ে পড়ে। তাই অনেক সামলে চলতে হয়। কখনও ভাবি—সম্প্রদায় হোক্। আবার ভাবি—না, তিনি কারও ভাব কদাচ নষ্ট করেন নাই ; সমদর্শিতাই তাঁর ভাব। এই ভেবে মনের ভাব অনেক সময় চেপে চলি। তুমি কি বল ?”

গিরিশ বাবু। আমি আর কি বলব ? তুমি তাঁর হাতের যন্ত্র। যা করাবেন, তাই তোমাকে করতে হবে। আমি অত শত বুঝি না। আমি দেখছি প্রভুর শক্তি তোমায় দিয়ে কার্য্য করিয়ে নিচ্ছে। সাদা চোখে দেখছি।

স্বামীজী। আমি দেখছি, আমরা নিজের খেয়ালে কার্য্য করে যাচ্ছি। তবে বিপদে, আপদে, অভাবে, দারিদ্র্যে তিনি দেখা দিয়ে ঠিক পথে চালান, guide করেন—ঐটি দেখতে পেয়েছি। কিন্তু প্রভুর শক্তির কিছুমাত্র ইয়ত্তা করে উঠতে পারলুম না !

গিরিশ বাবু। তিনি বলেছিলেন, “সব বুঝলে এখনি সব ফাঁকা হয়ে পড়বে। কে করবে, কারেই বা করাবে ?”

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর আমেরিকার প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। গিরিশ বাবু ইচ্ছা করিয়াই যেন স্বামীজীর মন প্রসঙ্গান্তরে ফিরাইয়া দিলেন। ঐরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় গিরিশ বাবু অন্য সময়ে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, “ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনেছি, ঐরূপ কথা বেশী কহিতে কহিতে স্বামীজীর সংসারবৈরাগ্য ও ঈশ্বরোদ্দীপনা হয়ে যদি একবার স্বস্বরূপের দর্শন হয়—তিনি যে কে একথা জানতে পারেন—তবে আর এক মুহূর্ত্তও তাঁর দেহ থাকবে না।” তাই দেখিয়াছি, স্বামীজীর সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতৃগণও

তিনি চব্বিশ ঘণ্টা ঠাকুরের কথাবার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করিলে স্বামীজীকে প্রসঙ্গান্তরে মনোনিবেশ করাইতেন। সে যাহা হউক, আমেরিকার প্রসঙ্গ করিতে করিতে স্বামীজী তাহাতেই মাতিয়া গেলেন। ওদেশের সমৃদ্ধি, স্ত্রী-পুরুষের গুণাগুণ, ভোগবিলাস· ইত্যাদি নানা কথা বর্ণন করিতে লাগিলেন।

অষ্টম বল্লী

স্থান—কলিকাতা

বর্ষ—১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ

স্বামীজীকে শিষ্যের রন্ধন করিয়া ভোজন করান—ধ্যানের স্বরূপ ও অবলম্বন সম্বন্ধে কথা—বহিরালম্বন ধরিয়াও মন একাগ্র করিতে পারা যায়—মন একাগ্র হইবার পরেও সাধকের মনে বাসনার উদয় পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ হইয়া থাকে—মনের একাগ্রতায় সাধকের ব্রহ্মাভাস ও নানা প্রকার বিভূতিলাভের দ্বার খুলিয়া যায়—ঐ সময়ে কোনরূপ বাসনাদ্বারা চালিত হইলে তাহার ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হয় না।

কয়েক দিন হইল স্বামীজী বাগবাজারে ৺বলরাম বসুর বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। প্রাতে, দ্বিপ্রহরে বা সন্ধ্যায় তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্রও বিরাম নাই; কারণ বহু উৎসাহী যুবক—কলেজের বহু ছাত্র—তিনি এখন যেথানেই থাকুন না কেন, তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়া থাকে। স্বামীজী সকলকেই সাদরে ধর্ম্ম ও দর্শনের জটিল তত্ত্বগুলি সহজ ভাষায় বুঝাইয়া দেন; স্বামীজীর প্রতিভার নিকট তাহারা সকলেই যেন অভিভূত হইয়া নীরবে অবস্থান করে।

আজ সূর্য্যগ্রহণ—সর্ব্বগ্রাসী গ্রহণ। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণও গ্রহণ দেখিতে নানাস্থানে গিয়াছেন। ধর্ম্মপিপাসু নরনারীগণ গঙ্গাস্নান করিতে বহুদূর হইতে আসিয়া উৎসুক হইয়া গ্রহণবেলা প্রতীক্ষা করিতেছেন। স্বামীজীর কিন্তু গ্রহণসম্বন্ধে বিশেষ কোন উৎসাহ নাই। শিষ্য আজ স্বামীজীকে নিজহস্তে রন্ধন করিয়া খাওয়াইবে—স্বামীজীর আদেশ। মাছ, তরকারি ও রন্ধনের উপযোগী অন্যান্য দ্রব্যাদি লইয়া বেলা ৮টা আন্দাজ সে ৺বলরাম বাবুর বাড়ী উপস্থিত

হইয়াছে। তাহাকে দেখিয়া স্বামীজী বলিলেন, "তোদের দেশের মত রান্না করতে হবে ; আর গ্রহণের পূর্ব্বেই খাওয়া দাওয়া শেষ হওয়া চাই।"

বলরাম বাবুদের বাড়ীতে মেয়েছেলেরা কেহই এখন কলিকাতায় নাই। সুতরাং বাড়ী একেবারে খালি। শিষ্য বাড়ীর ভিতরে রন্ধন-শালায় গিয়া রন্ধন আরম্ভ করিল। শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণা যোগীনমাতা নিকটে দাঁড়াইয়া শিষ্যকে রন্ধন-সম্বন্ধীয় সকল বিষয় যোগাড় দিতে ও সময়ে সময়ে দেখাইয়া দিয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন এবং স্বামীজী মধ্যে মধ্যে ভিতরে আসিয়া রান্না দেখিয়া তাহাকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন ; আবার কখনও বা "দেখিস্ 'মাছের জুল' যেন ঠিক বাঙ্গালদিশি ধরণে হয়" বলিয়া রঙ্গ করিতে লাগিলেন।

ভাত, মুগের দাল, কৈ মাছের ঝোল, মাছের টক ও মাছের সুক্তুনি রান্না প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় স্বামীজী স্নান করিয়া আসিয়া নিজেই পাতা করিয়া খাইতে বসিলেন। এখনও রান্নার কিছু বাকী আছে—বলিলেও শুনিলেন না, আবদেরে ছেলের মতন বলিলেন, "যা হয়েছে শীগ্গির নিয়ে আয়, আমি আর বস্‌তে পাচ্ছি নে, খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে।" শিষ্য কাজেই তাড়াতাড়ি আগে স্বামীজীকে মাছের সুক্তুনি ও ভাত দিয়ে গেল, স্বামীজীও তৎক্ষণাৎ খাইতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর শিষ্য বাটিতে করিয়া স্বামীজীকে অন্য সকল তরকারি আনিয়া দিবার পর যোগানন্দ, প্রেমানন্দ প্রমুখ অন্যান্য সন্ন্যাসী মহারাজগণকে অন্ন-ব্যঞ্জন পরিবেশন করিতে লাগিল। শিষ্য কোনকালেই রন্ধনে পটু ছিল

না; কিন্তু স্বামীজী আজ তাহার রন্ধনের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কলিকাতার লোক মাছের সুক্তুনির নামে খুব ঠাট্টা তামাসা করে কিন্তু তিনি সেই সুক্তুনি খাইয়া খুশি হইয়া বলিলেন —"এমন কখনও খাই নাই! কিন্তু মাছের 'জুল'টা যেমন ঝাল হয়েছে, এমন আর কোনটাই হয় নাই।" টকের মাছ খাইয়া স্বামীজী বলিলেন, "এটা ঠিক যেন বর্দ্ধমানী ধরণের হয়েছে।" অনন্তর দধি সন্দেশ গ্রহণ করিয়া স্বামীজী ভোজন শেষ করিলেন এবং আচমনান্তে ঘরের ভিতর খাটের উপর উপবেশন করিলেন। শিষ্য স্বামীজীর সম্মুখের দালানে প্রসাদ পাইতে বসিল। স্বামীজী তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, "যে ভাল রাঁধতে পারে না, সে ভাল সাধু হতে পারে না—মন শুদ্ধ না হলে ভাল সুস্বাদু রান্না হয় না।"

কিছুক্ষণ পরে চারিদিকে শাঁক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল এবং স্ত্রীকণ্ঠের উলুধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। স্বামীজী বলিলেন, "ওরে গেরণ লেগেছে—আমি ঘুমোই, তুই আমার পা টিপে দে।" এই বলিয়া একটুকু তন্দ্রা অনুভব করিতে লাগিলেন। শিষ্যও তাহার পদসেবা করিতে করিতে ভাবিল, 'এই পুণ্যক্ষণে গুরুপদ-সেবাই আমার গঙ্গাস্নান ও জপ।' এই ভাবিয়া শিষ্য শান্ত মনে স্বামীজীর পদসেবা করিতে লাগিল। গ্রহণে সর্ব্বগ্রাস হইয়া ক্রমে চারিদিক সন্ধ্যাকালের মত তমসাচ্ছন্ন হইয়া গেল।

গ্রহণ ছাড়িয়া যাইতে যখন ১৫।২০ মিনিট বাকী আছে, তখন স্বামীজী উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া তামাক খাইতে খাইতে শিষ্যকে পরিহাস করিয়া বলিতে লাগিলেন, "লোকে বলে, গেরণের সময় যে যা করে সে তাই নাকি কোটীগুণে পায়—তাই ভাবলুম,

মহামায়া এ শরীরে সুনিদ্রা দেন নাই, যদি এই সময় একটু ঘুমুতে পারি ত এর পর বেশ ঘুম হবে, কিন্তু তা হল না; জোর ১৫ মিনিট ঘুম হয়েছে।"

অনন্তর সকলে স্বামীজীর নিকট আসিয়া উপবেশন করিলে স্বামীজী শিষ্যকে উপনিষদ্ সম্বন্ধে কিছু বলিতে আদেশ করিলেন। শিষ্য ইতঃপূর্ব্বে কখনও স্বামীজীর সমক্ষে বক্তৃতা করে নাই। তাহার বুক দুর্ দুর্ করিতে লাগিল। কিন্তু স্বামীজী ছাড়িবার পাত্র নহেন। সুতরাং শিষ্য উঠিয়া "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ" মন্ত্রটির ব্যাখ্যা করিতে লাগিল, পরে 'গুরুভক্তি' ও 'ত্যাগের' মহিমা বর্ণন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানই যে পরম পুরুষার্থ, ইহা মীমাংসা করিয়া বসিয়া পড়িল। স্বামীজী পুনঃ পুনঃ করতালি দ্বারা শিষ্যের উৎসাহ-বর্দ্ধনার্থ বলিতে লাগিলেন, "আহা! সুন্দর বলেছে।"

অনন্তর শুদ্ধানন্দ, প্রকাশানন্দ প্রভৃতি কয়েকজন স্বামীকে স্বামীজী কিছু বলিতে আদেশ করিলেন। স্বামী শুদ্ধানন্দ ওজস্বিনী ভাষায় 'ধ্যান' সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ এক বক্তৃতা করিলেন। অনন্তর স্বামী প্রকাশানন্দ প্রভৃতিও ঐরূপ করিলে স্বামীজী উঠিয়া বাহিরের বৈঠকখানায় আগমন করিলেন। তখনও সন্ধ্যা হইতে প্রায় এক ঘণ্টা বাকি আছে। সকলে ঐ স্থানে আসিলে স্বামীজী বলিলেন, "তোদের কার কি জিজ্ঞাস্য আছে বল্।"

শুদ্ধানন্দ স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, ধ্যানের স্বরূপ কি?"

স্বামীজী। কোন বিষয়ে মনের কেন্দ্রীকরণের নামই ধ্যান। এক বিষয়ে একাগ্র করতে পারলে সেই মন যে-কোন বিষয়ে হোক্ না কেন, একাগ্র করতে পারা যায়।

শিষ্য। শাস্ত্রে যে বিষয় ও নির্ব্বিষয়-ভেদে দ্বিবিধ ভাবের ধ্যান দৃষ্ট হয়, উহার অর্থ কি ? এবং উহার মধ্যে কোন্‌টা বড় ?

স্বামীজী। প্রথম কোন একটি বিষয় নিয়ে ধ্যান অভ্যাস করতে হয়। এক সময় আমি একটা কাল বিন্দুতে মনঃসংযম করতাম। ঐ সময়ে শেষে আর বিন্দুটাকে দেখতে পেতুম না, বা সামনে যে রয়েছে তা বুঝতে পারতুম না, মন নিরোধ হয়ে যেতো—কোন বৃত্তির তরঙ্গ উঠত না—যেন নিবাত সাগর। ঐ অবস্থায় অতীন্দ্রিয় সত্যের ছায়া কিছু কিছু দেখতে পেতুম। তাই মনে হয়, যে-কোন সামান্য বাহ্য বিষয় ধরে ধ্যান অভ্যাস করলেও মন একাগ্র বা ধ্যানস্থ হয়। তবে যাতে যার মন বসে, সেটা ধরে ধ্যান অভ্যাস করলে মন শীঘ্র স্থির হয়ে যায়। তাই এদেশে এত দেবদেবীমূর্ত্তির পূজা। এই দেবদেবীর পূজা থেকে আবার কেমন art develop (শিল্পের উন্নতি) হয়েছিল! যাক্ এখন সে কথা। এখন কথা হচ্ছে যে, ধ্যানের বহিরালম্বন সকলের সমান বা এক হতে পারে না। যিনি যে বিষয় ধরে ধ্যানসিদ্ধ হয়ে গেছেন, তিনি সেই বহিরালম্বনেরই কীর্ত্তনও প্রচার করে গেছেন। তারপর কালে তাতে মনঃস্থির করতে হবে, একথা ভুলে যাওয়ায় সেই বহিরালম্বনটাই বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপায়টা (means) নিয়েই লোকে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, উদ্দেশ্যটার (end) দিকে লক্ষ্য কমে গেছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে মনকে বৃত্তিশূন্য করা—তা কিন্তু কোন বিষয়ে তন্ময় না হলে হবার জো নাই।

শিষ্য। মনোবৃত্তি বিষয়াকারা হইলে তাহাতে আবার ব্রহ্মের ধারণা কিরূপে হইতে পারে?

স্বামীজী। বৃত্তি প্রথমতঃ বিষয়াকারা বটে, কিন্তু ঐ বিষয়ের জ্ঞান থাকে না; তখন শুদ্ধ 'অস্তি' এই মাত্র বোধ থাকে।

শিষ্য। মহাশয়, মনের একাগ্রতা হইলেও কামনা বাসনা উঠে কেন?

স্বামীজী। ওগুলি পূর্ব্বের সংস্কারে হয়। বুদ্ধদেব যখন সমাধিস্থ হতে যাচ্ছেন, তখন মারের অভ্যুদয় হল। মার বলে একটা কিছু বাইরে ছিল না, মনের প্রাক্‌সংস্কারই ছায়ারূপে বাহিরে প্রকাশ হয়েছিল।

শিষ্য। তবে যে শুনা যায়, সিদ্ধ হইবার পূর্ব্বে নানা বিভীষিকা দেখা যায়, তাহা কি মনঃকল্পিত?

স্বামীজী। তা নয় ত কি? সাধক অবশ্য তখন বুঝতে পারে না যে, এগুলি তার মনেরই বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু বাইরে কিছুই নাই। এই যে জগৎ দেখ্‌ছিস্, এটাও নাই। সকলি মনের কল্পনা। মন যখন বৃত্তিশূন্য হয়, তখন তাতে ব্রহ্মাভাস-দর্শন হয়। "যং যং লোকং মনসা সম্বিভাতি" সেই সেই লোক দর্শন করা যায়। যা সঙ্কল্প করা যায়, তাই সিদ্ধ হয়। ঐরূপ সত্যসঙ্কল্প অবস্থা লাভ হলেও যে সমনস্ক থাকতে পারে ও কোন আকাঙ্ক্ষার দাস হয় না, সে-ই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে। আর ঐ অবস্থা লাভ ক'রে যে বিচলিত হয়, সে নানা সিদ্ধি লাভ ক'রে পরমার্থ হতে ভ্রষ্ট হয়।

এই কথা বলিতে বলিতে স্বামীজী পুনঃ পুনঃ 'শিব' 'শিব' নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে আবার বলিলেন, "ত্যাগ ভিন্ন এই গভীর জীবন-সমস্যার রহস্যভেদ কিছুতেই হবার নহে। ত্যাগ—ত্যাগ—ত্যাগ, ইহাই যেন তোদের জীবনের মূলমন্ত্র হয়। 'সর্ব্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্'।"

নবম বল্লী

স্থান—কলিকাতা

বর্ষ—১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ, মার্চ্চ ও এপ্রিল

স্বামীজীর স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে মতামত—মহাকালী পাঠশালা পরিদর্শন ও প্রশংসা—ভারতের স্ত্রীলোকদিগের অন্য দেশের সহিত তুলনায় বিশেষত্ব—স্ত্রীপুরুষ সকলকে সমভাবে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য—সামাজিক কোন নিয়ম জোর করিয়া ভাঙ্গিবার প্রয়োজন নাই, শিক্ষার প্রভাবে লোকে মন্দ নিয়মগুলি স্বতঃই ছাড়িয়া দিবে।

স্বামীজী আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া কয়েক দিন যাবৎ কলিকাতাতেই অবস্থান করিতেছেন। বাগবাজারের ৺বলরাম বসু মহাশয়ের বাড়ীতেই রহিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে পরিচিত ব্যক্তিদিগের বাটীতে ঘুরিয়াও বেড়াইতেছেন। আজ প্রাতে শিষ্য স্বামীজীর কাছে আসিয়া দেখিল, স্বামীজী ঐরূপে বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। শিষ্যকে বলিলেন, "চল্—আমার সঙ্গে যাবি"—বলিতে বলিতে স্বামীজী নীচে নামিতে লাগিলেন; শিষ্যও পিছু পিছু চলিল। একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ীতে তিনি শিষ্য-সমভিব্যাহারে উঠিলেন; গাড়ী দক্ষিণমুখে চলিল।

শিষ্য। মহাশয়, কোথায় যাওয়া হইবে?

স্বামীজী। চল্ না—দেখবি এখন।

এইরূপে কোথায় যাইতেছেন তদ্বিষয়ে শিষ্যকে কিছুই না বলিয়া গাড়ী বিডন ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইলে কথাচ্ছলে বলিতে লাগিলেন, "তোদের দেশের মেয়েদের লেখাপড়া শিখবার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা দেখা যায় না। তোরা লেখাপড়া ক'রে মানুষ

হচ্ছিস কিন্তু যারা তোদের সুখদুঃখের ভাগী—সকল সময়ে প্রাণ দিয়ে সেবা করে, তাদের শিক্ষা দিতে—তাদের উন্নত করতে তোরা কি কচ্ছিস ?”

শিষ্য। কেন মহাশয়, আজকাল মেয়েদের জন্য কত স্কুল, কলেজ হইয়াছে। কত স্ত্রীলোক এম-এ, বি-এ পাস করিতেছে।

স্বামীজী। ও ত বিলাতি ঢং-এ হচ্ছে। তোদের ধর্ম্মশাস্ত্রানুশাসনে, তোদের দেশের মত চালে কোথায় কটা স্কুল হয়েছে ? দেশে পুরুষদের মধ্যেও তেমন শিক্ষার বিস্তার নাই, তা আবার মেয়েদের ভিতর। গবর্ণমেণ্টের statistics-এ (সংখ্যাসূচক তালিকায়) দেখা যায়, ভারতবর্ষে শতকরা ১০।১২ জন মাত্র শিক্ষিত, তা বোধ হয় মেয়েদের মধ্যে one per cent-ও (শতকরা একজন) হবে না।

তা না হলে কি দেশের এমন দুর্দ্দশা হয় ? শিক্ষার বিস্তার—জ্ঞানের উন্মেষ—এসব না হলে দেশের উন্নতি কি করে হবে ? তোরা দেশে যে কয়জন লেখাপড়া শিখেছিস —দেশের ভাবী আশার স্থল—সেই কয়জনের ভিতরেও ঐ বিষয়ে কোন চেষ্টা উদ্যম দেখতে পাই না। কিন্তু জানিস, সাধারণের ভিতর আর মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার না হলে কিছু হবার জো নেই। সেজন্য আমার ইচ্ছা আছে— কতকগুলি ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী তৈরী করব। ব্রহ্মচারীরা কালে সন্ন্যাস গ্রহণ করে দেশে দেশে গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে mass-এর (জনসাধারণের) মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে যত্নপর হইবে। আর ব্রহ্মচারিণীরা মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করবে। কিন্তু

দেশী ধরণে ঐ কাজ করতে হবে। পুরুষদের জন্ম যেমন কতকগুলি centre (শিক্ষাকেন্দ্র) করতে হবে, মেয়েদের শিক্ষা দিতেও সেইরূপ কতকগুলি কেন্দ্র করতে হবে। শিক্ষিতা ও সচ্চরিত্রা ব্রহ্মচারিণীরা ঐ সকল কেন্দ্রে মেয়েদের শিক্ষার ভার নেবে। পুরাণ, ইতিহাস, গৃহকার্য্য, শিল্প, ঘরকন্নার নিয়ম ও আদর্শ চরিত্রগঠনের সহায়ক নীতিগুলি বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সহায়তায় শিক্ষা দিতে হবে। ছাত্রীদের ধর্ম্মপরায়ণ ও নীতিপরায়ণ করতে হবে। কালে যাতে তারা ভাল গিন্নী তৈরী হয়, তাই করতে হবে। এই সকল মেয়েদের সন্তান-সন্ততিগণ পরে ঐ সকল বিষয়ে আরও উন্নতি লাভ করতে পারবে। যাদের মা শিক্ষিতা ও নীতিপরায়ণা হন, তাদের ঘরেই বড় লোক জন্মায়। মেয়েদের তোরা এখন যেন কতকগুলি manufacturing machine (কাজ করবার যন্ত্র) করে তুলেছিস। রাম রাম! এই কি তোদের শিক্ষার ফল হল? মেয়েদের আগে তুলতে হবে, mass-কে (আপামর সাধারণকে) জাগাতে হবে, তবে ত দেশের কল্যাণ—ভারতের কল্যাণ।

গাড়ী এইবার কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের ব্রাহ্মসমাজ ছাড়াইয়া অগ্রসর হইতে দেখিয়া গাড়োয়ানকে বলিলেন, "চোরবাগানের রাস্তায় চল্।" গাড়ী যখন ঐ রাস্তায় প্রবেশ করিল, তখন স্বামীজী শিষ্যের নিকট প্রকাশ করিলেন, মহাকালী পাঠশালার স্থাপনকর্ত্রী তপস্বিনী মাতা তাঁহার পাঠশালা দর্শন করিতে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে চিঠি লিখিয়াছেন। ঐ পাঠশালা তখন চোরবাগানে

৺রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের বাড়ীর কিছু পূর্ব্বদিকে একটা দোতলা ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ছিল। গাড়ী থামিলে দুই-চারি জন ভদ্রলোক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উপরে লইয়া গেলেন এবং তপস্বিনী মাতা দাঁড়াইয়া স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই তপস্বিনী মাতা স্বামীজীকে সঙ্গে করিয়া একটি ক্লাসে লইয়া গেলেন। কুমারীরা দাঁড়াইয়া স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিল এবং মাতাজীর আদেশে প্রথমতঃ 'শিবের ধ্যান' সুর করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিল। পরে কিরূপ প্রণালীতে পাঠশালায় পূজাদি শিক্ষা দেওয়া হয়, মাতাজীর আদেশে কুমারীগণ তাহাই করিয়া দেখাইতে লাগিল। স্বামীজীও উৎফুল্ল-মনে ঐ সকল দর্শন করিয়া অন্য এক শ্রেণীর ছাত্রীদিগকে দেখিতে চলিলেন। বৃদ্ধা মাতাজী স্বামীজীর সঙ্গে সকল ক্লাস ঘুরিতে পারিবেন না বলিয়া স্কুলের দুই-তিনটি শিক্ষককে আহ্বান করিয়া সকল ক্লাস ভাল করিয়া স্বামীজীকে দেখাইবার জন্য বলিয়া দিলেন। অনন্তর স্বামীজী সকল ক্লাস ঘুরিয়া পুনরায় মাতাজীর নিকটে ফিরিয়া আসিলে তিনি একজন কুমারীকে তখন ডাকিয়া আনিলেন এবং রঘুবংশের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। ছাত্রীটিও উহার সংস্কৃতে ব্যাখ্যা করিয়া স্বামীজীকে শুনাইল। স্বামীজী শুনিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং স্ত্রীশিক্ষাপ্রচারকল্পে মাতাজীর অধ্যবসায় ও যত্নপরতার এতদূর সাফল্য দর্শন করিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মাতাজী তাহাতে বিনীতভাবে বলিলেন, "আমি ভগবতীজ্ঞানে ছাত্রীদের সেবা করিয়া থাকি, নতুবা বিদ্যালয় করিয়া যশোলাভ করিবার বা অপর কোন উদ্দেশ্য নাই।"

বিদ্যালয়-সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা সমাপন করিয়া স্বামীজী বিদায় লইতে উদ্যোগ করিলে মাতাজী স্কুলসম্বন্ধে মতামত লিপিবদ্ধ করিতে দর্শকদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট বহিখানিতে (Visitors' Book) স্বামীজীকে মতামত লিখিতে বলিলেন। স্বামীজীও ঐ পরিদর্শক-পুস্তকে নিজ মত বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিলেন। লিখিত বিষয়ের শেষ ছত্রটি শিষ্যের এখনও মনে আছে, তাহা এই—"The movement is in the right direction."

অনন্তর মাতাজীকে অভিবাদনান্তে স্বামীজী পুনরায় গাড়ীতে উঠিলেন এবং শিষ্যের সহিত স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে নানা কথোপকথন করিতে করিতে বাগবাজার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাহারই যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

স্বামীজী। এঁর (মাতাজীর) কোথায় জন্ম! —সর্ব্বস্ব ত্যাগী—তবু লোকহিতের জন্য কেমন যত্নবতী! স্ত্রীলোক না হলে কি ছাত্রীদের এমন করে শিক্ষা দিতে পারে? সবই ভাল দেখলুম; কিন্তু ঐ যে কতকগুলি গৃহী পুরুষ মাষ্টার রয়েছে—ঐটে ভাল বোধ হলো না। শিক্ষিতা বিধবা ও ব্রহ্মচারিণী-গণের উপরই স্কুলের শিক্ষার ভার সর্ব্বদা রাখা উচিত। এদেশে স্ত্রীবিদ্যালয়ে পুরুষ-সংস্রব একেবারে না রাখাই ভাল।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, গার্গী, খনা, লীলাবতীর মত গুণবতী শিক্ষিতা স্ত্রীলোক দেশে এখন পাওয়া যায় কৈ!

স্বামীজী। দেশে কি এখনও ঐরূপ স্ত্রীলোক নাই? এ সীতা সাবিত্রীর দেশ, পুণ্যক্ষেত্র ভারতে এখনও মেয়েদের যেমন চরিত্র, সেবাভাব, স্নেহ, দয়া, তুষ্টি ও ভক্তি দেখা যায়, পৃথিবীর

কোথাও তেমন দেখলুম না। ওদেশে (পাশ্চাত্ত্যে) মেয়েদের দেখে আমার অনেক সময় স্ত্রীলোক বলেই বোধ হত না—ঠিক যেন পুরুষ মানুষ! গাড়ী চালাচ্ছে, অফিসে বেরুচ্ছে, স্কুলে যাচ্ছে, প্রফেসরী কচ্ছে! একমাত্র ভারতবর্ষেই মেয়েদের লজ্জা, বিনয় প্রভৃতি দেখে চক্ষু জুড়ায়। এমন সব আধার পেয়েও তোরা এঁদের উন্নতি করতে পারলি নে। এদের ভিতরে জ্ঞানালোক দিতে চেষ্টা করলি নে। ঠিক ঠিক শিক্ষা পেলে এরা ideal (আদর্শ) স্ত্রীলোক হতে পারে।

শিষ্য। মহাশয়, মাতাজী ছাত্রীদিগকে যে ভাবে জ্ঞান শিক্ষা দিতেছেন, তাহাতে কি ঐরূপ ফল হইবে? এই সকল ছাত্রীরা বড় হইয়া বিবাহ করিবে, এবং উহার অল্পকাল পরেই অন্য সকল স্ত্রীলোকের মত হইয়া যাইবে। মনে হয়, ইহাদিগকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করাইতে পারিলে, তবে ইহারা সমাজের এবং দেশের উন্নতিকল্পে জীবনোৎসর্গ করিতে এবং শাস্ত্রোক্ত উচ্চ আদর্শ লাভ করিতে পারিত।

স্বামীজী। ক্রমে সব হবে। দেশে এমন শিক্ষিত লোক এখন জন্মায় নি, যারা সমাজ-শাসনের ভয়ে ভীত না হয়ে নিজের মেয়েদের অবিবাহিতা রাখতে পারে। এই দেখ্ না—এখনও মেয়ে বার তের বৎসর পেরুতে না পেরুতে লোকভয়ে—সমাজভয়ে বে দিয়ে ফেলে। এই সেদিন consent (সম্মতি-সূচক) আইন করবার সময় সমাজের নেতারা লাখ লোক জড় করে চেঁচাতে লাগল "আমরা আইন চাই না।" —অন্য দেশ হলে সভা করে চেঁচান দূরে থাকুক লজ্জায় মাথা গুঁজে লোক

ঘরে বসে থাকত ও ভাব্ত আমাদের সমাজে এখনও এহেন কলঙ্ক রয়েছে!

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, সংহিতাকারগণ একটা কিছু না ভাবিয়া চিন্তিয়া কি আর বাল্যবিবাহের অনুমোদন করিয়াছিলেন? নিশ্চয় উহার ভিতর একটা গূঢ় রহস্য আছে।

স্বামীজী। কি রহস্যটা আছে?

শিষ্য। এই দেখুন, অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহ দিলে, তাহারা স্বামিগৃহে আসিয়া কুলধর্ম্মগুলি বাল্যকাল হইতে শিখিতে পারিবে। শ্বশুর-শাশুড়ীর আশ্রয়ে থাকিয়া গৃহকর্ম্ম-নিপুণা হইতে পারিবে। আবার পিতৃগৃহে বয়স্থা কন্যার উচ্ছৃঙ্খল হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা; বাল্যকালে বিবাহ দিলে তাহার আর উচ্ছৃঙ্খল হইবার সম্ভাবনা থাকে না; অধিকন্তু লজ্জা, নম্রতা, সহিষ্ণুতা ও শ্রমশীলতা প্রভৃতি ললনা-সুলভ গুণগুলি তাহাতে বিকশিত হইয়া উঠে।

স্বামীজী। অন্যপক্ষে আবার বলা যেতে পারে যে, বাল্যবিবাহে মেয়েরা অকালে সন্তান প্রসব ক'রে অধিকাংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়; তাদের সন্তান-সন্ততিগণও ক্ষীণজীবী হয়ে দেশের ভিখারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে। কারণ, পিতামাতার শরীর সম্পূর্ণ সক্ষম ও সবল না হলে সবল ও নীরোগ সন্তান জন্মিবে কিরূপে? লেখা-পড়া শিখিয়ে একটু বয়স হলে বে দিলে সেই মেয়েদের যে সন্তান-সন্ততি জন্মাবে, তাদের দ্বারা দেশের কল্যাণ হবে। তোদের যে ঘরে ঘরে এত বিধবা তার কারণ হচ্ছে—এই বাল্য-বিবাহ। বাল্য-বিবাহ কমে গেলে বিধবার সংখ্যাও কমে যাবে।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, আমার মনে হয়, অধিক বয়সে বিবাহ দিলে মেয়েরা গৃহকার্য্যে তেমন মনোযোগী হয় না। শুনিয়াছি কলিকাতার অনেক স্থলে শাশুড়ীরা রাঁধে ও শিক্ষিতা বধূরা পায়ে আলতা পরিয়া বসিয়া থাকে। আমাদের বাঙ্গাল দেশে ঐরূপ কখনও হইতে পায় না।

স্বামীজী। ভাল মন্দ সব দেশেই আছে। আমার মতে সমাজ সকল দেশেই আপনা আপনি গড়ে। অতএব বাল্য-বিবাহ তুলে দেওয়া, বিধবাদের পুনরায় বে দেওয়া প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই। আমাদের কার্য্য হচ্ছে স্ত্রী, পুরুষ সমাজের সকলকে শিক্ষা দেওয়া। সেই শিক্ষার ফলে তারা নিজেরাই কোন্‌টি ভাল কোন্‌টি মন্দ, সব বুঝতে পারবে ও আপনারা মন্দটা করা ছেড়ে দিবে। তখন আর জোর করে সমাজের কোন বিষয় ভাঙ্গতে গড়তে হবে না।

শিষ্য। স্ত্রীলোকদিগের এখন কিরূপ শিক্ষার প্রয়োজন?

স্বামীজী। ধর্ম্ম, শিল্প, বিজ্ঞান, ঘরকন্না, রন্ধন, সেলাই, শরীর-পালন—এই সকল বিষয়ের স্থূল স্থূল মর্ম্মগুলিই মেয়েদের শিখান উচিত। নভেল নাটক ছুঁতে দেওয়া উচিত নয়। মহাকালী পাঠশালাটি অনেকটা ঠিক পথে চলছে; তবে কেবল পূজাপদ্ধতি শেখালেই হবে না; সব বিষয়ে চোখ ফুটিয়ে দিতে হবে। আদর্শ নারীচরিত্রসকল ছাত্রীদের সামনে সর্ব্বদা ধরে উচ্চ ত্যাগরূপ ব্রতে তাদের অনুরাগ জন্মে দিতে হবে। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, লীলাবতী, খনা,

মীরা এঁদের জীবনচরিত্র মেয়েদের বুঝিয়ে দিয়ে তাদের নিজেদের জীবন ঐরূপে গঠিত করতে হবে।

গাড়ী এইবার বাগবাজারে ৺বলরাম বসু মহাশয়ের বাড়ীতে পৌছিল। স্বামীজী অবতরণ করিয়া উপরে উঠিলেন এবং তাঁহার দর্শনাভিলাষী হইয়া যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের সকলকে মহাকালী পাঠশালার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বলিতে লাগিলেন।

পরে নূতনগঠিত 'রামকৃষ্ণ মিশনের' সভ্যদের কি কি কাজ করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে 'বিদ্যাদান' ও 'জ্ঞানদানের' শ্রেষ্ঠত্ব বহুধা প্রতিপাদন করিতে লাগিলেন। শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "Educate, educate (শিক্ষা দে, শিক্ষা দে), নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" শিক্ষাদানের বিরোধী দলের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, "যেন পেহ্লাদের দলে যাস্ নি।" ঐ কথার অর্থ জিজ্ঞাসা করায় স্বামীজী বলিলেন, "শুনিস্ নি ? 'ক' অক্ষর দেখেই প্রহ্লাদের চোখে জল এসেছিল—তা আর পড়াশুনো কি করে হবে ? অবশ্য প্রহ্লাদের চোখে প্রেমে জল এসেছিল ও মূর্খদের চোখে জল ভয়ে এসে থাকে। ভক্তদের ভিতরেও অনেকে ঐ রকমের আছে।" সকলে ঐকথা শুনিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। স্বামী যোগানন্দ ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন, "তোমার যখন যে দিকে ঝোঁক উঠবে—তার একটা হেস্ত নেস্ত না হলে ত আর শান্তি নাই ; এখন যা ইচ্ছা হচ্ছে তাই হবে।"

দশম বল্লী

স্থান—কলিকাতা

বর্ষ—১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ

স্বামীজীর শিষ্যকে ঋগ্বেদ-সংহিতা পাঠ করান—পণ্ডিত মোক্ষমূলর সম্বন্ধে স্বামীজীর অদ্ভুত বিশ্বাস—বেদমন্ত্রাবলম্বনে ঈশ্বরের সৃষ্টি করা-রূপ বৈদিক মতের অর্থ—বেদ শব্দাত্মক—শব্দ পদের প্রাচীন অর্থ—নাদ হইতে শব্দের ও শব্দ হইতে স্থূল জগতের প্রকাশ সমাধিকালে প্রত্যক্ষ হয়—অবতারপুরুষদিগের সমাধিকালে ঐ বিষয় যেরূপে প্রতিভাত হয়—স্বামীজীর সহৃদয়তা—জ্ঞান ও প্রেমের অবিচ্ছেদ সম্বন্ধ-বিষয়ে শিষ্যের গিরিশ বাবুর সহিত কথোপকথন—গিরিশ বাবুর সিদ্ধান্ত শাস্ত্রের অবিরোধী—গুরুভক্তিবলে গিরিশ বাবুর সত্য সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ করা—না বুঝিয়া কেবলমাত্র কাহারও অনুকরণ করিতে যাওয়া দূষণীয়—ভক্ত ও জ্ঞানী দুই পৃথক্ ভূমি হইতে দেখিয়া বাক্য ব্যবহার করেন বলিয়া আপাতবিরুদ্ধ বোধ হয় —স্বামীজীর সেবাশ্রমস্থাপনের পরামর্শ।

আজ দশ দিন হইল শিষ্য স্বামীজীর নিকটে ঋগ্বেদের সায়ন-ভাষ্য পাঠ করিতেছে। স্বামীজী বাগবাজারের ৺বলরাম বসুর বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। Max Muller (মোক্ষমূলর)-এর মুদ্রিত বহুসংখ্যায় সম্পূর্ণ ঋগ্বেদ গ্রন্থখানি কোন বড়লোকের বাড়ী হইতে আনা হইয়াছে। নূতন গ্রন্থ, তাহাতে আবার বৈদিক ভাষা, শিষ্যের পড়িতে পড়িতে অনেক স্থলে বাধিয়া যাইতেছে। তদ্দর্শনে স্বামীজী সস্নেহে তাহাকে কখন কখন বাঙ্গাল বলিয়া ঠাট্টা করিতেছেন এবং ঐ স্থলগুলির উচ্চারণ ও পাঠ বলিয়া দিতেছেন। বেদের অনাদিত্ব প্রমাণ করিতে সায়ন যে অদ্ভুত যুক্তিকৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, স্বামীজী তাহার ব্যাখ্যা করিতে করিতে কখনও ভাষ্যকারের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন; আবার

কখনও বা প্রমাণপ্রয়োগে ঐ পদের গূঢ়ার্থ সম্বন্ধে স্বয়ং ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া সায়নের প্রতি কটাক্ষ করিতেছেন।

ঐরূপে কিছুক্ষণ পাঠ চলিবার পরে স্বামীজী Max Muller-এর (মোক্ষমূলরের) প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মনে হল কি জানিস্—সায়নই নিজের ভাষ্য নিজে উদ্ধার করতে Max Muller (মোক্ষমূলর)-রূপে পুনরায় জন্মেছেন। আমার অনেক দিন হইতেই ঐ ধারণা। Max Muller (মোক্ষমূলর)-কে দেখে সে ধারণা আরও যেন বদ্ধমূল হয়ে গেছে। এমন অধ্যবসায়ী, এমন বেদবেদান্তসিদ্ধ পণ্ডিত এ দেশে দেখা যায় না; তার উপর আবার ঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) প্রতি কি অগাধ ভক্তি! তাঁকে অবতার বলে বিশ্বাস করে রে। বাড়ীতে অতিথি হয়েছিলুম—কি যত্নটাই করেছিল। বুড়ো-বুড়ীকে দেখে মনে হত, যেন বশিষ্ঠ-অরুন্ধতীর মত দুটিতে সংসার কচ্ছে! —আমায় বিদায় দেওয়ার কালে বুড়োর চোখে জল পড়েছিল!"

শিষ্য। আচ্ছা মহাশয়, সায়নই যদি Max Muller (মোক্ষমূলর) হইয়া থাকেন ত পুণ্যভূমি ভারতে না জন্মিয়া ম্লেছ হইয়া জন্মিলেন কেন?

স্বামীজী। অজ্ঞান থেকেই মানুষ 'আমি আর্য্য, উনি ম্লেছ' ইত্যাদি অনুভব ও বিভাগ করে। কিন্তু যিনি বেদের ভাষ্যকার, জ্ঞানের জ্বলন্ত মূর্ত্তি, তাঁর পক্ষে আবার বর্ণাশ্রম, জাতিবিভাগ কি? তাঁর কাছে ওসব একেবারে অর্থশূন্য। জীবের উপকারের জন্য তিনি যথা ইচ্ছা জন্মাতে পারেন। বিশেষতঃ যে দেশে বিদ্যা ও অর্থ উভয়ই আছে, সেখানে না জন্মালে এই প্রকাণ্ড

গ্রন্থ ছাপবার খরচই বা কোথায় পেতেন? শুনিস্ নি? East India Company (ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি) এই ঋগ্বেদ ছাপাতে নয় লক্ষ টাকা নগদ দিয়েছিল। তাতেও কুলোয় নি। এদেশের (ভারতের) শত শত বৈদিক পণ্ডিতকে মাসোহারা দিয়ে এ কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়েছিল। বিদ্যা ও জ্ঞানের জন্য এইরূপ বিপুল অর্থব্যয়, এইরূপ প্রবল জ্ঞানতৃষ্ণা এ দেশে এ যুগে কেউ কি কখন দেখেছে? Max Muller (মোক্ষমূলর) নিজেই ভূমিকায় লিখেছেন যে, তিনি ২৫ বৎসর কাল কেবল manuscript (হস্তলিপি) লিখেছেন; তারপর ছাপতে ২০ বৎসর লেগেছে! ৪৫ বৎসর একখানা বই নিয়ে এইরূপ লেগে পড়ে থাকা সামান্য মানুষের কার্য্য নয়। ইহাতেই বোঝ্; সাধে কি আর বলি, তিনি সায়ন!

মোক্ষমূলর সম্বন্ধে ঐরূপ কথাবার্ত্তা চলিবার পর আবার গ্রন্থপাঠ চলিতে লাগিল। এইবার বেদকে অবলম্বন করিয়াই সৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে—সায়নের এই মত স্বামীজী সর্ব্বথা সমর্থন করিতে লাগিলেন। বলিলেন—'বেদ' মানে অনাদি সত্যের সমষ্টি; বেদপারগ ঋষিগণ ঐ সকল সত্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন; অতীন্দ্রিয়দর্শী ভিন্ন, আমাদের মতন সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে সে সকল প্রত্যক্ষ হয় না; তাই বেদে ঋষি শব্দের অর্থ মন্ত্রার্থদ্রষ্টা;—পৈতা-গলায় ব্রাহ্মণ নহে। ব্রাহ্মণাদি জাতিবিভাগ পরে হয়েছিল। বেদ শব্দাত্মক অর্থাৎ ভাবাত্মক বা অনন্ত ভাবরাশির সমষ্টি মাত্র। 'শব্দ' পদের বৈদিক প্রাচীন অর্থ হচ্ছে সূক্ষ্মভাব, যাহা পরে

স্থূলাকার গ্রহণ করে আপনাকে প্রকাশিত করে। সুতরাং যখন প্রলয় হয়, তখন ভাবী সৃষ্টির সূক্ষ্ম বীজসমূহ বেদেই সম্পুটিত থাকে। তাই পুরাণে প্রথমে মীনাবতারে বেদের উদ্ধার দৃষ্ট হয়। প্রথমাবতারেই বেদের উদ্ধারসাধন হল। তারপর সেই বেদ থেকে ক্রমে সৃষ্টির বিকাশ হতে লাগল; অর্থাৎ বেদনিহিত শব্দাবলম্বনে বিশ্বের সকল স্থূল পদার্থ একে একে তৈরী হতে লাগল। কারণ, সকল স্থূল পদার্থেরই সূক্ষ্ম রূপ হচ্ছে শব্দ বা ভাব। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পেও এইরূপে সৃষ্টি হয়েছিল। একথা বৈদিক সন্ধ্যার মন্ত্রেই আছে 'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ পৃথিবীং দিবঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ।' বুঝ্লি?

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, কোন জিনিস না থাকিলে কাহার উদ্দেশে শব্দ প্রযুক্ত হইবে? আর পদার্থের নামসকলই বা কি করিয়া তৈয়ারী হইবে?

স্বামীজী। আপাততঃ তাই মনে হয় বটে। কিন্তু বোঝ্; এই ঘটটা ভেঙ্গে গেলে ঘটত্বের নাশ হয় কি? না। কেন না, ঘটটা হচ্ছে স্থূল; কিন্তু ঘটত্বটা হচ্ছে ঘটের সূক্ষ্ম বা শব্দাবস্থা। ঐরূপে সকল পদার্থের শব্দাবস্থাটি হচ্ছে ঐ সকল জিনিসের সূক্ষ্মাবস্থা। আর আমরা দেখি শুনি ধরি ছুঁই যে জিনিসগুলো সেগুলো হচ্ছে ঐরূপ সূক্ষ্ম বা শব্দাবস্থায় অবস্থিত পদার্থসকলের স্থূল বিকাশ। যেমন কার্য্য আর তার কারণ। জগৎ ধ্বংস হয়ে গেলেও জগদ্বোধাত্মক শব্দ বা স্থূল পদার্থসকলের সূক্ষ্ম স্বরূপসমূহ ব্রহ্মে কারণরূপে থাকে। জগদ্বিকাশের প্রাক্কালে প্রথমেই সূক্ষ্ম স্বরূপসমূহের সমষ্টিভূত

ঐ পদার্থ উদ্বেলিত হয়ে ওঠে ও উহারই প্রকৃত স্বরূপ শব্দগর্ভাত্মক অনাদি নাদ 'ওঁ'কার আপনা আপনি উঠতে থাকে। ক্রমে ঐ সমষ্টি হতে এক একটি বিশেষ বিশেষ পদার্থের প্রথমে সূক্ষ্ম প্রতিকৃতি বা শাব্দিক রূপ ও পরে স্থূল রূপ প্রকাশ পায়। ঐ শব্দই ব্রহ্ম—শব্দই বেদ। ইহাই সায়নের অভিপ্রায়। বুঝ্লি?

শিষ্য। মহাশয়, ভাল বুঝিতে পারিতেছি না।

স্বামীজী। জগতে যত ঘট আছে, সবগুলো নষ্ট হলেও ঘটশব্দ থাকতে যে পারে, তা ত বুঝেছিস্? তবে জগৎ ধ্বংস হলেও বা যে-সব জিনিসগুলোকে নিয়ে জগৎ, সেগুলো সব ভেঙ্গে চুরে গেলেও তত্ত্ববোধাত্মক শব্দগুলি কেন না থাকতে পারবে? আর তা থেকে পুনঃসৃষ্টি কেনই বা না হতে পারবে?

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, 'ঘট' 'ঘট' বলিয়া চীৎকার করিলেই ত ঘট তৈয়ারী হয় না।

স্বামীজী। তুই আমি ঐরূপে চীৎকার করলে হয় না; কিন্তু সিদ্ধসঙ্কল্প ব্রহ্মে ঘটস্মৃতি হবামাত্র ঘট প্রকাশ হয়। সামান্য সাধকের ইচ্ছাতেই যখন নানা অঘটনঘটন হতে পারে—তখন সিদ্ধসঙ্কল্প ব্রহ্মের কা কথা। সৃষ্টির প্রাক্কালে ব্রহ্ম প্রথম শব্দাত্মক হন, পরে 'ওঁ'কারাত্মক বা নাদাত্মক হয়ে যান। তারপর পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের নানা বিশেষ বিশেষ শব্দ, যথা—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, বা গো, মানব, ঘট, পট ইত্যাদি ঐ 'ওঁ'কার থেকে বেরুতে থাকে। সিদ্ধসঙ্কল্প ব্রহ্মে ঐ ঐ শব্দ ক্রমে এক

একটা করে হবামাত্র ঐ ঐ জিনিসগুলো অমনি তখনি বেরিয়ে ক্রমে বিচিত্র জগতের বিকাশ হয়ে পড়ে। এইবার বুঝ্‌লি—শব্দ কিরূপে সৃষ্টির মূল?

শিষ্য। হাঁ, একপ্রকার বুঝিলাম বটে। কিন্তু ঠিক ঠিক ধারণা হইতেছে না।

স্বামীজী। ধারণা হওয়া—প্রত্যক্ষ অনুভব করাটা কি সোজা রে বাপ? মন যখন ব্রহ্মাবগাহী হতে থাকে, তখন একটার পর একটা করে এই সব অবস্থার ভিতর দিয়ে গিয়ে, শেষে নির্ব্বিকল্পে উপস্থিত হয়। সমাধিমুখে প্রথম বুঝা যায়—জগৎটা শব্দময়, তারপর গভীর 'ওঁ'কার ধ্বনিতে সব মিলিয়ে যায়।—তারপর তা-ও শুনা যায় না।—তা-ও আছে কি নাই এইরূপ বোধ হয়। ঐটেই হচ্ছে অনাদি নাদ, তারপর প্রত্যক্-ব্রহ্মে মন মিলিয়ে যায়। ব্যস্—সব চুপ।

স্বামীজীর কথায় শিষ্যের পরিষ্কার বোধ হইতে লাগিল, স্বামীজী ঐ সকল অবস্থার ভিতর দিয়া অনেকবার স্বয়ং সমাধিভূমিতে গমনাগমন করিয়াছেন,—নতুবা এমন বিশদভাবে এ সকল কথা কিরূপে বুঝাইয়া বলিতেছেন? শিষ্য অবাক হইয়া শুনিতে ও ভাবিতে লাগিল—নিজের দেখা শুনা জিনিস না হইলে কখনও কেহ এরূপে বলিতে বুঝাইতে পারে না।

স্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেন—"অবতারকল্প মহাপুরুষেরা সমাধিভঙ্গের পর আবার যখন 'আমি আমার' রাজত্বে নেমে আসেন, তখন প্রথমেই অব্যক্ত নাদের অনুভব করেন; ক্রমে নাদ সুস্পষ্ট হয়ে 'ওঁ'কার অনুভব করেন, 'ওঁ'কার থেকে পরে

শব্দময় জগতের প্রতীতি করেন, তারপর সর্ব্বশেষে স্থূল ভূতজগতের প্রত্যক্ষ করেন। সামান্য সাধকের কিন্তু অনেক কষ্টে কোনরূপ নাদের পারে গিয়ে ব্রহ্মের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করতে পারলে পুনরায় স্থূল জগতের প্রত্যক্ষ হয় যে নিম্নভূমিতে—সেখানে আর নামতে পারে না। ব্রহ্মেই মিলিয়ে যায়—"ক্ষীরে নীরবৎ।"

এইসকল কথা হইতেছে, এমন সময় মহাকবি শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সেখানে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী তাঁহাকে অভিবাদন ও কুশলপ্রশ্নাদি করিয়া পুনরায় শিষ্যকে পাঠ দিতে লাগিলেন। গিরিশ বাবুও তাহা নিবিষ্টচিত্তে শুনিতে লাগিলেন এবং স্বামীজীর ঐরূপে অপূর্ব্ব বিশদভাবে বেদব্যাখ্যা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

পূর্ব্ব বিষয়ের অনুসরণ করিয়া স্বামীজী পুনরায় বলিতে লাগিলেন—বৈদিক ও লৌকিক ভেদে শব্দ আবার দ্বিধা বিভক্ত। 'শব্দশক্তিপ্রকাশিকায়'[১] এ বিষয়ের বিচার দেখেছি। বিচারগুলি খুব চিন্তার পরিচায়ক বটে, কিন্তু terminology-র (পরিভাষার) চোটে মাথা গুলিয়ে উঠে!

এইবার গিরিশ বাবুর দিকে চাহিয়া স্বামীজী বলিলেন—"কি জি. সি., এসব ত কিছু পড়লে না—কেবল কেষ্ট বিষ্টু নিয়েই দিন কাটালে।"

গিরিশ বাবু। 'কি আর পড়ব ভাই? অত অবসরও নাই, বুদ্ধিও নাই যে ওতে সেধুব। তবে ঠাকুরের কৃপায় ওসব বেদবেদান্ত মাথায় রেখে এবার পাড়ি মারব। তোমাদের দিয়ে তাঁর ঢের

১ ন্যায়প্রস্থানের গ্রন্থবিশেষ।

কাজ করাবেন বলে ওসব পড়িয়ে নিয়েছেন, আমার ওসব দরকার নাই', বলিয়া গিরিশ বাবু সেই প্রকাণ্ড ঋগ্বেদ গ্রন্থ-খানিকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে ও বলিতে লাগিলেন—'জয় বেদরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের জয়' !

পাঠককে আমরা অন্যত্র বলিয়াছি, স্বামীজী যখন যে বিষয়ে উপদেশ করিতেন, শ্রোতাদিগের মনে তদ্বিষয় তখন এত গভীর ভাবে অঙ্কিত হইয়া যাইত যে, ঐ বিষয়কেই তাহারা ঐ সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা সার বস্তু বলিয়া অনুভব করিত। ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে যখন তিনি বলিতে থাকিতেন, তখন শ্রোতৃবৃন্দ তল্লাভই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া ধারণা করিত। আবার ভক্তি বা কর্ম্ম বা জাতীয় উন্নতি প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ে যখন তিনি প্রসঙ্গ উঠাইতেন, তখন তত্তদ্বিষয়কেই শ্রোতারা মনে মনে সর্ব্বোচ্চাসন প্রদান করিয়া তত্তদ্বিষয়ানুষ্ঠানের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিত। বর্ত্তমানে বেদের প্রসঙ্গ উঠাইয়া তিনি শিষ্য প্রভৃতির মন বেদোক্ত জ্ঞানের মহিমায় এতই মুগ্ধ করিয়াছিলেন যে, তাহারা তখন উহাপেক্ষা সার এবং প্রয়োজনীয় বস্তু অন্য কিছু আর খুঁজিয়া পাইতেছিল না। গিরিশ বাবু তদ্বিষয়ে লক্ষ্য করিলেন এবং স্বামীজীর মহদুদার ভাব ও শিক্ষাদানের ঐরূপ রীতির বিষয় ইতঃপূর্ব্বে পরিজ্ঞাত থাকায় শিষ্য প্রভৃতিকে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সমান প্রয়োজ-নীয়তা অনুভব করাইয়া দিবার জন্য এখন মনে মনে এক যুক্তি স্থির করিলেন।

স্বামীজী অন্যমনা হইয়া কি ভাবিতেছিলেন, ইতোমধ্যে গিরিশ বাবু বলিয়া উঠিলেন—"হাঁ হে নরেন, একটা কথা বলি। বেদ-

বেদান্ত ত ঢের পড়লে, কিন্তু এই যে দেশে ঘোর হাহাকার, অন্নাভাব, ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা, মহাপাতকাদি চোখের সামনে দিন রাত ঘুরচে, এর উপায় তোমার বেদে কিছু বলেছে ? ঐ অমুকের বাড়ীর গিন্নী—এককালে যার বাড়ীতে রোজ পঞ্চাশখানি পাতা পড়ত, সে আজ তিন দিন হাঁড়ি চাপায় নি ; ঐ অমুকের বাড়ীর কুলস্ত্রীকে গুণ্ডাগুলো অত্যাচার করে মেরে ফেলেছে ; ঐ অমুকের বাড়ীতে ভ্রূণহত্যা হয়েছে, অমুক জুয়োচুরি করে বিধবার সর্ব্বস্ব হরণ করেছে—এ সকল রহিত করবার কোনও উপায় তোমার বেদে আছে কি ?" গিরিশ বাবু এইরূপে সমাজের বিভীষিকাপ্রদ ছবিগুলি উপর্য্যুপরি অঙ্কিত করিয়া দেখাইতে আরম্ভ করিলে স্বামীজী নির্ব্বাক হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। জগতের দুঃখকষ্টের কথা ভাবিতে ভাবিতে স্বামীজীর চক্ষে জল আসিল। তিনি তাঁহার মনের ঐরূপ ভাব আমাদের জানিতে দিবেন না বলিয়াই যেন উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

ইতোমধ্যে গিরিশ বাবু শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেখ্‌লি বাঙ্গাল, কত বড় প্রাণ! তোর স্বামীজীকে কেবল বেদজ্ঞ পণ্ডিত বলে মানি না ; কিন্তু ঐ যে জীবের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল, এই মহাপ্রাণতার জন্য মানি! চোখের সামনে দেখলি ত, মানুষের দুঃখকষ্টের কথাগুলো শুনে করুণায় হৃদয় পূর্ণ হয়ে স্বামীজীর বেদ-বেদান্ত সব কোথায় উড়ে গেল।"

শিষ্য। মহাশয়, আমাদের বেশ বেদ পড়া হইতেছিল ; আপনি মায়ার জগতের কি কতকগুলো ছাইভস্ম কথা তুলিয়া স্বামীজীর মন খারাপ করিয়া দিলেন।

গিরিশ বাবু। জগতে এই দুঃখকষ্ট, আর উনি সে দিকে একবার না চেয়ে চুপ করে বসে কেবল বেদ পড়ছেন! রেখে দে তোর বেদ-বেদান্ত।

শিষ্য। আপনি কেবল হৃদয়ের ভাষা শুনিতেই ভালবাসেন; নিজে হৃদয়বান কি না! কিন্তু এইসব শাস্ত্র, যাহার আলোচনায় জগৎ ভুল হইয়া যায়, তাহাতে আপনার আদর দেখিতে পাই না। নতুবা এমন করিয়া আজ রসভঙ্গ করিতেন না।

গিরিশ বাবু। বলি জ্ঞান আর প্রেমের পৃথকত্বটা কোথায় আমায় বুঝিয়ে দে দেখি। এই দ্যাখ্ না, তোর গুরু (স্বামীজী) যেমন পণ্ডিত তেমনি প্রেমিক। তোর বেদও বলছে না 'সৎ-চিৎ-আনন্দ' তিনটে একই জিনিস? এই দ্যাখ্ না, স্বামীজী অত পাণ্ডিত্য প্রকাশ করছিলেন, কিন্তু যাই জগতের দুঃখের কথা শুনা ও মনে পড়া, অমনি জীবের দুঃখে কাঁদতে লাগলেন। জ্ঞান আর প্রেমে যদি বেদ-বেদান্ত বিভিন্নতা প্রমাণ ক'রে থাকেন ত অমন বেদ-বেদান্ত আমার মাথায় থাকুন।

শিষ্য নির্ব্বাক হইয়া ভাবিতে লাগিল, "সত্যই ত গিরিশ বাবুর সিদ্ধান্তগুলি বেদের অবিরোধী।"

ইতোমধ্যে স্বামীজী আবার ফিরিয়া আসিলেন এবং শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"কিরে তোদের কি কথা হচ্ছিল?"

শিষ্য বলিল—"এই সব বেদের কথাই হইতেছে। ইনি এসকল গ্রন্থ পড়েন নাই, কিন্তু সিদ্ধান্তগুলি বেশ ঠিক ঠিক ধরিতে পারিয়াছেন—বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।

স্বামীজী। গুরুভক্তি থাকলে সব সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ হয়—পড়বার শুনবার দরকার হয় না। তবে এরূপ ভক্তি ও বিশ্বাস জগতে দুর্লভ। ওর (গিরিশ বাবুর) মত যাঁদের ভক্তি বিশ্বাস, তাঁদের শাস্ত্র পড়বার দরকার নাই। কিন্তু ওকে (গিরিশ বাবুকে) imitate (অনুকরণ) করতে গেলে অপরের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হবে। ওর কথা শুনে যাবি, কিন্তু কখন ওর দেখাদেখি কাজ করতে যাবি না।

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ।

স্বামীজী। আজ্ঞে হাঁ নয়! যা বলি সে-সব কথাগুলি বুঝে নিবি—মূর্খের মত সব কথায় কেবল সায় দিয়ে যাবি না। আমি বললেও—বিশ্বাস করবি নি। বুঝে তবে নিবি। আমাকে ঠাকুর তাঁর কথা সব বুঝে নিতে সর্ব্বদা বলতেন। সদ্‌যুক্তি, তর্ক ও শাস্ত্রে যা বলেছে, এই সব নিয়ে পথে চল্‌বি। বিচার করতে করতে বুদ্ধি পরিষ্কার হয়ে যাবে, তবে তাইতে ব্রহ্ম reflected (প্রতিফলিত) হবেন। বুঝ্‌লি?

শিষ্য। হাঁ। কিন্তু নানা লোকের নানা কথায় মাথা ঠিক থাকে না। এই একজন (গিরিশ বাবু) বলিলেন, 'কি হবে ও-সব পড়ে?' আবার এই আপনি বলিতেছেন বিচার করিতে। এখন করি কি?

স্বামীজী। আমাদের উভয়ের কথাই সত্যি। তবে দুই standpoint (বিভিন্ন দিক) থেকে আমাদের দুই জনের কথাগুলি বলা হচ্ছে—এই পর্য্যন্ত। একটা অবস্থা আছে যেখানে যুক্তি-তর্ক সব চুপ হয়ে যায়—'মূকাস্বাদনবৎ।' আর একটা অবস্থা

আছে যাতে—বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থের আলোচনা, পঠন-পাঠন করতে করতে সত্যবস্তু প্রত্যক্ষ হয়। তোকে এসকল পড়ে শুনে যেতে হবে, তবে তোর সত্য প্রত্যক্ষ হবে। বুঝ্লি ?

নির্ব্বোধ শিষ্য স্বামীজীর ঐরূপ আদেশলাভে গিরিশ বাবুর হার হইল মনে করিয়া গিরিশ বাবুর দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল—"মহাশয়, শুনিলেন ত—স্বামীজী আমায় বেদবেদান্ত পড়িতে ও বিচার করিতেই বলিলেন।"

গিরিশ বাবু। তা তুই করে যা। স্বামীজীর আশীর্ব্বাদে তোর তাই করেই সব ঠিক হবে।

স্বামী সদানন্দ এই সময়ে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন—"ওরে, এই জি. সি-র মুখে দেশের দুর্দ্দশার কথা শুনে প্রাণটা আঁকুপাঁকু কচ্ছে। দেশের জন্য কিছু করতে পারিস ?

সদানন্দ। মহারাজ! যো হুকুম - বান্দা তৈয়ার হ্যায়।

স্বামীজী। প্রথমে ছোট-খাট scale-এ (হারে) একটা relief centre (সেবাশ্রম) খোল, যাতে গরীব-দুঃখীরা সব সাহায্য পাবে, রোগীদের সেবা করা হবে—যাদের কেউ দেখবার নেই এমন অসহায় লোকদের জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সেবা করা হবে। বুঝলি ?

সদানন্দ। যো হুকুম, মহারাজ !

স্বামীজী। জীবসেবার চেয়ে আর ধর্ম্ম নেই। সেবাধর্ম্মের ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান করতে পারলে অতি সহজেই সংসারবন্ধন কেটে যায়—"মুক্তিঃ করফলায়তে।"

এইবার গিরিশ বাবুকে সম্বোধন করিয়া স্বামীজী বলিলেন—"দেখ গিরিশ বাবু, মনে হয়—এই জগতের দুঃখ দূর করতে আমার যদি হাজারও জন্ম নিতে হয়, তাও নেবো। তাতে যদি কারও এতটুকু দুঃখ দূর হয় ত তা করব। মনে হয়, খালি নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে? সকলকে সঙ্গে নিয়ে ঐ পথে যেতে হবে। কেন বল দেখি এমন ভাব উঠে?

গিরিশ বাবু। তা না হলে আর তিনি (ঠাকুর) তোমায় সকলের চেয়ে বড় আধার বলতেন!

এই বলিয়া গিরিশ বাবু কার্য্যান্তরে যাইবেন বলিয়া বিদায় লইলেন।

একাদশ বল্লী

স্থান—আলমবাজার মঠ

বর্ষ—১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ

মঠে স্বামীজীর নিকট হইতে কয়েক জনের সন্ন্যাসদীক্ষাগ্রহণ—সন্ন্যাসধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বামীজীর উপদেশ—ত্যাগই মানবজীবনের উদ্দেশ্য—"আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" উদ্দেশ্যে সর্ব্বস্বত্যাগই সন্ন্যাস—সন্ন্যাসগ্রহণের কালাকাল নাই, "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ"—চারি প্রকার সন্ন্যাস—ভগবান বুদ্ধদেবের পর হইতেই বিবিদিষা সন্ন্যাসের বৃদ্ধি—বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে সন্ন্যাসাশ্রম থাকিলেও ত্যাগ-বৈরাগ্যই মানবজীবনের লক্ষ্য বলিয়া বিবেচিত হইত না—নিষ্কর্ম্মা সন্ন্যাসিদল দেশের কোন কাজে আসে না ইত্যাদি যুক্তিখণ্ডন—যথার্থ সন্ন্যাসী নিজের মুক্তি পর্য্যন্ত শেষে উপেক্ষা করিয়া জগতের কল্যাণসাধন করেন।

ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি, স্বামীজী প্রথমবার বিলাত হইতে ফিরিয়া যখন কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন, তখন বহু উৎসাহী যুবক স্বামীজীর নিকট যাতায়াত করিত। দেখা গিয়াছে, সেই সময় স্বামীজী অবিবাহিত যুবকগণকে ব্রহ্মচর্য্য ও ত্যাগের বিষয় সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন এবং সন্ন্যাস অথবা আপনার মোক্ষ ও জগতের কল্যাণার্থ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে বহুধা উৎসাহিত করিতেন। আমরা তাঁহাকে অনেক সময় বলিতে শুনিয়াছি, সন্ন্যাস গ্রহণ না করিলে কাহারও যথার্থ আত্মজ্ঞানলাভই হইতে পারে না; তাহাই কেবল নহে,—বহুজনহিতকর, বহুজনসুখকর কোন ঐহিক কার্য্যের অনুষ্ঠান ও তাহাতে সিদ্ধিলাভ করাও সন্ন্যাস ভিন্ন হয় না। তিনি সর্ব্বদা ত্যাগের উচ্চাদর্শ উৎসাহী যুবকদের সমক্ষে স্থাপন করিতেন; এবং কেহ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে তাহাকে সমধিক উৎসাহিত করিতেন ও কৃপা করিতেন।

তাঁহার উৎসাহবাক্যে তখন কতিপয় ভাগ্যবান যুবক সংসার-আশ্রম ত্যাগ করিয়া তাঁহার দ্বারাই সন্ন্যাসাশ্রমে দীক্ষিত হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে যে চারিজনকে স্বামীজী প্রথম সন্ন্যাস দেন, তাঁহাদের সন্ন্যাসব্রতগ্রহণের দিন শিষ্য আলমবাজার মঠে উপস্থিত ছিল। শিষ্যের মনে সেই দিন এখনও জাগরূক রহিয়াছে।

স্বামী নিত্যানন্দ, বিরজানন্দ, প্রকাশানন্দ ও নির্ভয়ানন্দ নাম গ্রহণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণমণ্ডলীতে ইদানীং যাঁহারা সুপরিচিত, তাঁহারাই ঐ দিনে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। মঠের সন্ন্যাসিগণের মুখে শিষ্য অনেকবার শুনিয়াছে যে, ইঁহাদের মধ্যে একজনকে যাহাতে সন্ন্যাস না দেওয়া হয়, তজ্জন্য স্বামীজীর গুরুভ্রাতৃগণ তাঁহাকে বহুধা অনুরোধ করেন। স্বামীজী তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "আমরা যদি পাপী তাপী দীন দুঃখী পতিতের উদ্ধারসাধনে পশ্চাৎপদ হই, তা হলে কে আর দেখবে—তোমরা এ বিষয়ে কোনরূপ প্রতিবাদী হইও না।" স্বামীজীর বলবতী ইচ্ছাই পূর্ণ হইল। অনাথশরণ স্বামীজী নিজ কৃপাগুণে তাঁহাকে সন্ন্যাস দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

শিষ্য আজ দুই দিন হইতে মঠেই রহিয়াছে। স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, "তুই ত ভট্‌চায্‌ বামুন; আগামীকল্য তুই-ই এদের শ্রাদ্ধ করিয়ে দিবি, পরদিন এদের সন্ন্যাস দিব। আজ পাঁজি পুঁথি সব পড়ে-শুনে দেখে নিস্।" শিষ্য স্বামীজীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া লইল।

সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বদিন সন্ন্যাসব্রত-ধারণে কৃতনিশ্চয় উক্ত ব্রহ্মচারিচতুষ্টয় মস্তক মুণ্ডন করিলেন, গঙ্গাস্নানান্তে শুভ্রবস্ত্র পরিধান

করিয়া স্বামীজীর পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন এবং স্বামীজীর স্নেহাশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া শ্রাদ্ধ করিবার জন্য উৎসাহিত হইলেন।

এখানে ইহা বলাও অত্যুক্তি হইবে না যে, শাস্ত্রমতে যাঁহারা সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে আপনাদের শ্রাদ্ধও ঐ সময়ে আপনি করিয়া লইতে হয়, কারণ সন্ন্যাসগ্রহণ করিলে লৌকিক কি বৈদিক কোন বিষয়ে আর অধিকার থাকে না। পুত্রপৌত্রাদিকৃত শ্রাদ্ধ বা পিণ্ডদানাদি ক্রিয়ার ফল তাঁহাদিগকে আর স্পর্শ করিতে পারে না। সেইজন্য সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে নিজের শ্রাদ্ধ নিজেই করিতে হয়; নিজের পায়ে নিজ পিণ্ড অর্পণ করিয়া সংসারের, এমন কি নিজ দেহের পূর্ব্ব সম্বন্ধাদি সঙ্কল্প দ্বারা নিঃশেষে বিলোপ-সাধন করিতে হয়। ইহাকে সন্ন্যাসগ্রহণের অধিবাসক্রিয়া বলা যাইতে পারে। শিষ্য দেখিয়াছে, স্বামীজী এই সকল বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ডে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন; শাস্ত্রমতে এই সকল ক্রিয়াকাণ্ড ঠিক ঠিক সম্পন্ন না হইলে মহা বিরক্ত হইতেন। আজকাল যেমন গেরুয়া পরিয়া বাহির হইলেই অনেকে সন্ন্যাসদীক্ষা সম্পন্ন হইল বলিয়া মনে করেন, স্বামীজী সেরূপ মনে করিতেন না। গুরুপরম্পরাগত আবহমানকাল প্রচলিত ব্রহ্মবিদ্যাসাধনোপযোগী সন্ন্যাসব্রতগ্রহণের প্রাগনুষ্ঠেয় নৈষ্ঠিক সংস্কারগুলি ব্রহ্মচারিগণের দ্বারা ঠিক ঠিক সাধন করাইয়া লইলেন। আমরা একথাও শুনিয়াছি যে, পরমহংসদেবের অপ্রকট হইবার পর স্বামীজী সন্ন্যাস লইবার বিধিবদ্ধ পদ্ধতি যে-সকল উপনিষদাদি শাস্ত্রে আছে, সে-সকল আনাইয়া স্বীয় গুরু-ভ্রাতৃগণের সঙ্গে একত্রে ঠাকুরের ছবির সমক্ষে বৈদিক মতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আলমবাজার মঠে উপর তলায় যে জলের ঘর ছিল, তাহাতে শ্রাদ্ধোপযোগী দ্রব্যসম্ভার আনীত হইয়াছে। স্বামী নিত্যানন্দ পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধক্রিয়া অনেকবার করিয়াছিলেন; সুতরাং আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি যোগাড়ের কোন ক্রুটি হয় নাই। শিষ্য স্নানান্তে স্বামীজীর আদেশে পৌরোহিত্যকার্য্যে ব্রতী হইল। মন্ত্রাদি যথাযথ পঠন-পাঠন হইতে লাগিল। স্বামীজী এক একবার আসিয়া দেখিয়া যাইতে লাগিলেন। শ্রাদ্ধান্তে যখন ব্রহ্মচারিচতুষ্টয় নিজ নিজ পিণ্ড নিজ নিজ পদে অর্পণ করিয়া আজ হইতে সংসার-সমক্ষে মৃতবৎ প্রতীয়মান হইলেন, শিষ্য তখন নিতান্ত ব্যাকুলহৃদয় হইল; সন্ন্যাসের কঠোরতা স্মরণ করিয়া মুহ্যমান হইল। পিণ্ডাদি লইয়া যখন ইঁহারা গঙ্গায় চলিয়া গেলেন, তখন স্বামীজী শিষ্যের ব্যাকুলতা দর্শন করিয়া বলিলেন, "এসব দেখে শুনে তোর মনে ভয় হয়েছে—না রে ?" শিষ্য নতমস্তকে সম্মতি জ্ঞাপন করায় স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, "সংসারে আজ থেকে এদের মৃত্যু হল, কাল থেকে এদের নূতন দেহ, নূতন চিন্তা, নূতন পরিচ্ছদ হবে—এরা ব্রহ্মবীর্য্যে প্রদীপ্ত হয়ে জ্বলন্ত পাবকের ন্যায় অবস্থান করবে। 'ন ধনেন ন চেজ্যয়া ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ'।"

স্বামীজীর কথা শুনিয়া শিষ্য নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সন্ন্যাসের কঠোরতা স্মরণ করিয়া তাহার বুদ্ধি স্তম্ভিত হইয়া গেল,—শাস্ত্রজ্ঞানাস্ফালন দূরীভূত হইল। সে ভাবিতে লাগিল, কার্য্যে ও কথায় এত প্রভেদ!

কৃতশ্রাদ্ধ ব্রহ্মচারিচতুষ্টয় ইতোমধ্যে গঙ্গাতে পিণ্ডাদি নিক্ষেপ করিয়া আসিয়া স্বামীজীর পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন। স্বামীজী

আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "তোমরা মানবজীবনের শ্রেষ্ঠব্রতগ্রহণে উৎসাহিত হইয়াছ ; ধন্য তোমাদের জন্ম, ধন্য তোমাদের বংশ—ধন্য তোমাদের গর্ভধারিণী। 'কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা'।"

সেইদিন রাত্রে আহারান্তে স্বামীজী কেবল সন্ন্যাসধর্ম্ম-বিষয়েই কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসব্রতগ্রহণোৎসুক ব্রহ্মচারিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ—এই হচ্ছে সন্ন্যাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সন্ন্যাস না হলে কেহ কদাচ ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারে না—এ কথা বেদ-বেদান্ত ঘোষণা কচ্ছে। যারা বলে—এ সংসারও করব, ব্রহ্মজ্ঞও হব—তাদের কথা আদপেই শুন্‌বি নি। ওসব প্রচ্ছন্নভোগীদের স্তোক-বাক্য। এতটুকু সংসারের ভোগেচ্ছা যার রয়েছে—এতটুকু কামনা যার রয়েছে—এ কঠিন পন্থা ভেবে তার ভয় হয় ; তাই আপনাকে প্রবোধ দেবার জন্য বলে বেড়ায়, 'একূল ওকূল দুকূল রেখে চলতে হবে'। ও পাগলের কথা, উন্মত্তের প্রলাপ—অশাস্ত্রীয়—অবৈদিক মত। ত্যাগ ভিন্ন মুক্তি নাই। ত্যাগ ভিন্ন পরাভক্তি লাভ হয় না। ত্যাগ—ত্যাগ—'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'। গীতাতেও আছে—'কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ'।"

"সংসারের ঝঞ্ঝাট ছেড়ে না দিলে কারও মুক্তি হয় না। সংসারাশ্রমে যে রয়েছে, একটা না একটা কামনার দাস হয়েই যে সে ঐরূপে বদ্ধ রয়েছে, ইহা উহাতেই প্রমাণ হচ্ছে। নৈলে সংসারে থাকবে কেন? হয় কামিনীর দাস—নয় অর্থের দাস—নয় মান, যশ, বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের দাস। এ দাসত্ব থেকে বেরিয়ে পড়লে তবে মুক্তির পন্থায় অগ্রসর হতে পারা যায়! যে যতই

কেন বলুক না, আমি বুঝেছি, এ সব ছেড়ে ছুড়ে না দিলে, সন্ন্যাস গ্রহণ না করলে কিছুতেই জীবের পরিত্রাণ নাই—কিছুতেই ব্রহ্মজ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই।”

শিষ্য। মহাশয়, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই কি সিদ্ধিলাভ হয়?

স্বামীজী। সিদ্ধ হয় কি না হয় পরের কথা। তুই যতক্ষণ না এই ভীষণ সংসারের গণ্ডি থেকে বেড়িয়ে পড়তে পারছিস—যতক্ষণ না বাসনার দাসত্ব ছাড়তে পারছিস—ততক্ষণ তোর ভক্তি মুক্তি কিছুই লাভ হবে না। ব্রহ্মজ্ঞের কাছে সিদ্ধি ঋদ্ধি অতি তুচ্ছ কথা।

শিষ্য। মহাশয়, সন্ন্যাসের কোনরূপ কালাকাল বা প্রকার-ভেদ আছে কি?

স্বামীজী। সন্ন্যাসধর্ম্ম-সাধনের কালাকাল নাই। শ্রুতি বল্‌ছেন, ‘যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ’—যখনি বৈরাগের উদয় হবে, তখনি প্রব্রজ্যা করবে। যোগবাশিষ্ঠেও রয়েছে—

‘যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ অনিত্যং খলু জীবিতং।
কো হি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি।’

জীবনের অনিত্যতাবশতঃ যুবকালেই ধর্ম্মশীল হবে। কে জানে কার কখন দেহ যাবে? শাস্ত্রে চতুর্ব্বিধ সন্ন্যাসের বিধান দেখতে পাওয়া যায়।—(১) বিদ্বৎ সন্ন্যাস, (২) বিবিদিষা সন্ন্যাস, (৩) মর্কট সন্ন্যাস, এবং (৪) আতুর সন্ন্যাস। হঠাৎ ঠিক ঠিক বৈরাগ্য হল ও তখনি সন্ন্যাস নিয়ে বেরিয়ে পড়লে—এটি প্রাগ্‌জন্মসংস্কার না থাকলে হয় না। ইহারই নাম বিদ্বৎ সন্ন্যাস। আত্মতত্ত্ব জানবার প্রবল বাসনা থেকে

শাস্ত্রপাঠ ও সাধনাদি দ্বারা স্ব-স্বরূপ অবগত হইবার জন্য কোন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের কাছে সন্ন্যাস নিয়ে স্বাধ্যায় ও সাধন-ভজন করতে লাগল—একে বিবিদিষা সন্ন্যাস বলে। সংসারের তাড়না, স্বজনবিয়োগ বা অন্য কোন কারণে কেউ কেউ বেরিয়ে পড়ে সন্ন্যাস নেয়; কিন্তু এ বৈরাগ্য স্থায়ী হয় না, এর নাম মর্কট সন্ন্যাস। ঠাকুর যেমন বল্‌তেন, "বৈরাগ্য নিয়ে পশ্চিমে গিয়ে আবার একটা চাকরি বাগিয়ে নিলে; তার পর চাই কি পরিবার আনলে বা আবার বে করে ফেললে।" আর এক প্রকার সন্ন্যাস আছে—যেমন—মুমূর্ষু, রোগশয্যায় শায়িত, বাঁচবার আশা নাই, তখন তাকে সন্ন্যাস দিবার বিধি আছে। সে যদি মরে ত পবিত্র সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করে মরে গেল—পর জন্মে এই পুণ্যে ভাল জন্ম হবে। আর যদি বেঁচে যায় ত আর গৃহে না গিয়ে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের চেষ্টায় সন্ন্যাসী হয়ে কালযাপন করবে। তোর কাকাকে শিবানন্দ স্বামী আতুর সন্ন্যাস দিয়েছিল। সে মরে গেল, কিন্তু ঐরূপে সন্ন্যাসগ্রহণে তার উচ্চ জন্ম হবে। সন্ন্যাস না নিলে কিন্তু আত্মজ্ঞানলাভের আর উপায়ান্তর নাই।

শিষ্য। মহাশয়, গৃহীদের তবে উপায়?

স্বামীজী। সুকৃতিবশতঃ কোন না কোন জন্মে তাদের বৈরাগ্য হবে। বৈরাগ্য এলেই হয়ে গেল—জন্ম-মৃত্যু-প্রহেলিকার পারে যাবার আর দেরী হয় না। তবে সকল নিয়মেরই দু-একটা exception (ব্যতিক্রম) আছে। ঠিক ঠিক গৃহীর

ধর্ম্ম পালন করেও দু-একটা মুক্ত পুরুষ হতে দেখা যায়; যেমন আমাদের মধ্যে 'নাগ মহাশয়'!

শিষ্য। মহাশয়, বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস বিষয়ে উপনিষদাদি গ্রন্থেও বিশদ উপদেশ পাওয়া যায় না।

স্বামীজী। পাগলের মত কি বলছিস। বৈরাগ্যই উপনিষদের প্রাণ। বিচারজনিত প্রজ্ঞাই উপনিষদ্-জ্ঞানের চরম লক্ষ্য। তবে আমার বিশ্বাস—ভগবান বুদ্ধদেবের পর থেকেই ভারতবর্ষে এই ত্যাগব্রত বিশেষরূপে প্রচারিত হয়েছে এবং বৈরাগ্য ও বিষয়বিতৃষ্ণাই ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম্মের সেই ত্যাগ বৈরাগ্য হিন্দুধর্ম্ম absorb (নিজের ভিতর হজম) করে নিয়েছে! ভগবান বুদ্ধের ন্যায় ত্যাগী মহাপুরুষ পৃথিবীতে আর জন্মায় নি।

শিষ্য। তবে কি মহাশয়, বুদ্ধদেবের জন্মাইবার পূর্ব্বে দেশে ত্যাগ-বৈরাগ্যের অল্পতা ছিল এবং দেশে সন্ন্যাসী ছিল না?

স্বামীজী। তা কে বললে? সন্ন্যাসাশ্রম ছিল, কিন্তু উহাই জীবনের চরমলক্ষ্য বলে সাধারণের জানা ছিল না, বৈরাগ্য-দার্ঢ্য ছিল না, বিবেক-নিষ্ঠা ছিল না। সেই জন্য বুদ্ধদেব কত যোগী, কত সাধুর কাছে গিয়ে শান্তি পেলেন না। তারপর "ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং" বলে আত্মজ্ঞানলাভের জন্য নিজেই বসে পড়লেন এবং প্রবুদ্ধ হয়ে তবে উঠলেন। ভারতবর্ষে এই যে সব সন্ন্যাসীদের মঠ ফঠ দেখতে পাচ্ছিস—এ সব বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অধিকারে ছিল, হিন্দুরা সেই সকলকে এখন তাদের রঙ্গে রঙ্গিয়ে নিজস্ব করে বসেছে। ভগবান বুদ্ধদেব হতেই

যথার্থ সন্ন্যাসাশ্রমের সূত্রপাত হয়েছিল। তিনিই সন্ন্যাসাশ্রমের মৃতকঙ্কালাস্থিতে প্রাণসঞ্চার করে গেছেন।

স্বামীজীর গুরুভ্রাতা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বলিলেন, "বুদ্ধদেব জন্মাবার আগেও ভারতে আশ্রম-চতুষ্টয় যে ছিল, সংহিতা-পুরাণাদি তার প্রমাণস্থল।" উত্তরে স্বামীজী বলিলেন, "মন্বাদি সংহিতা, পুরাণসকলের অধিকাংশ এবং মহাভারতের অনেকটাও সেদিনকার শাস্ত্র। ভগবান বুদ্ধ তার ঢের আগে।" স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বলিলেন, "তা হলে বেদে, উপনিষদে, সংহিতায়, পুরাণে বৌদ্ধধর্ম্মের সমালোচনা নিশ্চয় থাকত; কিন্তু এই সকল প্রাচীন গ্রন্থে যখন বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনা দেখা যায় না তখন তুমি কি করে বলবে বুদ্ধদেব তার আগেকার লোক? দুই-চারখানি প্রাচীন পুরাণাদিতে বৌদ্ধমতের আংশিক বর্ণনা রয়েছে—তা দেখে কিন্তু বলা যায় না যে, হিন্দুর সংহিতা পুরাণাদি আধুনিক শাস্ত্র।

স্বামীজী। History (ইতিহাস) পড়ে দেখ। দেখতে পাবি, হিন্দুধর্ম্ম বুদ্ধদেবের সব ভাবগুলি absorb (হজম) করে এত বড় হয়েছে।

রামকৃষ্ণানন্দ। আমার বোধ হয়, ত্যাগ বৈরাগ্য প্রভৃতি জীবনে ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান করে বুদ্ধদেব হিন্দুধর্ম্মের ভাবগুলি সজীব করে গেছেন মাত্র।

স্বামীজী। ঐ কথা কিন্তু প্রমাণ করা যায় না। কারণ, বুদ্ধদেব জন্মাবার আগেকার কোন History (প্রামাণ্য ইতিহাস) পাওয়া যায় না। Historyকে (ইতিহাসকে) authority (প্রমাণ) বলে মানলে একথা স্বীকার করতে হয় যে,

পুরাকালের ঘোর অন্ধকারে ভগবান বুদ্ধদেবই একমাত্র জ্ঞানালোকপ্রদীপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন।

এইবার পুনরায় সন্ন্যাসধর্ম্মের প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। স্বামীজী বলিলেন, "সন্ন্যাসের origin (উৎপত্তি) যেখানেই হ'ক না কেন, মানব-জন্মের goal (উদ্দেশ্য) হচ্ছে, এই ত্যাগব্রতাবলম্বনে ব্রহ্মজ্ঞ হওয়া। সন্ন্যাসগ্রহণই হচ্ছে পরম পুরুষার্থ। যাদের বৈরাগ্য উপস্থিত হয়ে সংসারে বীতরাগ হয়েছে, তারাই ধন্য।

শিষ্য। মহাশয়, আজকাল অনেকে বলিয়া থাকেন যে, ত্যাগী সন্ন্যাসীদের সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ায় দেশের ব্যবহারিক উন্নতির পক্ষে ক্ষতি হইয়াছে। গৃহস্থের মুখাপেক্ষী হইয়া সাধুরা নিষ্কর্ম্মা হইয়া ঘুরিয়া বেড়ান বলিয়া ইহারা বলেন, 'উহারা সমাজ ও স্বদেশের উন্নতিকল্পে কোনরূপ সহকারী হন না।'

স্বামীজী। লৌকিক বা ব্যবহারিক উন্নতি কথাটার মানেটা কি, আগে আমায় বুঝিয়ে বল দেখি।

শিষ্য। পাশ্চাত্ত্য যেমন বিদ্যাসহায়ে দেশে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতেছে, বিজ্ঞানসহায়ে দেশে বাণিজ্য, শিল্প, পোশাক-পরিচ্ছদ, রেল, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি নানাবিষয়ের উন্নতিসাধন করিতেছে, সেইরূপ করা।

স্বামীজী। মানুষের মধ্যে রজোগুণের অভ্যুদয় না হলে এসব হয় কি? ভারতবর্ষ ঘুরে দেখলুম, কোথাও রজোগুণের বিকাশ নাই! কেবল তমো—তমো—ঘোর তমোগুণে ইতরসাধারণ সকলে পড়ে রয়েছে। কেবল সন্ন্যাসীদের ভিতরেই দেখেছি, রজঃ ও সত্ত্বগুণ রয়েছে, এরাই ভারতের মেরুদণ্ড। যথার্থ

সন্ন্যাসী—গৃহীদের উপদেষ্টা। তাদের উপদেশ ও জ্ঞানালোক পেয়েই পূর্ব্বে অনেক সময়ে গৃহীরা জীবনসংগ্রামে কৃতকার্য্য হয়েছিল। সন্ন্যাসীদের বহুমূল্য উপদেশের বিনিময়ে গৃহীরা তাহাদিগকে অন্নবস্ত্র দেয়। এই আদান-প্রদান না থাকলে ভারতবর্ষের লোক এতদিনে আমেরিকার Indians-দের (আদিমনিবাসীদের) মত extinct (উজাড) হয়ে যেত। সন্ন্যাসীদের গৃহীরা দুমুটো খেতে দেয় বলে গৃহীরা এখনও উন্নতির পথে যাচ্ছে। সন্ন্যাসীরা কর্ম্মহীন নয়। তারাই হচ্ছে কর্ম্মের fountain-head (উৎস)। উচ্চ আদর্শসকল তাদের জীবনে বা কার্য্যে পরিণত করতে দেখে এবং তাদের কাছ থেকে ঐ সকল ideas (উচ্চ ভাবসকল) নিয়েই গৃহীরা কর্ম্মক্ষেত্রে জীবনসংগ্রামে সমর্থ হয়েছে ও হচ্ছে। পবিত্র সন্ন্যাসীদের দেখেই গৃহস্থেরা পবিত্র ভাবসকল জীবনে পরিণত করছে ও ঠিক ঠিক কর্ম্মতৎপর হচ্ছে। সন্ন্যাসীরা নিজ জীবনে ঈশ্বরার্থে ও জগতের কল্যাণার্থে সর্ব্বস্বত্যাগরূপ তত্ত্ব প্রতিফলিত করে গৃহীদের সব বিষয়ে উৎসাহিত করছে, আর বিনিময়ে তারা তাদের দুমুটো অন্ন দিচ্ছে। সেই অন্ন জন্মাবার প্রবৃত্তি ও ক্ষমতাও আবার সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসিগণের স্নেহাশীর্ব্বাদেই দেশের লোকের বর্দ্ধিত হচ্ছে। না বুঝেই লোকে সন্ন্যাস institution-এর (আশ্রমের) নিন্দা করে। অন্য দেশে যাই হ'ক না কেন, এদেশে কিন্তু সন্ন্যাসীরা হাল ধরে আছে বলেই সংসার-সাগরে গৃহস্থদের নৌকা ডুবছে না।

শিষ্য। মহাশয়, লোক-কল্যাণে তৎপর যথার্থ সন্ন্যাসী কয়জন দেখতে পাওয়া যায়?

স্বামীজী। হাজার বৎসর অন্তর যদি ঠাকুরের ন্যায় একজন সন্ন্যাসী মহাপুরুষ আসেন ত ভরপুর। তিনি যে-সকল উচ্চ আদর্শ ও ভাব দিয়ে যাবেন, তা তাঁর জন্মাবার হাজার বৎসর পর অবধি লোকে নিয়ে চলবে। এই সন্ন্যাস institution (আশ্রম) দেশে ছিল বলেই ত তাঁর ন্যায় মহাপুরুষেরা এদেশে জন্মগ্রহণ করছেন। দোষ সব আশ্রমেই আছে, তবে অল্পাধিক। দোষ সত্ত্বেও এতদিন পর্য্যন্ত যে এই আশ্রম সকল আশ্রমের শীর্ষস্থান অধিকার করে দাঁড়িয়ে রয়েছে—তার কারণ কি?—যথার্থ সন্ন্যাসীরা নিজেদের মুক্তি পর্য্যন্ত উপেক্ষা করেন—জগতের ভাল করতেই তাঁদের জন্ম। এমন সন্ন্যাসাশ্রমের প্রতি যদি তোরা কৃতজ্ঞ না হস্ ত তোদের ধিক—শত ধিক্।

বলিতে বলিতে স্বামীজীর মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সন্ন্যাসাশ্রমের গৌরবপ্রসঙ্গে স্বামীজী যেন মূর্ত্তিমান সন্ন্যাসরূপে শিষ্যের চক্ষে প্রতিভাত হইতে লাগিলেন।

অনন্তর ঐ আশ্রমের গৌরব তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে করিতে যেন অন্তর্ম্মুখ হইয়া আপনা আপনি মধুর স্বরে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—

"বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তঃ
ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।
অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥"

পরে আবার বলিতে লাগিলেন—"বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় সন্ন্যাসীর জন্ম। সন্ন্যাসগ্রহণ করে যারা এই ideal (উচ্চ লক্ষ্য)

ভুলে যায়—'বৃথৈব তস্য জীবনং'। পরের জন্য প্রাণ দিতে—জীবের গগনভেদী ক্রন্দন নিবারণ করতে, বিধবার অশ্রু মুছাতে, পুত্র-বিয়োগ বিধুরার প্রাণে শান্তিদান করতে, অজ্ঞ ইতরসাধারণকে জীবন-সংগ্রামের উপযোগী করতে, শাস্ত্রোপদেশ-বিস্তারের দ্বারা সকলের ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গল করতে এবং জ্ঞানালোক দিয়ে সকলের মধ্যে প্রসুপ্ত ব্রহ্মসিংহকে জাগরিত করতে জগতে সন্ন্যাসীর জন্ম হয়েছে।" পরে নিজ ভ্রাতৃগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" আমাদের জন্ম, কি কচ্ছিস্ সব বসে বসে? ওঠ্—জাগ্—নিজে জেগে অপর সকলকে জাগ্রত কর্—নরজন্ম সার্থক করে চলে যা—"উত্তিষ্ঠত—জাগ্রত—প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

দ্বাদশ বল্লী

স্থান—কলিকাতা—৺বলরাম বাবুর বাটী

বর্ষ—১৮৯৮

গুরুগোবিন্দ শিষ্যদিগকে কিরূপে দীক্ষা দিতেন—তিনি পাঞ্জাবের সর্ব্বসাধারণের মনে তৎকালে একপ্রকারের স্বার্থচেষ্টা উদ্দীপিত করিয়া দিয়াছিলেন—সিদ্ধাই-এর অপকারিতা—স্বামীজীর জীবনে পরিদৃষ্ট দুইটি অদ্ভুত ঘটনা—শিষ্যের প্রতি উপদেশ—ভূত ভাবতে ভাবতে ভূত হয়, এবং সদা 'আমি নিত্য মুক্ত বুদ্ধ আত্মা' এইরূপ ভাবতে ভাবতে ব্রহ্মজ্ঞ হয়।

স্বামীজী আজ দুই দিন যাবৎ বাগবাজারে ৺বলরাম বসুর বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। শিষ্যের সুতরাং বিশেষ সুবিধা—প্রত্যহ তথায় যাতায়াত করে। অদ্য সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে স্বামীজী ঐ বাড়ীর ছাদে বেড়াইতেছেন। শিষ্য ও অন্য চার-পাঁচ জন লোক সঙ্গে আছে। বড় গরম পড়িয়াছে। স্বামীজীর খোলা গা। ধীরে ধীরে দক্ষিণে হাওয়া দিতেছে। বেড়াইতে বেড়াইতে স্বামীজী গুরুগোবিন্দের কথা পাড়িয়া তাঁহার ত্যাগ, তপস্যা, তিতিক্ষা ও প্রাণপাতী পরিশ্রমের ফলে শিখজাতির কিরূপে পুনরভ্যুত্থান হইয়াছিল, কিরূপে তিনি মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিতপূর্ব্ব ব্যক্তিগণকে পর্য্যন্ত দীক্ষাদান করিয়া পুনরায় হিন্দু করিয়া শিখজাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন, এবং কিরূপেই বা তিনি নর্ম্মদাতীরে মানবলীলা সংবরণ করেন—ওজস্বিনী ভাষায় তত্তদ্বিষয়ে কিছু কিছু বর্ণনা করিতে লাগিলেন। গুরুগোবিন্দের নিকট দীক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে তখন যে কি মহাশক্তি সঞ্চারিত হইত, তাহার উল্লেখ করিয়া স্বামীজী শিখজাতির মধ্যে প্রচলিত একটি দোঁহার আবৃত্তি করিয়া বলিলেন—

সওয়া লাখ পর এক চড়াউ।
যব্ গুরু গোবিন্দ্ নাম শুনাউ ॥

অর্থাৎ—গুরুগোবিন্দের নিকট নাম (দীক্ষা) শুনিয়া এক একজন ব্যক্তিতে সওয়া লক্ষ সংখ্যক ব্যক্তি অপেক্ষাও অধিক শক্তি সঞ্চারিত হইত। অর্থাৎ তাঁহার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিলে তাঁহার শক্তিতে জীবনে যথার্থ ধর্ম্মপ্রাণতা উপস্থিত হইয়া গুরু-গোবিন্দের প্রত্যেক শিষ্যের অন্তর এমন অদ্ভুত বীরত্বে পূর্ণ হইত যে, সে তখন সওয়া লক্ষ বিধর্ম্মীকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইত। ধর্ম্মমহিমাস্থচক ঐ কথাগুলি বলিতে বলিতে স্বামীজীর উৎসাহ-বিস্ফারিত নয়নে যেন তেজ ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। শ্রোতৃবৃন্দ স্তব্ধ হইয়া স্বামীজীর মুখপানে চাহিয়া উহাই দেখিতে লাগিল। কি অদ্ভুত উৎসাহ ও শক্তিই স্বামীজীর ভিতরে ছিল। যখন যে বিষয়ে কথা পাড়িতেন, তখন তাহাতে তিনি এমন তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, মনে হইত ঐ বিষয়কেই তিনি বুঝি জগতের অন্য সকল বিষয়াপেক্ষা বড় এবং তল্লাভই মনুষ্যজীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া বিবেচনা করেন।

কিছুক্ষণ পরে শিষ্য বলিল, "মহাশয়, ইহা কিন্তু বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার যে, গুরুগোবিন্দ হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই নিজ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া একই উদ্দেশ্যে চালিত করিতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ঐরূপ দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত দেখা যায় না।"

স্বামীজী। Common interest না হলে (এক প্রকারের স্বার্থচেষ্টা ভিতরে অনুভব না করলে) লোক কখনও একতাসূত্রে আবদ্ধ হয় না। সভা সমিতি লেক্‌চার করে সর্ব্বসাধারণকে কখনও

unite (এক) করা যায় না—যদি তাদের interest (স্বার্থ) না এক হয়। গুরুগোবিন্দ বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তদানীন্তন কালের কি হিন্দু কি মুসলমান—সকলেই ঘোর অত্যাচার অবিচারের রাজ্যে বাস করিতেছে। গুরুগোবিন্দ common interest create (একপ্রকারের স্বার্থচেষ্টার সৃষ্টি) করেন নাই, কেবল উহা ইতরসাধারণকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন মাত্র। তাই হিন্দু মুসলমান সবাই তাঁকে follow (অনুসরণ) করেছিল। তিনি মহাশক্তিসাধক ছিলেন। ভারতের ইতিহাসে তাঁহার ন্যায় দৃষ্টান্ত বিরল।

অনন্তর রাত্রি হইয়াছে দেখিয়া স্বামীজী সকলকে সঙ্গে লইয়া দোতলার বৈঠকখানায় নামিয়া আসিলেন। তিনি এখানে উপবেশন করিলেই সকলে তাঁহাকে আবার ঘিরিয়া বসিল। এই সময়ে miracle (সিদ্ধাই) সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা উঠিল।

স্বামীজী বলিলেন, "সিদ্ধাই বা বিভূতি-শক্তি অতি সামান্য মনঃসংযমেই লাভ করা যায়।" শিষ্যকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুই thought-reading (অপরের মনের কথা ঠিক ঠিক বলা) শিখ্‌বি? চার-পাঁচ দিনেই তোকে ঐ বিদ্যাটা শিখিয়ে দিতে পারি।"

শিষ্য। তাতে কি উপকার হবে?

স্বামীজী। কেন? পরের মনের ভাব জানতে পার্‌বি।

শিষ্য। তাতে ব্রহ্মবিদ্যালাভের কিছু সহায়তা হবে কি?

স্বামীজী। কিছুমাত্র নয়।

শিষ্য। তবে আমার ঐ বিদ্যা শিখবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু

মহাশয়, আপনি স্বয়ং সিদ্ধাই সম্বন্ধে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বা দেখিয়াছেন, তাহার বিষয় শুনিতে ইচ্ছা হয়।

। আমি একবার হিমালয়ে ভ্রমণ করতে করতে কোনও পাহাড়ী গ্রামে এক রাত্রের জন্য বাস করেছিলাম। সন্ধ্যার খানিক বাদে ঐ গাঁয়ে মাদলের খুব বাজনা শুনতে পেয়ে বাড়ীওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলুম—গ্রামের কোনও লোকের উপর 'দেবতার ভর' হয়েছে। বাড়ীওয়ালার আগ্রহাতিশয়ে এবং নিজের curiosity (কৌতূহল) চরিতার্থ করতে ব্যাপারখানা দেখতে যাওয়া গেল। গিয়ে দেখি, বহু লোকের সমাবেশ। লম্বা ঝাঁকড়া-চুলো একটা পাহাড়ীকে দেখিয়ে বললে, ইহারই উপর 'দেবতার ভর' হয়েছে। দেখলুম, তার নিকটেই একখানি কুঠার আগুনে পোড়াতে দেওয়া হয়েছে। খানিক বাদে দেখি, অগ্নিবর্ণ কুঠারখানা ঐ উপদেবতাবিষ্ট লোকটার দেহের স্থানে স্থানে লাগিয়ে ছ্যাঁকা দেওয়া হচ্ছে, চুলেও লাগান হচ্ছে! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐ কুঠারস্পর্শে তার কোনও অঙ্গ বা চুল দগ্ধ হচ্ছে না বা তার মুখে কোনও কষ্টের চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছে না! দেখে অবাক্ হয়ে গেলুম। ইতোমধ্যে গাঁয়ের মোড়ল করযোড়ে আমার কাছে এসে বলল —'মহারাজ—আপনি দয়া করে এর ভূতাবেশ ছাড়িয়ে দিন। আমি ত ভেবে অস্থির। কি করি, সকলের অনুরোধে ঐ উপদেবতাবিষ্ট লোকটার কাছে যেতে হল। গিয়েই কিন্তু অগ্রে কুঠারখানা পরীক্ষা করতে ইচ্ছা হল। যাই হাত দিয়ে ধরা, হাত পুড়ে গেল। তখন কুঠারটা তবু কালো

হয়ে গেছে। হাতের জ্বালায় ত অস্থির। থিওরী-মিওরী তখন সব লোপ পেয়ে গেল। কি করি, জ্বালায় অস্থির হয়েও ঐ লোকটার মাথায় হাত দিয়ে খানিকটা জপ করলুম। আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐরূপ করার দশ-বার মিনিটের মধ্যেই লোকটা সুস্থ হয়ে গেল। তখন গাঁয়ের লোকের আমার উপর ভক্তি দেখে কে! আমায় একটা কেষ্ট-বিষ্টু ঠাওরালে। আমি কিন্তু ব্যাপারখানা বুঝতে পারলুম না। অগত্যা বিনা বাক্যব্যয়ে আশ্রয়দাতার সঙ্গে তার কুটীরে ফিরে এলুম। তখন রাত ১২টা হবে। এসে শুয়ে পড়লুম। কিন্তু হাতের জ্বালায়, আর এই ব্যাপারের কিছুমাত্র রহস্যভেদ করতে পারলুম না বলে চিন্তায় ঘুম হল না। জ্বলন্ত কুঠারে মানুষের শরীর দগ্ধ হল না দেখে কেবলই মনে হতে লাগল, "There are more things in heaven and earth than are dreamt of in your philosophy!" (পৃথিবীতে ও স্বর্গে এমন অনেক ব্যাপার আছে, দর্শনশাস্ত্র যার স্বপ্নেও সন্ধান পায় না!)

শিষ্য। পরে ঐ বিষয়ের কোন সুমীমাংসা করিতে পারিয়াছিলেন কি?

স্বামীজী। না। আজ কথায় কথায় ঘটনাটি মনে পড়ে গেল। তাই তোদের বললুম।

অনন্তর স্বামীজী পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"ঠাকুর কিন্তু সিদ্ধাইসকলের বড় নিন্দা করতেন। বলতেন, 'ঐসকল শক্তি-প্রকাশের দিকে মন দিলে পরমার্থ-তত্ত্বে পৌঁছান যায় না।' কিন্তু

মানুষের এমনই দুর্ব্বল মন, গৃহস্থের ত কথাই নাই, সাধুদের মধ্যেও চৌদ্দ-আনা লোক সিদ্ধাইয়ের উপাসক হয়ে পড়ে। পাশ্চাত্ত্য দেশে ঐ প্রকার বুজরুকি দেখলে লোকে অবাক্ হয়ে যায়। সিদ্ধাই-লাভটা যে একটা খারাপ জিনিস, ধর্ম্মপথের অন্তরায়, এ কথা ঠাকুর কৃপা করে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন, তাই বুঝতে পেরেছি। সে জন্য দেখিস্ নি—ঠাকুরের সন্তানেরা কেউই ঐ দিকে খেয়াল রাখে না?"

স্বামী যোগানন্দ এই সময়ে স্বামীজীকে বলিলেন, "তোমার সঙ্গে মান্দ্রাজে যে একটা ভূতুরের দেখা হয়েছিল, সেই কথাটা 'বাঙ্গাল'কে বল না।"

শিষ্য ঐ বিষয় ইতঃপূর্ব্বে শুনে নাই। সুতরাং ঐ কথা বলিবার জন্য স্বামীজীকে জেদ্ করিয়া বসিল। স্বামীজী অগত্যা ঐ কথা তাহাকে এইরূপে বলিলেন—

"মান্দ্রাজে যখন মন্মথ বাবুর[১] বাড়ীতে ছিলুম, তখন একদিন স্বপ্ন দেখলুম, মা (স্বামীজীর গর্ভধারিণী) মরে গেছেন! মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল। তখন মঠেও বড় একটা চিঠিপত্র লিখতুম না—তা বাড়ীতে লেখা ত দূরের কথা। মন্মথ বাবুকে স্বপ্নের কথা বলায় তিনি তখনই ঐ বিষয়ের সংবাদের জন্য কলিকাতায় তার করলেন। কারণ স্বপ্নটা দেখে মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আবার, এদিকে মান্দ্রাজের বন্ধুগণ তখন আমায় আমেরিকায় যাবার যোগাড় করে তাড়া লাগাচ্ছিল; কিন্তু মার শারীরিক কুশল সংবাদটা না পেয়ে যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। আমার ভাব বুঝে মন্মথ বাবু বললেন যে শহরের কিছু দূরে একজন পিশাচসিদ্ধ লোক বাস

১ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য।

করে—সে জীবের শুভাশুভ ভূত-ভবিষ্যৎ, সকল খবর বলে দিতে পারে। মন্মথ বাবুর অনুরোধে ও নিজের মানসিক উদ্বেগ দূর করতে তার নিকট যেতে রাজী হলুম। মন্মথ বাবু, আমি, আলাসিঙ্গা ও আর একজন খানিকটা রেলে করে গিয়ে পরে পায়ে হেঁটে সেখানে ত গেলুম। গিয়ে দেখি শ্মশানের পাশে বিকটাকার, শুঁটকো ভূষ-কালো একটা লোক বসে আছে। তার অনুচরগণ 'কিড়িং মিড়িং' করে মান্দ্রাজি ভাষায় বুঝিয়ে দিলে, উনিই পিশাচ-সিদ্ধ পুরুষ। প্রথমটা আমাদের সে ত আমলেই আনলে না। তার পর যখন আমরা ফেরবার উদ্যোগ করছি, তখন আমাদের দাঁড়াবার জন্য অনুরোধ করলে। সঙ্গী আলাসিঙ্গাই দোভাষীর কাজ করছিল। আমাদের দাঁড়াবার কথা বললে। তার পর একটা পেন্‌সিল দিয়ে লোকটা খানিকক্ষণ ধরে কি আঁক পাড়তে লাগল। পরে দেখলুম, লোকটা concentration (মন একাগ্র) করে যেন একেবারে স্থির হয়ে পড়ল। তার পর আগে আমার নাম, গোত্র, চৌদ্দপুরুষের খবর বললে; আর বললে যে, ঠাকুর আমার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত ফিরছেন, এবং গর্ভধারিণী মার মঙ্গল-সমাচারও বললে! আর, ধর্ম্মপ্রচার করতে আমাকে যে বহুদূরে অতি শীঘ্র যেতে হবে, তাও বলে দিলে! এইরূপে মার মঙ্গলসংবাদ পেয়ে ভট্টাচার্য্যের (মন্মথনাথ) সঙ্গে শহরে ফিরে এলুম। এসে কলিকাতার তারেও মার মঙ্গলসংবাদ পেলুম।

যোগানন্দ স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী বলিলেন—"ব্যাটা কিন্তু যা যা বলেছিল, ঠিক তাই তাই হয়ে গেল; তা সেটা 'কাক-তালীয়ের' ন্যায়ই হ'ক, বা যাই হ'ক।"

স্বামী যোগানন্দ উত্তরে বলিলেন, "তুমি পূর্ব্বে এসব কিছু বিশ্বাস করতে না, তাই তোমার ঐসকল দেখবার প্রয়োজন হয়েছিল!"

স্বামীজী। আমি কি না দেখে না শুনে যা তা কতকগুলো বিশ্বাস করি? এমন ছেলেই নই। মহামায়ার রাজ্যে এসে জগৎ-ভেল্‌কির সঙ্গে সঙ্গে কত কি ভেল্‌কিই না দেখলুম! মায়া—মায়া!! রাম রাম! আজ কি ছাইভস্ম কথাই সব হল। ভূত ভাবতে ভাবতে লোকে ভূত হয়ে যায়। আর যে দিনরাত জানতে অজানতে বলে—'আমি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তাত্মা', সেই ব্রহ্মজ্ঞ হয়।

এই বলিয়া স্বামীজী স্নেহভরে শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"এইসব ছাইভস্ম কথাগুলোকে মনে কিছুমাত্র স্থান দিবি নি। কেবল সদসৎ বিচার করবি—আত্মাকে প্রত্যক্ষ করতে প্রাণপণে যত্ন করবি; আত্মজ্ঞানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। আর সবই মায়া—ভেল্‌কিবাজি! এক প্রত্যগাত্মাই অবিতথ সত্য। এ কথাটা বুঝেছি; সে জন্যই তোদের বুঝাবার চেষ্টা করছি। 'একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'।"

কথা হইতে হইতে রাত্রি ১১টা বাজিয়া গেল। অনন্তর স্বামীজী আহারান্তে বিশ্রাম করিতে উঠিলেন। শিষ্য স্বামীজীর পাদপদ্মে প্রণত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিল। স্বামীজী বলিলেন—'কাল আসবি ত?'

শিষ্য। আজ্ঞে আসিব বৈ কি? আপনাকে দিনান্তে না দেখিলে প্রাণ ব্যাকুল হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে।

স্বামীজী। তবে এখন আয়—রাত্রি হয়েছে।

অনন্তর শিষ্য স্বামীজীর কথা ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি ১২টার সময় বাসায় ফিরিয়া আসিল।

ত্রয়োদশ বল্লী

স্থান—বেলুড়—ভাড়াটিয়া মঠ-বাড়ী

বর্ষ—১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ

মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথিপূজা—স্বামীজীর ব্রাহ্মণেতর জাতীয় ভক্তগণকে যজ্ঞোপবীতপ্রদান—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের মঠে সমাদর—কর্ম্মযোগে বা পরার্থ কর্ম্মানুষ্ঠানে আত্মদর্শন অবশ্যম্ভাবী—বিস্তৃত যুক্তির সহিত স্বামীজীর ঐ বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া।

স্বামীজী যে বৎসর ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসেন সেই বৎসর দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব হয়। কিন্তু নানা কারণে পরবৎসর দক্ষিণেশ্বরে উৎসব বন্ধ হয়, এবং বেলুড়ে গঙ্গাতীরে শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাটী ভাড়া করিয়া আলমবাজার হইতে ঐ স্থানে মঠ উঠাইয়া আনা হয়। উহার কিছুদিন পরে বর্ত্তমান মঠের জমি খরিদ হইয়াছিল, তথাপি সে বৎসর জন্মোৎসব নূতন জমিতে হইতে পায় নাই। কারণ, তখনও মঠের জমি জঙ্গলে পূর্ণ ছিল এবং অনেক স্থলে সমতল ছিল না। তাই সেবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব বেলুড়ে দাঁয়েদের ঠাকুর-বাড়ীতে হয়। ঐ উৎসবের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ফাল্গুনী দ্বিতীয়া তিথিতে নীলাম্বর বাবুর বাগানেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথিপূজা হয়, এবং জন্মতিথিপূজার দুই-এক দিন পরেই শুভমুহূর্ত্তে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতি ইত্যাদি মঠের জন্য ক্রীত জমিতে লইয়া যাইয়া পূজা হোমাদি করিয়া তথায় ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। স্বামীজী তখন পূর্ব্বোক্ত নীলাম্বর বাবুর বাগানেই অবস্থান করিতেছিলেন। জন্মতিথিপূজায় সেবার বিপুল

আয়োজন। স্বামীজীর আদেশমত ঠাকুর-ঘর পরিপাটী দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ। স্বামীজী সেদিন স্বয়ং সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিয়া বেড়াইতেছিলেন।

জন্মতিথির সুপ্রভাতে সকলেই আনন্দিত। কেবল ঠাকুরের কথা ছাড়া ভক্তদের মুখে আর কোন কথাই নাই। পূজার ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া স্বামীজী এইবার পূজার আয়োজন দর্শন করিতে লাগিলেন।

পূজার তত্ত্বাবধান শেষ করিয়া স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, "পৈতে এনেছিস্ ত?"

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ। আপনার আদেশমত সব প্রস্তুত। কিন্তু এত পৈতার যোগাড় কেন, বুঝিতেছি না।

স্বামীজী। দ্বি-জাতিমাত্রেরই উপনয়ন-সংস্কারে অধিকার আছে। বেদ স্বয়ং তার প্রমাণস্থল। আজ ঠাকুরের জন্মদিনে যারা আসবে, তাদের সকলকে পৈতে পরিয়ে দেব। এরা সব ব্রাত্য (পতিতসংস্কার) হয়ে গেছে। শাস্ত্র বলে, ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করলেই আবার উপনয়ন-সংস্কারের অধিকারী হয়। আজ ঠাকুরের জন্মতিথি—সকলেই তাঁর নাম নিয়ে শুদ্ধ হবে। তাই আজ সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে পৈতে পরাতে হবে। —বুঝলি?

শিষ্য। আমি আপনার আদেশমত অনেকগুলি পৈতা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি। পূজান্তে আপনার অনুমতি অনুসারে সমাগত ভক্তগণকে ঐগুলি পরাইয়া দিব।

স্বামীজী। ব্রাহ্মণেতর ভক্তদিগকে এইরূপ গায়ত্রীমন্ত্র (এখানে শিষ্যকে ক্ষত্রিয়াদি দ্বিজাতির গায়ত্রী মন্ত্র বলিয়া দিলেন)

দিবি। ক্রমে দেশের সকলকে ব্রাহ্মণপদবীতে উঠিয়ে নিতে হবে; ঠাকুরের ভক্তদের ত কথাই নাই। হিন্দুমাত্রেই পরস্পর পরস্পরের ভাই। ছোঁব না ছোঁব না বলে এদের আমরাই হীন করে ফেলেছি। তাই দেশটা হীনতা, ভীরুতা, মূর্খতা ও কাপুরুষতার পরাকাষ্ঠায় গিয়াছে। এদের তুলতে হবে, অভয়বাণী শুনাতে হবে। বলতে হবে—'তোরাও আমাদের মত মানুষ, তোদেরও আমাদের মত সব অধিকার আছে।'—বুঝলি ?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ।

স্বামীজী। এখন যারা পৈতে নেবে, তাদের গঙ্গাস্নান করে আসতে বল্। তারপর ঠাকুরকে প্রণাম করে সবাই পৈতে পরবে।

স্বামীজীর আদেশমত সমাগত প্রায় ৪০।৫০ জন ভক্ত ক্রমে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া শিষ্যের নিকট গায়ত্রীমন্ত্র লইয়া পৈতা পরিতে লাগিল। মঠে হুলস্থুল। পৈতা পরিয়া ভক্তগণ আবার ঠাকুরকে প্রণাম করিল এবং স্বামীজীর পাদপদ্মে প্রণত হইল। তাহাদিগকে দেখিয়া স্বামীজীর মুখারবিন্দ যেন শতগুণে প্রফুল্ল হইল। ইহার কিছু পরেই শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষজ মহাশয় মঠে উপস্থিত হইলেন।

এইবার স্বামীজীর আদেশে সঙ্গীতের উদ্যোগ হইতে লাগিল, এবং মঠের সন্ন্যাসীরা আজ স্বামীজীকে মনের সাধে সাজাইতে লাগিলেন। তাঁহার কর্ণে শঙ্খের কুণ্ডল, সর্ব্বাঙ্গে কর্পূরধবল পবিত্র বিভূতি, মস্তকে আপাদলম্বিত জটাভার, বাম হস্তে ত্রিশূল,

উভয় বাহুতে রুদ্রাক্ষবলয়, গলে আজানুলম্বিত ত্রিবলীকৃত বড় রুদ্রাক্ষমালা প্রভৃতি দেওয়া হইল। ঐ সকল পরিয়া স্বামীজীর রূপের যে শোভা সম্পাদিত হইল, তাহা বলিয়া ফুরাইবার নহে! সেদিন যে-যে সেই মূর্ত্তি দেখিয়াছিল, তাহারা সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিল—সাক্ষাৎ কালভৈরব স্বামি-শরীরে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। স্বামীজীও অন্যান্য সন্ন্যাসীদিগের অঙ্গে বিভূতি মাখাইয়া দিলেন। তাঁহারা স্বামীজীর চারিদিকে মূর্ত্তিমান ভৈরব-গণের ন্যায় অবস্থান করিয়া মঠভূমিতে কৈলাসাচলের শোভা বিস্তার করিলেন, সে দৃশ্য স্মরণ করিয়াও এখন আনন্দ হয়!

এইবার স্বামীজী পশ্চিমাস্যে মুক্ত পদ্মাসনে বসিয়া "কূজন্তং রামরামেতি" স্তবটি মধুরস্বরে উচ্চারণ করিতে এবং স্তবান্তে কেবল "রাম রাম শ্রীরাম রাম" এই কথা পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অক্ষরে অক্ষরে যেন সুধা বিগলিত হইতে লাগিল। স্বামীজীর অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্র; হস্তে তানপুরায় সুর বাজিতেছে। 'রাম রাম শ্রীরাম রাম' ধ্বনি ভিন্ন মঠে কিছুক্ষণ অন্য কিছুই আর শুনা গেল না! এইরূপে প্রায় অর্দ্ধাধিক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। তখনও কাহারও মুখে অন্য কোনও কথা নাই। স্বামীজীর কণ্ঠনিঃসৃত রামনামসুধা পান করিয়া সকলেই আজ মাতোয়ারা! শিষ্য ভাবিতে লাগিল, সত্যই কি আজ স্বামীজী শিবভাবে মাতোয়ারা হইয়া রামনাম করিতেছেন! স্বামীজীর মুখের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য যেন আজ শতগুণে গভীরতা প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্র-প্রান্তে যেন প্রভাত-সূর্য্যের আভা ফুটিয়া বাহির হইতেছে এবং গভীর নেশার ঘোরে যেন সেই বিপুল দেহ

টলিয়া পড়িতেছে! সে রূপ বর্ণনা করিবার নহে, বুঝাইবার নহে; অনুভূতির বিষয়। দর্শকগণ "চিত্রার্পিতারম্ভমিবাবতস্থে!"

রামনামকীর্ত্তনান্তে স্বামীজী পূর্ব্বের ন্যায় নেশার ঘোরেই গাহিতে লাগিলেন—'সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাঈ'। বাদক ভাল ছিল না বলিয়া স্বামীজীর যেন রসভঙ্গ হইতে লাগিল। অনন্তর সারদানন্দ স্বামীকে গাহিতে অনুমতি করিয়া নিজেই পাখোয়াজ ধরিলেন। স্বামী সারদানন্দ প্রথমতঃ "একরূপ অরূপ নাম বরণ" গানটি গাহিলেন। মৃদঙ্গের স্নিগ্ধ-গম্ভীর নির্ঘোষে গঙ্গা যেন উথলিয়া উঠিল এবং স্বামী সারদানন্দের সুকণ্ঠ ও সঙ্গে সঙ্গে মধুর আলাপে গৃহ ছাইয়া ফেলিল। তৎপর শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে-সকল গান গাহিতেন, ক্রমে সেগুলি গীত হইতে লাগিল।

এইবার স্বামীজী সহসা নিজের বেশভূষা খুলিয়া গিরিশ বাবুকে সাদরে ঐ সকল পরাইয়া সাজাইতে লাগিলেন। নিজহস্তে গিরিশ বাবুর বিশাল দেহে ভস্ম মাখাইয়া কর্ণে কুণ্ডল, মস্তকে জটাভার, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ ও বাহুতে রুদ্রাক্ষবলয় দিতে লাগিলেন। গিরিশ বাবু সে সজ্জায় যেন আর এক মূর্ত্তি হইয়া দাঁড়াইলেন; দেখিয়া ভক্তগণ অবাক হইয়া গেল! অনন্তর স্বামীজী বলিলেন, "পরমহংসদেব বলতেন, 'ইনি ভৈরবের অবতার'। আমাদের সঙ্গে এঁর কোনও প্রভেদ নেই।" গিরিশ বাবু নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতারা তাঁহাকে আজ যেরূপ সাজে সাজাইতে চাহেন, তাহাতেই তিনি রাজী। অবশেষে স্বামীজীর আদেশে একখানি গেরুয়া কাপড় আনাইয়া গিরিশ বাবুকে পরান হইল। গিরিশ বাবু কোনও আপত্তি করিলেন না। গুরুভ্রাতাদের ইচ্ছায়

তিনি আজ অবাধে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছেন। এইবার স্বামীজী বলিলেন—"জি. সি.,[১] তুমি আজ আমাদের ঠাকুরের (রামকৃষ্ণ-দেবের) কথা শুনাবে ; (সকলকে লক্ষ্য করিয়া) তোরা সব স্থির হয়ে বস্।" গিরিশ বাবুর তখনও মুখে কোনও কথা নাই। যাঁহার জন্মোৎসবে আজ সকলে মিলিত হইয়াছেন, তাঁহার লীলা-দর্শনে ও তাঁহার সাক্ষাৎ পার্ষদগণের আনন্দ-দর্শনে তিনি আনন্দে জড়বৎ হইয়াছেন। অবশেষে গিরিশ বাবু বলিলেন—"দয়াময় ঠাকুরের কথা আমি আর কি বলব? কামকাঞ্চনত্যাগী তোমাদের ন্যায় বালসন্ন্যাসীদের সঙ্গে যে তিনি এ অধমকে একাসনে বসতে অধিকার দিয়েছেন এতেই তাঁর অপার করুণা অনুভব করি।" কথাগুলি বলিতে বলিতে গিরিশ বাবুর কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, তিনি অন্য কিছুই আর সেদিন বলিতে পারিলেন না।

অনন্তর স্বামীজী কয়েকটি হিন্দি গান গাহিলেন। "বৈঁইয়া না পাকাড়ো মেরা নরম কহলাইয়া" ইত্যাদি। শিষ্য সঙ্গীতবিদ্যায় একেবারে পণ্ডিত, তাই ঐসকল গানের এক বর্ণও বুঝিতে পারিল না ; কেবল স্বামীজীর মুখপানে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল। এই সময়ে প্রথম পূজা শেষ হওয়ায় ভক্তগণকে জলযোগ করিবার জন্য ডাকা হইল। জলযোগ সাঙ্গ হইবার পর স্বামীজী নীচের বৈঠকখানা-ঘরে যাইয়া বসিলেন। সমাগত ভক্তেরাও তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন। উপবীতধারী জনৈক গৃহস্থকে সম্বোধন করিয়া স্বামীজী বলিলেন—"তোরা হচ্ছিস্ দ্বিজাতি, বহুকাল থেকে ব্রাত্য হয়ে গেছ্লি। আজ থেকে আবার দ্বিজাতি হলি।

১ গিরিশ বাবুকে স্বামীজী 'জি. সি' বলিয়া ডাকিতেন।

প্রত্যহ গায়ত্রীমন্ত্র অন্ততঃ এক শত বার জপ্‌বি, বুঝলি?” গৃহস্থটি ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া স্বামীজীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন। ইতোমধ্যে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (মাষ্টার মহাশয়) উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী মাষ্টার মহাশয়কে দেখিয়া নানা সাদরসম্ভাষণে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। মহেন্দ্র বাবু প্রণাম করিয়া এক কোণে দাঁড়াইয়াছিলেন। স্বামীজী বারংবার বসিতে বলায় জড়সড় ভাবে এক কোণে উপবিষ্ট হইলেন।

স্বামীজী। মাষ্টার মহাশয়, আজ ঠাকুরের জন্মদিন। ঠাকুরের কথা আজ আমাদের কিছু শুনাতে হবে।

মাষ্টার মহাশয় মৃদুহাস্যে অবনতমস্তক হইয়া রহিলেন। ইতোমধ্যে স্বামী অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদ হইতে প্রায় দেড় মন ওজনের দুইটি পানতুয়া লইয়া মঠে উপস্থিত হইলেন। অদ্ভুত পানতুয়া দুইটি দেখিতে সকলে ছুটিলেন। অনন্তর স্বামীজী প্রভৃতিকে উহা দেখান হইলে পর স্বামীজী বলিলেন—“ঠাকুর-ঘরে নিয়ে যা।”

স্বামী অখণ্ডানন্দকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন—“দেখ্‌ছিস্ কেমন কর্ম্মবীর! ভয় মৃত্যু—এ সবের জ্ঞান নেই;—এক রোখে কর্ম্ম করে যাচ্ছে—‘বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়’।”

শিষ্য। মহাশয়, কত তপস্যার বলে উঁহাতে ঐ শক্তি আসিয়াছে!

স্বামীজী। তপস্যার ফলে শক্তি আসে। আবার পরার্থে কর্ম্ম করলেই তপস্যা করা হয়। কর্ম্মযোগীরা কর্ম্মটাকেই তপস্যার অঙ্গ বলে। তপস্যা করতে করতে যেমন পরহিতেচ্ছা বলবতী

হয়ে সাধককে কর্ম্ম করায়, তেমন আবার পরের জন্য কাজ করতে করতে পরা তপস্যার ফল চিত্তশুদ্ধি ও পরমাত্মার দর্শনলাভ হয়।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, প্রথম হইতে পরের জন্য প্রাণ দিয়া কার্য্য করিতে কয় জন পারে? মনে ঐরূপ উদারতা আসিবে কেন—যাহাতে জীব আত্মসুখেচ্ছা বলি দিয়া পরার্থে জীবন দিবে?

স্বামীজী। তপস্যাতেই বা কয় জনের মন যায়? কামকাঞ্চনের আকর্ষণে কয় জনই বা ভগবানলাভের আকাঙ্ক্ষা করে? তপস্যাও যেমন কঠিন, নিষ্কাম কর্ম্মও সেইরূপ। সুতরাং যারা পরিহিতে কার্য্য করে যায়, তাদের বিরুদ্ধে তোর কিছু বলবার অধিকার নাই। তোর তপস্যা ভাল লাগে, করে যা; আর একজনের কর্ম্ম ভাল লাগে—তাকে তোর নিষেধ করবার কি অধিকার আছে? তুই বুঝি বুঝে রেখেছিস্—কর্ম্মটা আর তপস্যা নয়?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ, পূর্ব্বে তপস্যা অর্থে আমি অন্যরূপ বুঝিতাম।

স্বামীজী। যেমন সাধন-ভজন অভ্যাস করতে করতে তাতে একটা রোক জন্মায়, তেমনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাজ করতে করতে হৃদয় ক্রমে তাইতে ডুবে যায়। ক্রমে পরার্থ কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, বুঝ্‌লি? একবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরের সেবা করে দেখ্‌না, তপস্যার ফল লাভ হয় কি না। পরার্থ কর্ম্মের ফলে মনের আঁক-বাঁক ভেঙ্গে যায় ও মানুষ ক্রমে অকপটে পরহিতে প্রাণ দিতে উন্মুখ হয়।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, পরহিতের প্রয়োজন কি?

স্বামীজী। নিজহিতের জন্য। এই দেহটা, যাতে 'আমি' অভিমান করে বসে আছিস্, এই দেহটা পরের জন্য উৎসর্গ করেছি, এ কথা ভাবতে গেলে এই আমিত্বটাকেও ভুলে যেতে হয়। অন্তিমে বিদেহ-বুদ্ধি আসে। তুই যত একাগ্রতার সহিত পরের ভাবনা ভাববি, ততটা আপনাকে ভুলে যাবি। এইরূপে কর্ম্মে যখন ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হয়ে আসবে, তখন তোরই আত্মা সর্ব্বজীবে সর্ব্বঘটে বিরাজমান, এ তত্ত্ব দেখতে পাবি। তাই পরের হিতসাধন হচ্ছে আপনার আত্মার বিকাশের একটা উপায়, একটা পথ। এও জানবি, এক প্রকারের ঈশ্বরসাধনা। এরও উদ্দেশ্য হচ্ছে—আত্মবিকাশ। জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি সাধন দ্বারা যেমন আত্মবিকাশ হয়, পরার্থে কর্ম্ম দ্বারাও ঠিক তাই হয়।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, আমি যদি দিন রাত পরের ভাবনাই ভাবিব, তবে আত্মচিন্তা করিব কখন? একটা বিশেষ ভাব লইয়া পড়িয়া থাকিলে অভাবরূপী আত্মার কিরূপে সাক্ষাৎকার হইবে?

স্বামীজী। আত্মজ্ঞানলাভই সকল সাধনার, সকল পথের মুখ্য উদ্দেশ্য। তুই যদি সেবাপর হয়ে, ঐ কর্ম্মফলে চিত্তশুদ্ধি লাভ করে, সর্ব্বজীবকে আত্মবৎ দর্শন করতে পারিস্ ত আত্মদর্শনের বাকী কি রইল? আত্মদর্শন মানে কি জড়ের মত—এই দেওয়ালটা বা কাঠখানার মত—হয়ে বসে থাকা?

শিষ্য। তাহা না হইলেও সর্ব্ব বৃত্তি ও কর্ম্মের নিরোধকেই ত শাস্ত্র আত্মার স্ব-স্বরূপাবস্থান বলিয়াছেন?

স্বামীজী। শাস্ত্রে যাকে সমাধি বলা হইয়াছে, সে অবস্থা ত আর সহজে লাভ হয় না। কদাচিৎ কারও হলেও অধিক কাল স্থায়ী হয় না। তখন সে কি নিয়ে থাকবে বল? সেজন্য শাস্ত্রোক্ত অবস্থালাভের পর সাধক ভূতে ভূতে আত্মদর্শন করে, অভিন্ন-জ্ঞানে সেবাপর হয়ে প্রারব্ধ ক্ষয় করে। এই অবস্থাটাকেই শাস্ত্রকারেরা জীবন্মুক্ত অবস্থা বলে গেছেন।

শিষ্য। তবেই ত এ কথা দাঁড়াইতেছে, মহাশয়, যে জীবন্মুক্তি-অবস্থা লাভ না করিলে ঠিক ঠিক পরার্থে কাজ করা যায় না।

স্বামীজী। শাস্ত্রে ঐ কথা বলেছে; আবার এও বলেছে যে, পরার্থে সেবাপর হতে হতে সাধকের জীবন্মুক্তি-অবস্থা ঘটে; নতুবা 'কর্ম্মযোগ' বলে একটা আলাদা পথ উপদেশ করবার শাস্ত্রে কোনই প্রয়োজন ছিল না।

শিষ্য এতক্ষণে বুঝিয়া স্থির হইল; স্বামীজীও ঐ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া কিন্নর-কণ্ঠে গান ধরিলেন—

দুখিনী ব্রাহ্মণীকোলে কে শুয়েছ আলো করে।
কে রে ওরে দিগম্বর এসেছ কুটীর-ঘরে॥
মরি মরি রূপ হেরি, নয়ন ফিরাতে নারি,
হৃদয়সন্তাপহারী সাধ ধরি হৃদিপরে॥
ভূতলে অতুল মণি, কে এলি রে যাদুমণি
তাপিতা হেরে অবনী এসেছ কি সকাতরে।
ব্যথিতে কি দিতে দেখা, গোপনে এসেছ একা,
বদনে করুণামাখা, হাস কাঁদ কার তরে॥[১]

[১] শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে নাট্যকার ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক রচিত।

গিরিশ বাবু ও ভক্তেরা সকলে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঐ গান গাহিতে লাগিলেন। "তাপিতা হেরে অবনী এসেছ কি সকাতরে" —পদটি বার বার গীত হইতে লাগিল। অতঃপর "মজল আমার মন-ভ্রমরা কালী-পদ-নীলকমলে," "অগণন ভুবনভারধারী" ইত্যাদি কয়েকটি গান হইবার পরে তিথিপূজার নিয়মানুযায়ী একটি জীবিত মৎস্য বাদ্যোদ্যমের সহিত গঙ্গায় ছাড়া হইল। তারপর মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবার জন্য ভক্তদিগের মধ্যে ধুম পড়িয়া গেল।

চতুর্দ্দশ বল্লী

স্থান—বেলুড় ভাড়াটিয়া মঠ-বাটী

বর্ষ—১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ

নূতন মঠের জমিতে ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা—আচার্য্য শঙ্করের অনুদারতা—বৌদ্ধধর্ম্মের পতন-কারণ-নির্দ্দেশ—তীর্থমাহাত্ম্য—'রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা' শ্লোকার্থ—ভাবাভাবের অতীত ঈশ্বর-স্বরূপের উপাসনা।

আজ নূতন মঠের জমিতে স্বামীজী যজ্ঞ করিয়া ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা করিবেন। শিষ্য পূর্ব্বরাত্র হইতেই মঠে আছে। ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা দর্শন করিবে—বাসনা।

প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া স্বামীজী ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর পূজকের আসনে বসিয়া পুষ্পপাত্রে যতগুলি ফুল-বিল্বপত্র ছিল, সব দুই হাতে এককালে তুলিয়া লইলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের শ্রীপাদুকায় অঞ্জলি দিয়া ধ্যানস্থ হইলেন—অপূর্ব্ব দর্শন। তাঁহার ধর্ম্মপ্রভা-বিভাসিত স্নিগ্ধোজ্জ্বল কান্তিতে ঠাকুরঘর যেন কি এক অদ্ভুত আলোকে পূর্ণ হইল! প্রেমানন্দ ও অন্যান্য স্বামিপাদগণ ঠাকুর-ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ধ্যানপূজাবসানে এইবার মঠভূমিতে যাইবার আয়োজন হইতে লাগিল। তাম্রনির্ম্মিত কৌটায় রক্ষিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভস্মাস্থি স্বামীজী স্বয়ং দক্ষিণ স্কন্ধে লইয়া অগ্রগামী হইলেন। অন্যান্য সন্ন্যাসিগণসহ শিষ্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। শঙ্খ-ঘণ্টারোলে তটভূমি মুখরিত হওয়ায় ভাগীরথী যেন ঢল ঢল হাবভাবে নৃত্য করিতে লাগিল। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে স্বামীজী শিষ্যকে

বলিলেন—"ঠাকুর আমায় বলেছিলেন, 'তুই কাঁধে করে আমায় যেখানে নিয়ে যাবি, আমি সেখানেই যাব ও থাকব—তা গাছতলাই কি, আর কুটীরই কি।' সেজন্যই আমি স্বয়ং তাঁকে কাঁধে করে নূতন মঠভূমিতে নিয়ে যাচ্ছি। নিশ্চয় জানবি, বহুকাল পর্য্যন্ত 'বহুজনহিতায়' ঠাকুর ঐ স্থানে স্থির হয়ে থাকবেন।"

শিষ্য। ঠাকুর আপনাকে কখন এই কথা বলিয়াছিলেন ?

স্বামীজী। (মঠের সাধুগণকে দেখাইয়া) ওদের মুখে শুনিস নি ? —কাশীপুরের বাগানে।

শিষ্য। ওঃ ! সেই সময়েই বুঝি ঠাকুরের গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী ভক্তদের ভিতর সেবাধিকার লইয়া দলাদলি হইয়াছিল ?

স্বামীজী। হাঁ, 'দলাদলি' ঠিক নয়, একটু মন-কষাকষি হয়েছিল। জানবি, যাঁরা ঠাকুরের ভক্ত, যাঁরা ঠিক ঠিক তাঁর কৃপালাভ করেছেন—তা গেরস্থই হন আর সন্ন্যাসীই হন—তাঁদের ভিতর দলফল নেই, থাকতেই পারে না। তবে ওরূপ একটু-আধটু মন-কষাকষির কারণ কি তা জানিস্ ? প্রত্যেক ভক্ত ঠাকুরকে আপন আপন বুদ্ধির রঙ্গে রঙ্গিয়ে এক এক জনে এক এক রকম দেখে ও বোঝে। তিনি যেন মহাসূর্য্য, আর আমরা যেন প্রত্যেকে এক এক রকম রঙ্গিন কাচ চোখে দিয়ে সেই এক সূর্য্যকে নানারংবিশিষ্ট বলে দেখছি। অবশ্য এই কথাও ঠিক যে, কালে এই থেকেই দলের সৃষ্টি হয়। তবে যারা সৌভাগ্যক্রমে অবতারপুরুষের সাক্ষাৎসম্পর্কে আসে, তাদের জীবৎকালে ঐরূপ 'দলফল' সচরাচর হয় না। সেই আত্মারাম পুরুষের আলোতে তাদের চোখ ঝল্‌সে যায়

অহঙ্কার, অভিমান, হীনবুদ্ধি সব ভেসে যায়। কাজেই 'দলফল' করবার তাদের অবসর হয় না। কেবল যে যার নিজের ভাবে তাঁকে হৃদয়ের পূজা দেয়।

শিষ্য। মহাশয়, তবে কি ঠাকুরের ভক্তেরা সকলেই তাঁহাকে ভগবান বলিয়া জানিলেও সেই এক ভগবানের স্বরূপ তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখেন ও সেইজন্যই তাঁহাদের শিষ্য-প্রশিষ্যেরা কালে এক একটি ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতরে পড়িয়া ছোট ছোট দল বা সম্প্রদায়সকল গঠন করিয়া বসে?

স্বামীজী। হাঁ, এ জন্য কালে সম্প্রদায় হবেই। এই দ্যাখ্ না, চৈতন্যদেবের এখন দু-তিন শ সম্প্রদায় হয়েছে; যীশুর হাজার হাজার মত বেরিয়েছে; কিন্তু ঐসকল সম্প্রদায়ই চৈতন্যদেব ও যীশুকেই মানছে।

শিষ্য। তবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তদিগের মধ্যেও কালে বোধ হয় বহু সম্প্রদায় দাঁড়াইবে?

স্বামীজী। হবে বই কি। তবে আমাদের এই যে মঠ হচ্ছে, তাতে সকল মতের, সকল ভাবের সামঞ্জস্য থাকবে। ঠাকুরের যেমন উদার মত ছিল, এটি ঠিক সেই ভাবের কেন্দ্রস্থান হবে; এখান থেকে যে মহাসমন্বয়ের উদ্ভিন্ন ছটা বেরুবে, তাতে জগৎ প্লাবিত হয়ে যাবে।

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতে হইতে সকলে মঠভূমিতে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী স্কন্ধস্থিত কৌটাটি জমিতে বিস্তীর্ণ আসনোপরি নামাইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। অপর সকলেও প্রণাম করিলেন।

অনন্তর স্বামীজী পুনরায় পূজায় বসিলেন। পূজান্তে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া হোম করিলেন এবং সন্ন্যাসী ভ্রাতৃগণের সহায়ে স্বহস্তে পায়সান্ন প্রস্তুত করিয়া ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন। বোধ হয়, ঐ দিন ঐ স্থানে তিনি কয়েকটি গৃহস্থকে দীক্ষাপ্রদানও করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, পূজা সমাপন করিয়া স্বামীজী সাদরে সমাগত সকলকে আহ্বান ও সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আপনারা আজ কায়মনোবাক্যে ঠাকুরের পাদপদ্মে প্রার্থনা করুন যেন মহাযুগাবতার ঠাকুর আজ থেকে বহুকাল 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' এই পুণ্যক্ষেত্রে অবস্থান করে ইহাকে সর্ব্বধর্ম্মের অপূর্ব্ব সমন্বয়-কেন্দ্র করে রাখেন।" সকলেই করযোড়ে ঐরূপ প্রার্থনা করিলেন। পূজান্তে স্বামীজী শিষ্যকে ডাকিয়া বলিলেন—"ঠাকুরের এই কৌটা ফিরিয়ে নিয়ে যাবার আমাদের (সন্ন্যাসীদের) কারও আর অধিকার নাই; কারণ আজ আমরা ঠাকুরকে এখানে বসিয়েছি। অতএব তুই-ই মাথায় করে ঠাকুরের এই কৌটা তুলে মঠে (নীলাম্বর বাবুর বাগানে) নিয়ে চল্।" শিষ্য কৌটা স্পর্শ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে দেখিয়া বলিলেন—"ভয় নাই, কর, আমার আজ্ঞা।" শিষ্য তখন আনন্দিত চিত্তে স্বামীজীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া কৌটা মাথায় তুলিয়া লইল এবং শ্রীগুরুর আজ্ঞায় ঐ কৌটার স্পর্শাধিকার লাভ করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতে করিতে চলিল। অগ্রে কৌটামস্তকে শিষ্য, পশ্চাতে স্বামীজী, তারপর অন্যান্য সকলে আসিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে স্বামীজী তাহাকে বলিলেন—"ঠাকুর আজ তোর মস্তকে উঠে তোকে আশীর্ব্বাদ করুছেন। সাবধান, আজ হতে আর

কোনও অনিত্য বিষয়ে মন দিস্ নে।" একটি ছোট সাঁকো পার হইবার পূর্ব্বে স্বামীজী শিষ্যকে পুনরায় বলিলেন—"দেখিস্, এবার খুব সাবধান, খুব সতর্কে যাবি।"

এইরূপে নির্ব্বিঘ্নে মঠে উপস্থিত হইয়া সকলেই আনন্দ করিতে লাগিলেন। স্বামীজী শিষ্যকে এখন কথা-প্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন—"ঠাকুরের ইচ্ছায় আজ তাঁর ধর্ম্মক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হল। বারো বছরের চিন্তা আমার মাথা থেকে নামল। আমার মনে এখন কি হচ্ছে, জানিস্? —এই মঠ হবে বিদ্যা ও সাধনার কেন্দ্রস্থান। তোদের মত ধার্ম্মিক গৃহস্থেরা ইহার চারদিককার জমিতে ঘরবাড়ী করে থাক্‌বে, আর মাঝখানে ত্যাগী সন্ন্যাসীরা থাক্‌বে। আর, মঠের ঐ দক্ষিণের জমিটায় ইংলণ্ড ও আমেরিকার ভক্তদের থাক্‌বার ঘর-দোর হবে। এরূপ হলে কেমন হয় বল্ দেখি?"

শিষ্য। মহাশয়, আপনার এ অদ্ভুত কল্পনা।

স্বামীজী। কল্পনা কিরে? সময়ে সব হবে। আমি ত পত্তনমাত্র করে দিচ্ছি—এর পর আরও কত কি হবে! আমি কতক করে যাব। আর তোদের ভিতর নানা idea (মতলব) দিয়ে যাব। তোরা পরে সে-সব work out (কাজে পরিণত) করবি। বড় বড় principle (মীমাংসা) কেবল শুনলে কি হবে? সেগুলিকে practical field-এ (কর্ম্মক্ষেত্রে) দাঁড় করাতে—প্রতিনিয়ত কাজে লাগাতে হবে। শাস্ত্রের লম্বা লম্বা কথাগুলি কেবল পড়লে কি হবে? শাস্ত্রের কথাগুলি আগে বুঝ্‌তে হবে। তারপর জীবনে সেগুলিকে ফলাতে হবে। বুঝ্‌লি? একেই বলে practical religion (কর্ম্মজীবনে পরিণত ধর্ম্ম)।

এইরূপে নানা প্রসঙ্গ চলিতে চলিতে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের কথা উঠিল। শিষ্য শ্রীশঙ্করের বড়ই পক্ষপাতী ছিল; এমন কি, ঐ বিষয়ে তাহাকে গোঁড়া বলিলেও বলা যাইত। শঙ্কর-প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতমতকে সে সর্ব্বদর্শনের মুকুটমণি বলিয়া জ্ঞান করিত এবং শ্রীশঙ্করের কোনও কথায় কেহ কোনরূপ দোষার্পণ করিলে তাহার হৃদয় যেন সর্পদষ্ট হইত। স্বামীজী উহা জানিতেন এবং কেহ কোনও মতের গোঁড়া হয়, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। কোন বিষয়ের গোঁড়ামি দেখিলেই তিনি উহার বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিতেন এবং অজস্র অমোঘ যুক্তির আঘাতে ঐ গোঁড়ামির সঙ্কীর্ণ বাঁধ চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিতেন।

স্বামীজী। শঙ্করের ক্ষুরধার বুদ্ধি—বিচারক বটে, পণ্ডিত বটে, কিন্তু তাঁর উদারতাটা বড় গভীর ছিল না; হৃদয়টাও ঐরূপ ছিল বলে বোধ হয়। আবার, ব্রাহ্মণ-অভিমানটুকু খুব ছিল। একটি দক্ষিণী ভট্টাচার্য্য গোছের ছিলেন আর কি! ব্রাহ্মণেতর জাতের ব্রহ্মজ্ঞান হবে না, এ কথা বেদান্তভাষ্যে কেমন সমর্থন করে গেছেন! বলিহারি বিচার! বিদুরের কথা উল্লেখ করে বলেছেন—তার পূর্ব্বজন্মের ব্রাহ্মণশরীরের ফলে সে ব্রহ্মজ্ঞ হয়েছিল। বলি, আজকাল যদি ঐরূপ কোনও শূদ্রের ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তবে কি তোর শঙ্করের মতে মত দিয়ে বল্‌তে হবে যে সে পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণ ছিল, তাই হয়েছে? ব্রাহ্মণত্বের এত টানাটানিতে কাজ কিরে বাবা? বেদ ত ত্রৈবর্ণিকমাত্রকেই বেদপাঠ ও ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী করেছে। অতএব শঙ্করের ঐ বিষয় নিয়ে বেদের উপর এই

অদ্ভুত বিদ্যাপ্রকাশের কোনও প্রয়োজন ছিল না। আবার এমনি হৃদয় যে কত বৌদ্ধ শ্রমণকে আগুনে পুড়িয়ে মারলেন— তাদের তর্কে হারিয়ে! আহাম্মক বৌদ্ধগুলোও কি না তর্কে হার মেনে আগুনে পুড়ে মরতে গেল! শঙ্করের ঐরূপ কার্য্যকে fanaticism (সঙ্কীর্ণ গোঁড়ামির উত্তেজনাপ্রসূত পাগলামি) ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? কিন্তু দেখ্ বুদ্ধদেবের হৃদয়! 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' কা কথা, সামান্য একটা ছাগশিশুর জীবনরক্ষার জন্য নিজজীবন দান করতে সর্ব্বদা প্রস্তুত! দেখ্ দেখি কি উদারতা—কি দয়া!

শিষ্য। বুদ্ধের ঐ ভাবটাকেও কি মহাশয়, অন্য কোন প্রকারের পাগলামি বলা যাইতে পারে না? একটা পশুর জন্য কি না নিজের গলা দিতে গেলেন!

স্বামীজী। কিন্তু তাঁর ঐ fanaticism-এ জগতের জীবের কত কল্যাণ হল—তা দেখ্; কত আশ্রম, স্কুল, কত কলেজ, কত public hospital (সাধারণের জন্য হাসপাতাল), কত পশুশালার স্থাপন, কত স্থাপত্যবিদ্যার বিকাশ হল, তা ভেবে দেখ্! বুদ্ধদেব জন্মাবার আগে এ দেশে ছিল কি?— তালপাতার পুঁথিতে বাঁধা কতকগুলা ধর্ম্মতত্ত্ব—তা-ও অল্প কয়েকজনের জানা ছিল মাত্র। ভগবান বুদ্ধদেব সেগুলি practical field-এ আনলেন, লোকের দৈনন্দিন জীবনে সেগুলো কেমন করে কাজে লাগাতে হবে, তা দেখিয়ে দিলেন। ধরতে গেলে তিনিই যথার্থ বেদান্তের স্ফুরণমূর্ত্তি!

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ভাঙ্গিয়া দিয়া ভারতে হিন্দু-

ধর্ম্মের বিপ্লব তিনিই ঘটাইয়া গিয়াছেন এবং সেই জন্যই তৎ-প্রচারিত ধর্ম্ম ভারত হইতে কালে নির্ব্বাসিত হইয়াছে, এ কথা সত্য বলিয়া বোধ হয়।

স্বামীজী। বৌদ্ধধর্ম্মের ঐরূপ দুর্দ্দশা তাঁর teaching-এর (শিক্ষার) দোষে হয় নাই, তাঁর follower-দের (চেলাদের) দোষেই হয়েছিল; বেশী philosophic হয়ে (দর্শনচর্চ্চা করে) তাদের heart-এর (হৃদয়ের) উদারতা কমে গেল। তারপর ক্রমে বামাচারের ব্যভিচার ঢুকে বৌদ্ধধর্ম্ম মরে গেল। অমন বীভৎস বামাচার এখনকার কোনও তন্ত্রে নাই! বৌদ্ধধর্ম্মের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল 'জগন্নাথক্ষেত্র'—সেখানে মন্দিরের গায়ে খোদা বীভৎস মূর্ত্তিগুলি একবার গিয়ে দেখে এলেই ঐ কথা জানতে পার্‌বি। রামানুজ ও চৈতন্য মহাপ্রভুর সময় থেকে পুরুষোত্তমক্ষেত্রটা বৈষ্ণবদের দখলে এসেছে। এখন উহা ঐসকল মহাপুরুষদের শক্তিসহায়ে অন্য এক মূর্ত্তি ধারণ করেছে।

শিষ্য। মহাশয়, শাস্ত্রমুখে তীর্থাদি-স্থানের বিশেষ মহিমা অবগত হওয়া যায়, উহার কতটা সত্য?

স্বামীজী। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যখন নিত্য আত্মা ঈশ্বরের বিরাট শরীর, তখন স্থানমাহাত্ম্য থাকাটার বিচিত্রতা কি আছে? স্থান-বিশেষে তাঁর বিশেষ প্রকাশ কোথাও স্বতঃ এবং কোথাও শুদ্ধসত্ত্ব মানবমনের ব্যাকুলাগ্রহে হয়ে থাকে। সাধারণ মানব ঐসকল স্থানে জিজ্ঞাসু হয়ে গেলে সহজে ফল পায়। এই জন্য তীর্থাদি আশ্রয় করে কালে আত্মার বিকাশ হতে পারে।

তবে স্থির জানবি, এই মানবদেহের চেয়ে আর কোনও প্রধান তীর্থ নাই। এখানে আত্মার যেমন বিকাশ এমন আর কোথাও নাই। ঐ যে জগন্নাথের রথ তা-ও এই দেহরথের concrete form (স্থূল রূপ) মাত্র। এই দেহরথে আত্মাকে দর্শন করতে হবে। পড়েছিস্ না—"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি" ইত্যাদি, "মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে"—এই বামনরূপী আত্মদর্শনই ঠিক জগন্নাথদর্শন। ঐ যে বলে, "রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে"—এর মানে হচ্ছে, তোর ভিতরে যে আত্মা আছেন, যাঁকে উপেক্ষা করে তুই কিম্ভূত-কিমাকার এই দেহরূপ জড়পিণ্ডটাকে সর্ব্বদা 'আমি' বলে ধরে নিচ্ছিস্, তাঁকে দর্শন করতে পারলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। যদি কাঠের দোলায় ঠাকুর দেখে জীবের মুক্তি হত, তা হলে বছরে বছরে কোটী জীবের মুক্তি হয়ে যেত—আজকাল আবার রেলে যাওয়ার যে সুযোগ! তবে ৺জগন্নাথের সম্বন্ধে সাধারণ ভক্তদিগের বিশ্বাসকেও আমি 'কিছু নয় বা মিথ্যা' বলছি না। এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা ঐ মূর্ত্তি-অবলম্বনে উচ্চ হতে ক্রমে উচ্চতর তত্ত্বে উঠে যায়, অতএব ঐ মূর্ত্তিকে আশ্রয় করে শ্রীভগবানের বিশেষ শক্তি যে প্রকাশিত রয়েছে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

শিষ্য। তবে কি মহাশয়, মূর্খ ও বুদ্ধিমানের ধর্ম্ম আলাদা?

স্বামীজী। তাই ত, নইলে তোর শাস্ত্রেই বা এত অধিকার-নির্দ্দেশের হাঙ্গামা কেন? সবই **truth**, তবে **relative truth different in degrees.** মানুষ যা কিছু সত্য বলে

জানে, সে-সকলই ঐরূপ ; কোনটি অল্প সত্য, কোনটি তার চেয়ে অধিক সত্য ; নিত্য সত্য কেবল একমাত্র ভগবান। এই আত্মা জড়ের ভিতর একেবারে ঘুমুচ্ছেন, জীবনামধারী মানুষের ভিতর তিনিই আবার কিঞ্চিৎ conscious (জাগরিত) হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্করাদিতে আবার ঐ আত্মাই superconscious stage-এ—অর্থাৎ পূর্ণভাবে জাগরিত হয়ে দাঁড়িয়েছেন। এর উপরেও অবস্থা আছে, যা ভাবে বা ভাষায় বলা যায় না—'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্'।

শিষ্য। মহাশয়, কোনও কোনও ভক্তসম্প্রদায় বলে, ভগবানের সহিত একটা ভাব বা সম্বন্ধ পাতাইয়া সাধনা করিতে হইবে। আত্মার মহিমাদির কথা তাহারা কিছুই বোঝে না, শুনিলেও বলে—'ঐ সকল কথা ছাড়িয়া সর্ব্বদা ভাবে থাক।'

স্বামীজী। তারা যা বলে, তা তাদের পক্ষে সত্য। ঐরূপ করতে করতে তাদের ভিতরও একদিন ব্রহ্ম জেগে উঠবেন। আমরা (সন্ন্যাসীরা) যা করছি, তা-ও আর এক রকম ভাব। আমরা সংসার ত্যাগ করেছি, অতএব সাংসারিক সম্বন্ধে মা, বাপ, স্ত্রী, পুত্র ইত্যাদির মত কোনও একটা ভাব ভগবানে আরোপ করে সাধনা করা—আমাদের ভাব কেমন করে হবে? ওসব আমাদের কাছে সঙ্কীর্ণ বলে মনে হয়। অবশ্য, সর্ব্ব-ভাবাতীত শ্রীভগবানের উপাসনা বড় কঠিন। কিন্তু অমৃত পাই না বলে কি বিষ খেতে যাব? এই আত্মার কথা সর্ব্বদা বলবি, শুনবি, বিচার করবি। ঐরূপ করতে করতে কালে দেখবি—তোর ভিতরেও সিঙ্গি (ব্রহ্ম) জেগে উঠবেন। ঐ

সব ভাব-খেয়ালের পারে চলে যা। এই শোন্, কঠোপনিষদে যম কি বলেছেন—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

এইরূপে এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত হইল। মঠে প্রসাদ পাইবার ঘণ্টা বাজিল। স্বামি-সমভিব্যাহারে শিষ্যও প্রসাদ গ্রহণ করিতে চলিল।

পঞ্চদশ বল্লী

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠ-বাটী

বর্ষ—১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ, ফেব্রুয়ারী মাস

স্বামীজীর বাল্য ও যৌবনের কয়েকটি কথা ও দর্শন—আমেরিকায় প্রকাশিত বিভূতির কথা—ভিতরে বক্তৃতার রাশি কে যেন ঠেলিয়া দিতেছে, এইরূপ অনুভূতি—আমেরিকায় স্ত্রী-পুরুষের গুণাগুণ—পাদরীদের ঈর্ষ্যাপ্রসূত অত্যাচার—চালাকি করিয়া জগতে মহৎ কাজ করা যায় না—ঈশ্বর-নির্ভর—নাগ মহাশয় সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

বেলুড়ে শ্রীযুক্ত নীলাম্বর বাবুর বাগানে স্বামীজী মঠ উঠাইয়া আনিয়াছেন। আলমবাজার হইতে এখানে উঠিয়া আসা হইলেও জিনিসপত্র এখনও সব গুছান হয় নাই। ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে। স্বামীজী নূতন বাড়ীতে আসিয়া খুব খুশি হইয়াছেন। শিষ্য উপস্থিত হইলে বলিলেন, "দেখ্ দেখি কেমন গঙ্গা—কেমন বাড়ী! এমন স্থানে মঠ না হলে কি ভাল লাগে?" তখন অপরাহ্ণ।

সন্ধ্যার পর শিষ্য স্বামীজীর সহিত দোতলার ঘরে সাক্ষাৎ করিলে নানা প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। ঘরে আর কেহই নাই; শিষ্য মধ্যে মধ্যে উঠিয়া স্বামীজীকে তামাক সাজিয়া দিতে লাগিল এবং নানা প্রশ্ন করিতে করিতে অবশেষে কথায় কথায় স্বামীজীর বাল্যকালের বিষয় জানিতে চাহিল। স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, "অল্প বয়স থেকেই আমি ডানপিটে ছিলুম, নৈলে কি নিঃসম্বলে দুনিয়া ঘুরে আসতে পারতুম রে?"

ছেলেবেলায় তাঁর রামায়ণগান শুনিবার বড় ঝোঁক ছিল। পাড়ার নিকট যেখানে রামায়ণগান হইত, স্বামীজী খেলাধুলা

ছাড়িয়া তথায় উপস্থিত হইতেন। বলিতেন—রামায়ণ শুনিতে শুনিতে এক একদিন তন্ময় হইয়া তিনি বাড়ীঘর ভুলিয়া যাইতেন এবং 'রাত হইয়াছে' বা 'বাড়ী যাইতে হইবে' ইত্যাদি কোনও বিষয়ে খেয়াল থাকিত না। একদিন রামায়ণ-গানে শুনিলেন—হনুমান কলাবাগানে থাকে। অমনি এমন বিশ্বাস হইল যে, সে রাত্রি রামায়ণ-গান শুনিয়া ঘরে আর না ফিরিয়া বাড়ীর নিকটে কোন এক বাগানে কলাগাছতলায় অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত হনুমানের দর্শন-আকাঙ্ক্ষায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

হনুমানের প্রতি স্বামীজীর অগাধ ভক্তি ছিল। সন্ন্যাসী হইবার পরেও মধ্যে মধ্যে মহাবীরের কথাপ্রসঙ্গে মাতোয়ারা হইয়া উঠিতেন এবং অনেক সময় মঠে শ্রীমহাবীরের একটি প্রস্তরমূর্ত্তি রাখিবার সঙ্কল্প করিতেন।

পাঠ্যাবস্থায় দিনের বেলায় তিনি সমবয়স্কদিগের সহিত কেবল আমোদপ্রমোদ করিয়াই বেড়াইতেন। রাত্রে ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া পড়াশুনা করিতেন। কখন যে তিনি পড়াশুনা করিতেন, তাহা কেহ জানিতে পারিত না।

* * *

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিতেছে—"মহাশয়, স্কুলে পড়িবার কালে আপনি কখন কোনরূপ vision দেখিতেন কি?"

স্বামীজী। স্কুলে পড়বার সময় একদিন রাত্রে দোর বন্ধ করে ধ্যান করতে করতে মন বেশ তন্ময় হয়েছিল। কতক্ষণ ঐ ভাবে ধ্যান করছিলাম, বলতে পারি না। ধ্যান শেষ হল—তখনও বসে আছি, এমন সময় ঐ ঘরের দক্ষিণ দেওয়াল ভেদ করে

এক জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি বাহির হয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। তাঁর মুখে এক অদ্ভুত জ্যোতিঃ, অথচ যেন কোনও ভাব নাই। মহাশান্ত সন্ন্যাসিমূর্ত্তি। মুণ্ডিতমস্তক, হস্তে দণ্ড ও কমণ্ডলু। আমার প্রতি একদৃষ্টে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। যেন আমায় কিছু বলবেন, এরূপ ভাব। আমিও অবাক হয়ে তাঁর পানে চেয়ে ছিলাম। তারপর মনে কেমন একটা ভয় এল—তাড়াতাড়ি দোর খুলে ঘরের বাইরে গেলাম। তারপর মনে হল, কেন এমন নির্ব্বোধের মত ভয়ে পালালুম, হয় ত তিনি কিছু বলতেন। আর কিন্তু সে মূর্ত্তির কখনও দেখা পাই নি। কতদিন মনে হয়েছে যদি তাঁর ফের দেখা পাই ত এবার আর ভয় করব না—তাঁর সঙ্গে কথা কইব। কিন্তু আর দেখা পাই নি।

শিষ্য। তারপর এ বিষয় কিছু ভেবেছিলেন কি ?

স্বামীজী। ভেবেছিলাম, কিন্তু ভেবে চিন্তে কিছু কূল-কিনারা পাই নি। এখন বোধ হয় ভগবান বুদ্ধদেবকে দেখেছিলুম।

কিছুক্ষণ বাদে স্বামীজী বলিলেন, "মন শুদ্ধ হলে, কাম-কাঞ্চনে বীতস্পৃহ হলে কত vision (দিব্যদর্শন) দেখা যায়—অদ্ভুত অদ্ভুত ! তবে ওতে খেয়াল রাখতে নেই। ঐসকলে দিনরাত মন থাকলে সাধক আর অগ্রসর হতে পারে না। শুনিস্ নি, ঠাকুর বলতেন—'কত মণি পড়ে আছে (আমার) চিন্তামণির নাচদুয়ারে !' আত্মাকে সাক্ষাৎকার করতে হবে—ওসব খেয়ালে মন দিয়ে কি হবে ?"

কথাগুলি বলিয়াই স্বামীজী তন্ময় হইয়া কোনও বিষয় ভাবিতে ভাবিতে কিছুক্ষণ মৌনভাবে অবস্থান করিলেন। পরে আবার বলিতে লাগিলেন—"দেখ্, আমেরিকায় অবস্থানকালে আমার

কতকগুলি অদ্ভুত শক্তির স্ফুরণ হয়েছিল। লোকের চোখের ভেতর দেখে তার মনের ভেতরটা সব বুঝতে পারতুম—মুহূর্ত্তের মধ্যে। কে কি ভাবছে না ভাবছে 'করামলকবৎ' প্রত্যক্ষ হয়ে যেত। কারুকে কারুকে বলে দিতুম। যাদের যাদের বলতুম, তাদের মধ্যে অনেকে আমার চেলা হয়ে যেত; আর যারা কোনরূপ মতলব পাকিয়ে আমার সঙ্গে মিশতে আস্‌ত, তারা ঐ শক্তির পরিচয় পেয়ে আর আমার দিকেও মাড়াত না।

"যখন চিকাগো প্রভৃতি শহরে বক্তৃতা শুরু করলুম, তখন সপ্তাহে ১২।১৪টা, কখনও আরও বেশী লেক্‌চার দিতে হত; অত্যধিক শারীরিক ও মানসিক শ্রমে মহাক্লান্ত হয়ে পড়লুম। যেন বক্তৃতার বিষয় সব ফুরিয়ে যেতে লাগল। ভাবতুম—কি করি, কাল আবার কোথা থেকে কি নূতন কথা বলব? নূতন ভাব আর যেন জুটত না। একদিন বক্তৃতার পরে শুয়ে শুয়ে ভাবছি—তাই ত, এখন কি উপায় করা যায়? ভাবতে ভাবতে একটু তন্দ্রার মত এল। সেই অবস্থায় শুনতে পেলুম, কে যেন আমার পাশে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা কচ্ছে; কত নূতন ভাব, নূতন কথা—সে-সব যেন ইহজন্মে শুনি নি, ভাবিও নি! ঘুম থেকে উঠে সেগুলি স্মরণ করে রাখলুম, আর বক্তৃতায় তাই বললুম। এমন যে কতদিন ঘটেছে তার সংখ্যা নেই। শুয়ে শুয়ে এমন বক্তৃতা কতদিন শুনেছি! কখনও বা এত জোরে জোরে বক্তৃতা হত যে, অন্য ঘরের লোক আওয়াজ পেত ও পরদিন আমায় বলত—'স্বামীজী, কাল অত রাত্রে আপনি কার সঙ্গে এত জোরে কথা কচ্ছিলেন?' আমি তাদের সে কথা কোনরূপে কাটিয়ে দিতুম। সে এক অদ্ভুত কাণ্ড!"

শিষ্য স্বামীজীর কথা শুনিয়া নির্ব্বাক হইয়া ভাবিতে ভাবিতে বলিল—"মহাশয়, তবে বোধ হয় আপনিই সূক্ষ্মদেহে ঐরূপে বক্তৃতা করিতেন এবং স্থূলদেহে কখনও কখনও তার প্রতিধ্বনি বাহির হইত।"

শুনিয়া স্বামীজী বলিলেন—"তা হবে।"

অনন্তর আমেরিকার কথা উঠিল। স্বামীজী বলিলেন, "সে দেশের পুরুষের চেয়ে মেয়েরা অধিক শিক্ষিতা। বিজ্ঞান-দর্শনে তারা সব মহা পণ্ডিত; তাই তারা আমায় অত খাতির করত। পুরুষগুলো দিনরাত খাটছে, বিশ্রামের সময় নেই; মেয়েরা স্কুলে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করে মহাবিদুষী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকায় যে দিকে চাইবি, কেবলই মেয়েদের রাজত্ব।"

শিষ্য। আচ্ছা মহাশয়, গোঁড়া ক্রিশ্চিয়ানেরা সেখানে আপনার বিপক্ষ হয় নাই?

স্বামীজী। হয়েছিল বই কি। আবার যখন লোকে আমায় খাতির করতে লাগল, তখন পাদরীরা আমার পেছনে খুব লাগল। আমার নামে কত কুৎসা কাগজে লিখে রটনা করেছিল। কত লোক আমায় তার প্রতিবাদ করতে বলত। আমি কিন্তু কিছু গ্রাহ্য করতুম না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—চালাকি দ্বারা জগতে কোনও মহৎ কার্য্য হয় না; তাই ঐসকল অশ্লীল কুৎসায় কর্ণপাত না করে ধীরে ধীরে আপনার কাজ করে যেতুম। দেখতেও পেতুম, অনেক সময়ে যারা আমায় অযথা গালমন্দ করত, তারাও অনুতপ্ত হয়ে আমার শরণ নিত এবং নিজেরাই কাগজে contradict (প্রতিবাদ) করে ক্ষমা চাইত। কখনও

কখনও এমনও হয়েছে—আমায় কোনও বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেছে দেখে কেহ আমার নামে ঐসকল মিথ্যা কুৎসা বাড়ী-ওয়ালাকে শুনিয়ে দিয়েছে। তাই শুনে সে দোর বন্ধ করে কোথায় চলে গেছে। আমি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে দেখি—সব ভোঁ ভোঁ—কেউ নেই। আবার কিছুদিন পরে তারাই সত্য কথা জানতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে আমার চেলা হতে এসেছে। কি জানিস্ বাবা, সংসার সবই দুনিয়া-দারি! ঠিক সৎসাহসী ও জ্ঞানী কি এসব দুনিয়াদারিতে ভোলে রে বাপ! জগৎ যা ইচ্ছে বলুক, আমার কর্ত্তব্য কার্য্য করে চলে যাব—এই জানবি বীরের কাজ। নতুবা এ কি বলছে, ও কি লিখছে, ও-সব নিয়ে দিনরাত থাকলে জগতে কোনও মহৎ কার্য্য করা যায় না। এই শ্লোকটা জানিস্ না?—

> "নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তুবন্তু
> লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টম্।
> অদ্যৈব মরণমস্তু শতাব্দান্তরে বা
> ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ॥"

—লোকে তোর স্তুতিই করুক বা নিন্দাই করুক, তোর প্রতি লক্ষ্মীর কৃপা হোক বা না হোক, আজ বা যুগান্তে তোর দেহপাত হোক, যেন ন্যায় পথ থেকে ভ্রষ্ট হোস্ নি। কত বড় তুফান এড়িয়ে গেলে তবে শান্তির রাজ্যে পৌছান যায়! যে যত বড় হয়েছে, তার উপর তত কঠিন পরীক্ষা হয়েছে। পরীক্ষার কষ্টিপাথরে তার জীবন ঘষেমেজে দেখে তবে তাকে জগৎ বড় বলে স্বীকার করেছে। যারা ভীরু, কাপুরুষ তারাই সমুদ্রের

তরঙ্গ দেখে তীরে নৌকা ডুবায়। মহাবীর কি কিছুতে দৃক্‌পাত করে রে? যা হবার হোক গে, আমার ইষ্টলাভ আগে করবই করব—এই হচ্ছে পুরুষকার। এ পুরুষকার না থাকলে শত দৈবেও তোর জড়ত্ব দূর করতে পারে না।

শিষ্য। তবে দৈবে নির্ভরতা কি দুর্ব্বলতার চিহ্ন?

স্বামীজী। শাস্ত্র নির্ভরতাকে পঞ্চম পুরুষার্থ বলে নির্দ্দেশ করেছে। কিন্তু আমাদের দেশে লোকে যেভাবে দৈব দৈব করে, ওটা মৃত্যুর চিহ্ন—মহাকাপুরুষতার পরিণাম; কিম্ভূতকিমাকার একটা ঈশ্বর কল্পনা করে তার ঘাড়ে নিজের দোষ-চাপানোর চেষ্টামাত্র। ঠাকুরের সেই গোহত্যাপাপের গল্প শুনেছিস্ ত? সেই গোহত্যাপাপে শেষে বাগানের মালিককেই ভুগে মরতে হল। আজকাল সকলেই 'যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি' বলে পাপ-পুণ্য দুই-ই ঈশ্বরের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। নিজে যেন পদ্মপত্রের জল! সর্ব্বদা এ ভাবে থাকতে পারলে সে ত মুক্ত! কিন্তু ভালর বেলা 'আমি', আর মন্দের সময় 'তুমি'—বলিহারি তাদের দৈবে নির্ভরতায়! পূর্ণ প্রেম বা জ্ঞান না হলে নির্ভরের অবস্থা হতেই পারে না। যার ঠিক ঠিক নির্ভর হয়েছে, তার ভালমন্দ-ভেদবুদ্ধি থাকে না—ঐ অবস্থার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের ভিতর (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যদের ভিতর) ইদানীং নাগ মহাশয়।

বলিতে বলিতে নাগ মহাশয়ের প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। স্বামীজী বলিলেন, "অমন অনুরাগী ভক্ত কি আর দুটি দেখা যায়? আহা, তাঁর সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে!"

শিষ্য। তিনি শীঘ্রই কলিকাতায় আপনাকে দর্শন করিতে আসিবেন বলিয়া মা-ঠাকৃরুণ (নাগ মহাশয়ের পত্নী) আমায় চিঠি লিখিয়াছেন।

স্বামীজী। ঠাকুর তাঁকে জনক রাজার সহিত তুলনা করতেন। অমন জিতেন্দ্রিয় পুরুষের দর্শন দূরে থাক, কথা শুনাও যায় না। তাঁর সঙ্গ খুব করবি। তিনি ঠাকুরের একজন অন্তরঙ্গ।

শিষ্য। মহাশয়, ওদেশে অনেকে তাঁহাকে পাগল বলে। আমি কিন্তু প্রথম দিন দেখা হইতেই তাঁহাকে মহাপুরুষ মনে করিয়াছিলাম। তিনি আমায় বড় ভালবাসেন ও কৃপা করেন।

স্বামীজী। অমন মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করেছিস, তবে আর ভাবনা কিসের? বহু জন্মের তপস্যা থাকলে তবে ওসব মহাপুরুষের সঙ্গলাভ হয়। নাগ মহাশয় বাড়ীতে কিরূপ থাকেন?

শিষ্য। মহাশয়, কাজকর্ম্ম ত কিছুই দেখি না। কেবল অতিথি-সেবা লইয়াই আছেন; পাল বাবুরা যে কয়েকটি টাকা দেন তদ্ভিন্ন গ্রাসাচ্ছাদনের অন্য সম্বল নাই; কিন্তু খরচপত্র একটা বড়লোকের বাড়ীতে যেমন হয় তেমনি! কিন্তু নিজের ভোগের জন্য সিকি পয়সাও ব্যয় নাই—অতটা ব্যয় সবই কেবল পরসেবার্থ। সেবা—সেবা—ইহাই তাঁহার জীবনের মহাব্রত বলিয়া মনে হয়। মনে হয়, যেন ভূতে ভূতে আত্মদর্শন করিয়া তিনি অভিন্ন-জ্ঞানে জগতের সেবা করিতে ব্যস্ত আছেন। সেবার জন্য নিজের জীবনটাকে শরীর বলিয়া জ্ঞান করেন না—যেন বেহুঁশ। বাস্তবিক শরীর-জ্ঞান তাঁহার আছে কি না,

সে বিষয়ে আমার সন্দেহ হয়। আপনি যে অবস্থাকে super-conscious (জ্ঞানাতীত) বলেন, আমার বোধ হয় তিনি সর্ব্বদা সেই অবস্থায় অবস্থান করেন।

স্বামীজী। তা না হবে কেন? ঠাকুর তাঁকে কত ভালবাসতেন! তোদের বাঙ্গাল দেশে এবার ঠাকুরের ঐ একটি সঙ্গী এসেছেন। তাঁর আলোতে পূর্ব্ববঙ্গ আলোকিত হয়ে আছে।

ষোড়শ বল্লী

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠবাটী

বর্ষ—১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ, নভেম্বর মাস

কাশ্মীরে ৺অমরনাথ-দর্শন—৺ক্ষীরভবানীর মন্দিরে দেবীর বাণী-শ্রবণ ও মন হইতে সকল সংকল্পত্যাগ—প্রেতযোনির অস্তিত্ব—ভূতপ্রেত দেখিবার বাসনা মনোমধ্যে রাখা অনুচিত—স্বামীজীর প্রেতদর্শন এবং শ্রাদ্ধ ও সংকল্প দ্বারা তাহাকে উদ্ধার করা।

স্বামীজী আজ দুই-তিন দিন হইল কাশ্মীর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। শরীর তেমন ভাল নাই। শিষ্য মঠে আসিলেই স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "কাশ্মীর হতে ফিরে আসা অবধি স্বামীজী কারও সঙ্গে কোন কথাবার্ত্তা কন্ না, স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন। তুই স্বামীজীর কাছে গল্পসল্প করে স্বামীজীর মনটা নীচে আনতে চেষ্টা করিস্।"

শিষ্য উপরে স্বামীজীর ঘরে যাইয়া দেখিল—স্বামীজী মুক্ত-পদ্মাসনে পূর্ব্বাস্য হইয়া বসিয়া আছেন, যেন গভীর ধ্যানে মগ্ন, মুখে হাসি নাই, প্রদীপ্ত নয়নে বহির্মুখী দৃষ্টি নাই, যেন ভিতরে কিছু দেখিতেছেন। শিষ্যকে দেখিবামাত্র বলিলেন, "এসেছিস্ বাবা, বোস্।"—এই পর্য্যন্ত। স্বামীজীর বামনেত্রাভ্যন্তরটা রক্তবর্ণ দেখিয়া শিষ্য জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার চোখের ভিতরটা লাল হইয়াছে কেন?" স্বামীজী "ও কিছু না" বলিয়া পুনরায় স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ বসিয়াও যখন স্বামীজী কোন কথা কহিলেন না, তখন শিষ্য অধীর হইয়া স্বামীজীর পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া বলিল, "৺অমরনাথে যাহা যাহা প্রত্যক্ষ করিলেন তাহা

সে বিষয়ে আমার সন্দেহ হয়। আপনি যে অবস্থাকে super-conscious (জ্ঞানাতীত) বলেন, আমার বোধ হয় তিনি সর্ব্বদা সেই অবস্থায় অবস্থান করেন।

স্বামীজী। তা না হবে কেন? ঠাকুর তাঁকে কত ভালবাসতেন! তোদের বাঙ্গাল দেশে এবার ঠাকুরের ঐ একটি সঙ্গী এসেছেন। তাঁর আলোতে পূর্ব্ববঙ্গ আলোকিত হয়ে আছে।

ষোড়শ বল্লী

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠবাটী

বর্ষ—১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ, নভেম্বর মাস

কাশ্মীরে ৺অমরনাথ-দর্শন—৺ক্ষীরভবানীর মন্দিরে দেবীর বাণী-শ্রবণ ও মন হইতে সকল সংকল্পত্যাগ—প্রেতযোনির অস্তিত্ব—ভূতপ্রেত দেখিবার বাসনা মনোমধ্যে রাখা অনুচিত—স্বামীজীর প্রেতদর্শন এবং শ্রাদ্ধ ও সংকল্প দ্বারা তাহাকে উদ্ধার করা।

স্বামীজী আজ দুই-তিন দিন হইল কাশ্মীর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। শরীর তেমন ভাল নাই। শিষ্য মঠে আসিলেই স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "কাশ্মীর হতে ফিরে আসা অবধি স্বামীজী কারও সঙ্গে কোন কথাবার্ত্তা কন্ না, স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন। তুই স্বামীজীর কাছে গল্পসল্প করে স্বামীজীর মনটা নীচে আনতে চেষ্টা করিস্।"

শিষ্য উপরে স্বামীজীর ঘরে যাইয়া দেখিল—স্বামীজী মুক্ত-পদ্মাসনে পূর্ব্বাস্য হইয়া বসিয়া আছেন, যেন গভীর ধ্যানে মগ্ন, মুখে হাসি নাই, প্রদীপ্ত নয়নে বহির্ম্মুখী দৃষ্টি নাই, যেন ভিতরে কিছু দেখিতেছেন। শিষ্যকে দেখিবামাত্র বলিলেন, "এসেছিস্ বাবা, বোস্।"—এই পর্য্যন্ত। স্বামীজীর বামনেত্রাভ্যন্তরটা রক্তবর্ণ দেখিয়া শিষ্য জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার চোখের ভিতরটা লাল হইয়াছে কেন?" স্বামীজী "ও কিছু না" বলিয়া পুনরায় স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ বসিয়াও যখন স্বামীজী কোন কথা কহিলেন না, তখন শিষ্য অধীর হইয়া স্বামীজীর পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া বলিল, "৺অমরনাথে যাহা যাহা প্রত্যক্ষ করিলেন তাহা

আমাকে বলিবেন না?" পাদস্পর্শে স্বামীজীর যেন একটু চমক ভাঙ্গিল, যেন একটু বহির্দৃষ্টি আসিল। বলিলেন, "অমরনাথ-দর্শনের পর হতে আমার মাথায় চব্বিশ ঘণ্টা যেন শিব বসে আছেন, কিছুতেই নাবছেন না।" শিষ্য শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিল।

স্বামীজী। ৺অমরনাথ ও পরে ৺ক্ষীরভবানীর মন্দিরে খুব তপস্যা করেছিলাম। যা, তামাক সেজে নিয়ে আয়।

শিষ্য প্রফুল্লমনে স্বামীজীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তামাক সাজিয়া দিল। স্বামীজী আস্তে আস্তে ধূমপান করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "অমরনাথ যাবার কালে পাহাড়ের একটা খাড়া চড়াই ভেঙ্গে উঠেছিলুম। সে রাস্তায় যাত্রীরা কেউ যায় না, পাহাড়ী লোকেরাই যাওয়া-আসা করে। আমার কেমন রোক হল, ঐ পথেই যাব। যাব ত যাবই। সেই পরিশ্রমে শরীর একটু দমে গেছে। ওখানে এমন কন্‌কনে শীত যে, গায়ে যেন ছুঁচ ফোটে।"

শিষ্য। শুনেছি, উলঙ্গ হয়ে ৺অমরনাথকে দর্শন করিতে হয়, কথাটা কি সত্য?

স্বামীজী। হাঁ; আমিও কৌপীনমাত্র পরে ভস্ম মেখে গুহায় প্রবেশ করেছিলুম; তখন শীত-গ্রীষ্ম কিছুই জানতে পারি নি। কিন্তু মন্দির থেকে বেরিয়ে ঠাণ্ডায় যেন জড় হয়ে গিয়েছিলাম।

শিষ্য। পায়রা দেখিয়াছিলেন কি? শুনিয়াছি সেখানে ঠাণ্ডায় কোন জীবজন্তুকে বাস করিতে দেখা যায় না, কেবল কোথা হইতে এক ঝাঁক শ্বেত পারাবত মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকে।

স্বামীজী। হাঁ, ৩।৪ টা সাদা পায়রা দেখেছিলুম। তারা গুহায় থাকে কি নিকটবর্ত্তী পাহাড়ে থাকে, তা বুঝতে পারলুম না।

শিষ্য। মহাশয়, লোকে বলে শুনিয়াছি, গুহা হইতে বাহিরে আসিয়া যদি সাদা পায়রা দেখে, তবে বুঝা যায় সত্যসত্য শিবদর্শন হইল।

স্বামীজী বলিলেন, "শুনেছি পায়রা দেখলে যা কামনা করা যায়, তাই সিদ্ধ হয়।"

অনন্তর স্বামীজী বলিলেন, আসিবার কালে তিনি সকল যাত্রী যে রাস্তায় ফেরে, সেই রাস্তা দিয়াই শ্রীনগরে আসিয়াছিলেন। শ্রীনগরে ফিরিবার অল্পদিন পরেই ৺ক্ষীরভবানী দেবীকে দর্শন করিতে যান এবং সাত দিন তথায় অবস্থান করিয়া ক্ষীর দিয়া দেবীর উদ্দেশ্যে পূজা ও হোম করিয়াছিলেন। প্রতিদিন ১৵০ মণ দুধের ক্ষীর ভোগ দিতেন ও হোম করিতেন। একদিন পূজা করিতে করিতে স্বামীজীর মনে উঠিয়াছিল, "মা ভবানী এখানে সত্যসত্যই কত কাল ধরিয়া প্রকাশিত রহিয়াছেন! যবনেরা আসিয়া তাঁহার মন্দির পুরাকালে ধ্বংস করিয়া যাইল, অথচ এখানকার লোকগুলো কিছুই করিল না। হায়, আমি যদি তখন থাকিতাম, তবে কখনও উহা চুপ করিয়া দেখিতে পারিতাম না"—ঐরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মন যখন দুঃখে ক্ষোভে নিতান্ত পীড়িত, তখন স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন, মা বলিতেছেন, "আমার ইচ্ছাতেই যবনেরা মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, আমার ইচ্ছা আমি জীর্ণ মন্দিরে অবস্থান করিব। ইচ্ছা করিলে আমি কি এখনি এখানে সপ্ততল সোনার মন্দির তুলিতে পারি না? তুই কি করিতে পারিস্? তোকে আমি রক্ষা

করিব, না তুই আমাকে রক্ষা করিবি?" স্বামীজী বলিলেন, "ঐ দৈববাণী শুনা অবধি আমি আর কোন সঙ্কল্প রাখি না। মঠ-ফঠ করবার সঙ্কল্প ত্যাগ করেছি; মায়ের যা ইচ্ছা তাই হবে।" শিষ্য অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিল, ইনিই না একদিন বলিয়াছিলেন, "যা কিছু দেখিস্ শুনিস্ তা তোর ভিতরে অবস্থিত আত্মার প্রতি-ধ্বনিমাত্র। বাইরে কিছুই নাই।"—স্পষ্ট বলিয়াও ফেলিল, "মহাশয়, আপনি ত বলিতেন এইসকল দৈববাণী আমাদের ভিতরের ভাবের বাহ্য প্রতিধ্বনি মাত্র।" স্বামীজী গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "তা ভিতরেরই হোক আর বাইরেরই হোক, তুই যদি নিজের কানে আমার মত ঐরূপ অশরীরী কথা শুনিস্, তা হলে কি মিথ্যা বলতে পারিস্? দৈববাণী সত্যসত্যই শোনা যায়; ঠিক যেমন এই আমাদের কথাবার্ত্তা হচ্ছে—তেমনি!"

শিষ্য আর দ্বিরুক্তি না করিয়া স্বামীজীর বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া লইল; কারণ স্বামীজীর কথায় এমন এক অদ্ভুত শক্তি ছিল যে, তাহা না মানিয়া থাকা যাইত না—যুক্তিতর্ক যেন কোথায় ভাসিয়া যাইত!

শিষ্য এইবার প্রেতাত্মাদের কথা পাড়িল। বলিল, "মহাশয়, এই যে ভূতপ্রেতাদি যোনির কথা শুনা যায়, শাস্ত্রেও যাহার ভূয়োভূয়ঃ সমর্থন দৃষ্ট হয়, সে-সকল কি সত্যসত্য আছে?"

স্বামীজী। সত্য বই কি। তুই যা না দেখিস, তা কি আর সত্য নয়? তোর দৃষ্টির বাইরে কত অযুতাযুত ব্রহ্মাণ্ড দূরদূরান্তরে ঘুরছে। তুই দেখতে পাস্ না বলে তাদের কি আর অস্তিত্ব নেই? তবে ঐসব ভুতুড়ে কাণ্ডে মন দিস্ নে,

ভাব্‌বি ভূত-প্রেত আছে ত আছে। তোর কার্য্য হচ্ছে—এই শরীরমধ্যে যে আত্মা আছেন, তাঁকে প্রত্যক্ষ করা। তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারলে ভূতপ্রেত তোর দাসের দাস হয়ে যাবে।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, মনে হয় উহাদের দেখিতে পাইলে পুনর্জন্মাদি-বিশ্বাস খুব দৃঢ় হয় এবং পরলোকে আর অবিশ্বাস থাকে না।

স্বামীজী। তোরা ত মহাবীর; তোরা আবার ভূতপ্রেত দেখে পরলোকে কি দৃঢ় বিশ্বাস করবি? এত শাস্ত্র, science (বিজ্ঞান) পড়লি—এই বিরাট বিশ্বের কত গূঢ়তত্ত্ব জানলি—এতেও কি আত্মজ্ঞানলাভ ভূতপ্রেত দেখে করতে হবে? ছিঃ ছিঃ!

শিষ্য। আচ্ছা মহাশয়, আপনি স্বয়ং ভূতপ্রেত কখন দেখিয়াছেন কি?

স্বামীজী বলিলেন, তাঁহার সংসারসম্পর্কীয় কোন ব্যক্তি প্রেত হইয়া তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে দেখা দিত। কখন কখন দূর দূরের সংবাদসকলও আনিয়া দিত। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন তাহার কথা সকল সময়ে সত্য হইত না। পরে কোন এক তীর্থ-বিশেষে যাইয়া "সে মুক্ত হয়ে যাক্"—এইরূপ প্রার্থনা করা অবধি তিনি আর তাহার দেখা পান নাই।

শিষ্য এইবার শ্রাদ্ধাদি দ্বারা প্রেতাত্মার তৃপ্তি হয় কি না প্রশ্ন করিলে স্বামীজী কহিলেন, "উহা কিছু অসম্ভব নয়।" শিষ্য ঐ বিষয়ের যুক্তিপ্রমাণ চাহিলে স্বামীজী কহিলেন, "তোকে একদিন

ঐ প্রসঙ্গ ভালরূপে বুঝিয়ে দেব। শ্রাদ্ধাদি দ্বারা যে প্রেতাত্মার তৃপ্তি হয়, এ বিষয়ে অকাট্য যুক্তি আছে। আজ আমার শরীর ভাল নয়, অন্য একদিন উহা বুঝিয়ে দেব।" শিষ্য কিন্তু এ জীবনে স্বামীজীর কাছে আর ঐ প্রশ্ন করিবার অবকাশ পায় নাই।

সপ্তদশ বল্লী

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠবাটী

বর্ষ—১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ, নভেম্বর মাস

স্বামীজীর সংস্কৃতরচনা—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আগমনে ভাব ও ভাষায় প্রাণসঞ্চার—ভাষাতে ওজস্বিতা কি ভাবে আনিতে হইবে—ভয় ত্যাগ করিতে হইবে—ভয় হইতেই দুর্ব্বলতা ও পাপের প্রসার—সকল অবস্থায় অবিচল থাকা—শাস্ত্রপাঠের উপকারিতা—স্বামীজীর অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি-পাঠ—জ্ঞানের উদয়ে কোন বিষয়কেই আর অদ্ভুত মনে হয় না।

বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর বাগানে এখনও মঠ রহিয়াছে। অগ্রহায়ণ মাসের শেষ ভাগ। স্বামীজী এই সময় সংস্কৃত শাস্ত্রাদির বহুধা আলোচনায় তৎপর। 'আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ঃ'[১] ইত্যাদি শ্লোক দুইটি তিনি এই সময়েই রচনা করেন। আজ স্বামীজী 'ওঁ হ্রীং ঋতং'[২] ইত্যাদি স্তবটি রচনা করিয়া শিষ্যের হাতে দিয়া বলিলেন, "দেখিস্, এতে কিছু ছন্দপতনাদি দোষ আছে কি না।" শিষ্য স্বীকার করিয়া উহার একখানি নকল করিয়া লইল।

১ 'বীরবাণী' পুস্তক দ্রষ্টব্য।

২ এই ঘটনার চার-পাঁচ দিন পরে স্বামীজী একদিন শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করেন, "সে স্তবটার কোনরূপ সংশোধন-দরকার দেখলি কি?" তদুত্তরে শিষ্য বলে যে, সে তখনও উহা ভাল করিয়া পড়িয়া দেখে নাই। পরে ঐ স্তবের মূল কপি মঠে অনেক খুঁজিয়াও পাওয়া না যাওয়ায় 'ওঁ হ্রীং ঋতং' স্তবটি লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। শিষ্যের নিকটে যে কপিখানি ছিল, তাহাই স্বামীজীর স্বস্বরূপ-সম্বরণের প্রায় চারি বৎসর পর শিষ্যের পুরাতন কাগজ খুঁজিতে খুঁজিতে পাওয়া যায় এবং ঐ সময়েই উহা 'উদ্বোধনে' প্রথম ছাপা হয়।

স্বামীজী যে দিন ঐ স্তবটি রচনা করেন, সে দিন স্বামীজীর জিহ্বায় যেন সরস্বতী আরূঢ়া হইয়াছিলেন। শিষ্যের সহিত অনর্গল সুললিত সংস্কৃত ভাষায় প্রায় দু ঘণ্টা কাল আলাপ করিয়াছিলেন। এমন সুললিত বাক্যবিন্যাস শিষ্য মহা মহা পণ্ডিতের মুখেও কখন শুনে নাই।

সে যাহা হউক, শিষ্য স্তবটি নকল করিয়া লইবার পর স্বামীজী তাহাকে বলিলেন, "দেখ্, ভাবে তন্ময় হয়ে লিখতে লিখতে সময়ে সময়ে আমার ব্যাকরণগত স্খলন হয়; তাই তোদের বলি দেখে শুনে দিতে।"

শিষ্য। মহাশয়, ওসব স্খলন নয়—উহা আর্ষ প্রয়োগ।

স্বামীজী। তুই ত বললি; কিন্তু লোকে তা বুঝবে কেন? এই সেদিন 'হিন্দুধর্ম্ম কি?' বলে একটা বাঙ্গালায় লিখলুম—তা তোদের ভেতরই কেউ কেউ বলছে, কটমট বাঙ্গালা হয়েছে। আমার মনে হয়, সকল জিনিসের ন্যায় ভাষা এবং ভাবও কালে একঘেয়ে হয়ে যায়। এদেশে এখন ঐরূপ হয়েছে বলে বোধ হয়। ঠাকুরের আগমনে ভাব ও ভাষায় আবার নূতন স্রোত এসেছে। এখন সব নূতন ছাঁচে গড়তে হবে। নূতন প্রতিভার ছাপ দিয়ে সকল বিষয় প্রচার করতে হবে। এই দেখ্ না—আগেকার কালের সন্ন্যাসীদের চালচলন ভেঙ্গে গিয়ে এখন কেমন এক নূতন ছাঁচ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। সমাজ এর বিরুদ্ধে বিস্তর প্রতিবাদও করচে। কিন্তু তাতে কিছু হচ্ছে কি?—না, আমরাই তাতে ভয় পাচ্ছি! এখন এসব সন্ন্যাসীদের দূরদূরান্তরে প্রচারকার্য্যে যেতে হবে—ছাইমাখা, অর্দ্ধ-উলঙ্গ

প্রাচীন সন্ন্যাসীদের বেশভূষায় গেলে প্রথম ত জাহাজেই নেবে না; ঐরূপ বেশে কোনরূপে ওদেশে পঁহুছিলেও তাকে কারাগারে অবস্থান করতে হবে। দেশ, সভ্যতা ও সময়োপযোগী করে সকল বিষয়ই কিছু কিছু change (পরিবর্ত্তন) করে নিতে হয়। এর পর বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধ লিখব মনে করছি। সাহিত্যসেবিগণ হয়ত তা দেখে গালমন্দ করবে। করুক—তবু বাঙ্গালা ভাষাটাকে নূতন ছাঁচে গড়তে চেষ্টা করব। এখনকার বাঙ্গালা-লেখকেরা লিখতে গেলেই বেশী verbs (ক্রিয়াপদ) use (ব্যবহার) করে; তাতে ভাষায় জোর হয় না। বিশেষণ দিয়ে verb-এর ভাব প্রকাশ করতে পারলে ভাষার বেশী জোর হয়—এখন থেকে ঐরূপে লিখতে চেষ্টা কর্ দিকি। 'উদ্বোধনে' ঐরূপ ভাষায় প্রবন্ধ লিখতে চেষ্টা করবি। ভাষার ভিতর verbগুলি ব্যবহারের মানে কি জানিস্?—ঐরূপে ভাবের pause বা বিরাম দেওয়া; সেজন্য ভাষায় অধিক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করাটা ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলার মত দুর্ব্বলতার চিহ্নমাত্র। ঐরূপ করলে মনে হয় যেন ভাষার দম নেই। সেজন্যই বাঙ্গালা ভাষায় ভাল lecture (বক্তৃতা) করা যায় না। ভাষার উপর যার control (দখল) আছে, সে অত শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর ভাব থামিয়ে ফেলে না। তোদের ডালভাত খেয়ে শরীর যেমন ভেতো হয়ে গেছে, ভাষাও ঠিক সেইরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে; আহার, চালচলন, ভাব-ভাষাতে তেজস্বিতা আনতে হবে, সব দিকে প্রাণের বিস্তার করতে হবে—সব ধমনীতে রক্তপ্রবাহ

প্রেরণ করতে হবে, যাতে সকল বিষয়েই একটা প্রাণস্পন্দন অনুভব হয়। তবেই এই ঘোর জীবনসংগ্রামে দেশের লোক survive করতে (বাঁচতে) পারবে। নতুবা অদূরে মৃত্যুর ছায়াতে অচিরে এদেশ ও জাতিটা মিশে যাবে।

শিষ্য। মহাশয়, অনেক কাল হইতে এদেশের লোকের ধাতু এক রকম হইয়া গিয়াছে ; উহার পরিবর্ত্তন করা কি শীঘ্র সম্ভব ?

স্বামীজী। তুই যদি পুরান চালটা খারাপ বুঝে থাকিস্ ত যেমন বললুম নূতন ভাবে চলতে শেখ্ না। তোর দেখাদেখি আরো দশজনে তাই করবে; তাদের দেখে আরো ৫০ জনে শিখবে—এইরূপে কালে সমস্ত জাতটার ভিতর ঐ নূতন ভাব জেগে উঠবে। আর বুঝেও যদি তুই সেরূপ কাজ না করিস্ তবে জানবি তোরা কেবল কথায় পণ্ডিত—practically (কাজের বেলায়) মূর্খ।

শিষ্য। আপনার কথা শুনিলে মহা সাহসের সঞ্চার হয়—উৎসাহ, বল ও তেজে হৃদয় ভরিয়া যায়।

স্বামীজী। হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে বল আনতে হবে। একটা 'মানুষ' যদি তৈরী হয়, ত লাখ বক্তৃতার ফল হবে। মন মুখ এক করে idea (ভাব)-গুলি জীবনে ফলাতে হবে। এর নামই ঠাকুর বলতেন 'ভাবের ঘরে চুরি না থাকা।' সব দিকে practical হতে (কর্ম্মের ভিতর দিয়ে মতের বা ভাবের বিকাশ দেখাতে) হবে। Theoryতে theoryতে (মতে মতে) দেশটা উচ্ছন্ন হয়ে গেল। যে ঠিক ঠিক ঠাকুরের সন্তান হবে, সে ধর্ম্মভাবসকলের practicality (কাজে পরিণত

করবার উপায়) দেখাবে, লোকের বা সমাজের কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে আপন মনে কাজ করে যাবে। তুলসীদাসের দোঁহায় আছে শুনিস্ নি—

হাতী চলে বাজারমে কুত্তা ভুকে হাজার।
সাধুন্‌কো দুর্ভাব নেহি যব্ নিন্দে সংসার॥

এই ভাবে চলতে হবে। লোককে জানতে হবে পোক্। তাদের ভালমন্দ কথায় কান দিলে জীবনে কোন মহৎ কাজ করতে পারা যায় না। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—শরীরে, মনে বল না থাকলে এই আত্মা লাভ করা যায় না। পুষ্টিকর উত্তম আহারে আগে শরীর গড়তে হবে, তবে ত মনে বল হবে। মনটা শরীরেরই সূক্ষ্মাংশ। মনে মুখে খুব জোর করবি। "আমি হীন, আমি হীন" বলতে বলতে মানুষ হীন হয়ে যায়; শাস্ত্রকার তাই বলেছেন—

মুক্তাভিমানী মুক্তো হি বদ্ধো বদ্ধাভিমান্যপি।
কিম্বদন্তীতি সত্যেয়ং যা মতিঃ সা গতির্ভবেৎ॥

—যার 'মুক্ত'-অভিমান সর্ব্বদা জাগরূক সেই মুক্ত হয়ে যায়, যে ভাবে 'আমি বদ্ধ', জানবি জন্মে জন্মে তার বন্ধনদশা। ঐহিক পারমার্থিক উভয় পক্ষে ঐ কথা সত্য জানবি। ইহজীবনে যারা সর্ব্বদা হতাশচিত্ত, তাদের দ্বারা কোন কাজ হতে পারে না; তারা জন্ম জন্ম হা হুতাশ করতে করতে আসে ও যায়। 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'—বীরই বসুন্ধরা ভোগ করে, একথা ধ্রুব সত্য। বীর হ—সর্ব্বদা বল্ 'অভীঃ' 'অভীঃ'। সকলকে শোনা 'মাভৈঃ' 'মাভৈঃ'—ভয়ই মৃত্যু, ভয়ই পাপ, ভয়ই

নরক, ভয়ই অধর্ম্ম, ভয়ই ব্যভিচার। জগতে যত কিছু negative thoughts (অসৎ বা মিথ্যা ভাব) আছে, সে-সকলই এই ভয়রূপ সয়তান থেকে বেরিয়েছে। এই ভয়ই সূর্য্যের সূর্য্যত্ব, ভয়ই বায়ুর বায়ুত্ব, ভয়ই যমের যমত্ব যথাস্থানে রেখেছে—নিজের নিজের গণ্ডির বাহিরে কাউকে যেতে দিচ্ছে না। তাই শ্রুতি বলছেন, "ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥" যেদিন ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ ভয়শূন্য হবেন—সব ব্রহ্মে মিশে যাবেন; সৃষ্টিরূপ অধ্যাসের লয় সাধিত হবে। তাই বলি—'অভীঃ, অভীঃ'।

বলিতে বলিতে স্বামীজীর সেই নীলোৎপল নয়নপ্রান্ত যেন অরুণরাগে রঞ্জিত হইয়াছে। যেন 'অভীঃ' মূর্ত্তিমান হইয়া স্বামিরূপে শিষ্যের সম্মুখে সশরীরে অবস্থান করিতেছেন। শিষ্য সেই অভয়মূর্ত্তি দর্শন করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল—আশ্চর্য্য, এই মহাপুরুষের কাছে থাকিলে এবং কথা শুনিলে মৃত্যুভয়ও যেন কোথায় পলায়ন করে!

স্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেন, "এই দেহধারণ করে কত সুখে দুঃখে—কত সম্পদ-বিপদের তরঙ্গে আলোড়িত হবি। কিন্তু জানবি, ও সব মুহূর্ত্তকালস্থায়ী। ঐ সকলকে গ্রাহ্যের ভেতর আনবি নি, 'আমি অজর অমর চিন্ময় আত্মা'—এই ভাব হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে জীবন অতিবাহিত করতে হবে। 'আমার জন্ম নেই, আমার মৃত্যু নেই, আমি নির্লেপ আত্মা'—এই ধারণায় একেবারে তন্ময় হয়ে যা। একবার তন্ময় হয়ে যেতে পারলে দুঃখ-কষ্টের সময় আপনা আপনি ঐ ভাব মনে উঠে পড়বে—চেষ্টা করে

আর আনতে হবে না। এই যে সেদিন বৈদ্যনাথ দেওঘরে প্রিয় মুখুয্যের বাড়ী গিয়েছিলুম,[১] সেখানে এমন হাঁপ ধরল যে প্রাণ যায়। ভিতর থেকে কিন্তু শ্বাসে শ্বাসে গভীর ধ্বনি উঠতে লাগল—'সোঽহং সোঽহং'; বালিশে ভর করে প্রাণবায়ু বেরোবার অপেক্ষা করছিলুম আর দেখছিলুম—ভেতর থেকে কেবল শব্দ হচ্ছে 'সোঽহং সোঽহং'—কেবল শুনতে লাগলুম 'একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন!'

শিষ্য স্তম্ভিত হইয়া বলিল, "মহাশয়, আপনার সঙ্গে কথা কহিলে, আপনার অনুভূতিসকল শুনিলে শাস্ত্রপাঠের আর প্রয়োজন হয় না।"

স্বামীজী। না রে! শাস্ত্রও পড়তে হয়। জ্ঞানলাভের জন্য শাস্ত্র-পাঠ একান্ত প্রয়োজন। আমি মঠে শীঘ্রই class (ক্লাস) খুলচি। বেদ, উপনিষদ্, গীতা, ভাগবত পড়া হবে। অষ্টাধ্যায়ী পড়াব।

শিষ্য। আপনি কি অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি পড়িয়াছেন?

স্বামীজী। যখন জয়পুরে ছিলুম, তখন এক মহাবৈয়াকরণের সঙ্গে দেখা হয়। তাঁর কাছে ব্যাকরণ পড়তে ইচ্ছা হল। ব্যাকরণে মহাপণ্ডিত হলেও তাঁর অধ্যাপনার তত ক্ষমতা ছিল না। আমাকে প্রথম সূত্রের ভাষ্য তিন দিন ধরে বোঝালেন, তবুও আমি তার কিছুমাত্র ধারণা করতে পারলুম না। চার দিনের দিন অধ্যাপক বিরক্ত হয়ে বললেন, "স্বামীজী! তিন দিনেও

---

১ স্বামীজী এক সময় বায়ুপরিবর্তনের জন্য বৈদ্যনাথে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী গিয়াছিলেন।

আপনাকে প্রথম সূত্রের মর্ম বুঝাতে পারলুম না! আমাদ্বারা আপনার অধ্যাপনায় কোন ফল হবে না বোধ হয়।" ঐ কথা শুনে মনে তীব্র ভর্ৎসনা এল। খুব দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে প্রথম সূত্রের ভাষ্য নিজে নিজে পড়তে লাগলুম। তিন ঘণ্টার মধ্যে ঐ সূত্র-ভাষ্যের অর্থ যেন 'করামলকবৎ' প্রত্যক্ষ হয়ে গেল, তারপর অধ্যাপকের কাছে গিয়ে সমস্ত ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য কথায় কথায় বুঝিয়ে বললুম। অধ্যাপক শুনে বললেন, "আমি তিন দিন বুঝিয়ে যা করতে পারলুম না, আপনি তিন ঘণ্টায় তার এরূপ চমৎকার ব্যাখ্যা কিরূপে উদ্ধার করলেন?" তারপর প্রতিদিন জোয়ারের জলের মত অধ্যায়ের পর অধ্যায় পড়ে যেতে লাগলুম। মনের একাগ্রতা থাকলে সব সিদ্ধ হয়—সুমেরু চূর্ণ করতে পারা যায়।

শিষ্য। মহাশয়, আপনার সবই অদ্ভুত!

স্বামীজী। অদ্ভুত বলে বিশেষ একটা কিছুই নেই। অজ্ঞানতাই অন্ধকার। তাতেই সব ঢেকে রেখে অদ্ভুত দেখায়। জ্ঞানালোকে সব উদ্ভিন্ন হলে কিছুরই আর অদ্ভুতত্ব থাকে না। এমন যে অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মায়া, তাও লুকিয়ে যায়! যাঁকে জানলে সব জানা যায়, তাঁকে জান্—তাঁর কথা ভাব্—সে আত্মা প্রত্যক্ষ হলে শাস্ত্রার্থ 'করামলকবৎ' প্রত্যক্ষ হবে। পুরাতন ঋষিগণের হয়েছিল আর আমাদের হবে না? আমরাও মানুষ। একবার একজনের জীবনে যা হয়েছে, চেষ্টা করলে তা অবশ্যই পুনরায় অপরের জীবনেও সিদ্ধ হবে। History repeats itself—যা একবার ঘটেছে, তাই বার বার ঘটে। এই আত্মা

সর্ব্বভূতে সমান। কেবল প্রতি ভূতে তাঁর বিকাশের তারতম্য আছে মাত্র। এই আত্মাকে বিকাশ করবার চেষ্টা কর্। দেখবি বুদ্ধি সব বিষয়ে প্রবেশ করবে। অনাত্মজ্ঞ পুরুষের বুদ্ধি এক-দেশদর্শিনী। আত্মজ্ঞ পুরুষের বুদ্ধি সর্ব্বগ্রাসিনী। আত্মার প্রকাশ হলে দেখবি দর্শন বিজ্ঞান সব আয়ত্ত হয়ে যাবে। সিংহ-গর্জ্জনে আত্মার মহিমা ঘোষণা কর্, জীবকে অভয় দিয়ে বল্—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"—Arise ! awake ! and stop not till the goal is reached.

অষ্টাদশ বল্লী

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠবাটী

বর্ষ—১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ

স্বামীজীর নির্ব্বিকল্প সমাধির কথা—ঐ সমাধি হইতে কাহারা পুনরায় সংসারে ফিরিয়া আসিতে সক্ষম—অবতারপুরুষদিগের অদ্ভুত শক্তির কথা ও তদ্বিষয়ে যুক্তি-প্রমাণ—শিষ্যের স্বামীজীকে পূজা।

শিষ্য আজ দুদিন হইল বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর বাগানবাটীতে স্বামীজীর কাছে রহিয়াছে। কলিকাতা হইতে অনেক যুবক এ সময় স্বামীজীর কাছে যাতায়াত করায় মঠে যেন আজকাল চির-উৎসব। কত ধর্ম্মচর্চ্চা—কত সাধনভজনের উদ্যম—কত দীন-দুঃখমোচনের উপায় আলোচিত হইতেছে! সন্ন্যাসী মহারাজগণ সকলেই মহা উৎসাহী—মহাদেবের গণরূপে স্বামীজীর আজ্ঞাপালনে উন্মুখ হইয়া অবস্থান করিতেছেন। স্বামী প্রেমানন্দ ঠাকুরসেবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। মঠে পূজা ও প্রসাদের বিপুল আয়োজন—সমাগত ভদ্রলোকদের জন্য সর্ব্বদা প্রসাদ প্রস্তুত।

আজ স্বামীজী শিষ্যকে তাঁহার কক্ষে রাত্রে থাকিবার অনুমতি দিয়াছেন। স্বামীজীর সেবাধিকার পাইয়া শিষ্যের হৃদয়ে আজ আর আনন্দ ধরে না! প্রসাদগ্রহণান্তে সে স্বামীজীর পদসেবা করিতেছে, এমন সময় স্বামীজী বলিলেন, "এমন জায়গা ছেড়ে তুই কি না কলকাতায় যেতে চাস্—এখানে কেমন পবিত্র ভাব, কেমন গঙ্গার হাওয়া, কেমন সব সাধুর সমাগম! এমন স্থান কি আর কোথাও খুঁজে পাবি?"

শিষ্য। মহাশয়, বহু জন্মান্তরের তপস্যায় আপনার সঙ্গলাভ হইয়াছে। এখন যাহাতে আর না মায়ামোহের মধ্যে পড়ি কৃপা করিয়া তাহা করিয়া দেন। এখন প্রত্যক্ষ অনুভূতির জন্য মন মাঝে মাঝে বড় ব্যাকুল হয়।

স্বামীজী। আমারও অমন কত হয়েছে। কাশীপুরের বাগানে একদিন ঠাকুরের কাছে খুব ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা জানিয়েছিলুম। তারপর সন্ধ্যার সময় ধ্যান করতে করতে নিজের দেহ খুঁজে পেলুম না। দেহটা একেবারে নেই মনে হয়েছিল। চন্দ্র, সূর্য্য, দেশ, কাল, আকাশ সব যেন একাকার হয়ে কোথায় মিলিয়ে গিয়েছিল, দেহাদি-বুদ্ধির প্রায় অভাব হয়েছিল, প্রায় লীন হয়ে গেছ্‌লুম আর কি! একটু 'অহং' ছিল, তাই সে সমাধি থেকে ফিরেছিলুম। ঐরূপ সমাধিকালেই 'আমি' আর 'ব্রহ্মের' ভেদ চলে যায়—সব এক হয়ে যায়—যেন মহাসমুদ্র—জল, জল, আর কিছুই নেই—ভাব আর ভাষা সব ফুরিয়ে যায়। "অবাঙ্‌মনসোগোচরম্‌" কথাটা ঐ সময়েই ঠিক ঠিক উপলব্ধি হয়। নতুবা 'আমি ব্রহ্ম' একথা সাধক যখন ভাবছে বা বলছে তখনও 'আমি' ও 'ব্রহ্ম' এই দুই পদার্থ পৃথক্‌ থাকে—দ্বৈতভান থাকে। তারপর ঐরূপ অবস্থালাভের জন্য বারম্বার চেষ্টা করেও আনতে পারলুম না। ঠাকুরকে জানাতে বললেন—"দিবারাত্র ঐ অবস্থাতে থাকলে মা-র কাজ হবে না; সেজন্য এখন আর ঐ অবস্থা আনতে পারবি না, কাজ করা শেষ হলে পর আবার ঐ অবস্থা আসবে।"

শিষ্য। নিঃশেষ সমাধি বা ঠিক ঠিক নির্ব্বিকল্প সমাধি হইলে তবে কি কেহই আর পুনরায় 'অহং'-জ্ঞান আশ্রয় করিয়া দ্বৈতভাবের রাজত্বে, সংসারে ফিরিতে পারে না?

স্বামীজী। ঠাকুর বলতেন, "একমাত্র অবতারেরাই জীবহিতকামে ঐ সমাধি থেকে নেবে আসতে পারেন। সাধারণ জীবের আর ব্যুত্থান হয় না; একুশ দিনমাত্র জীবিত থেকে তাদের দেহটা শুষ্ক পত্রের মত সংসাররূপ বৃক্ষ হতে খসে পড়ে যায়।"

শিষ্য। মন বিলুপ্ত হইয়া যখন সমাধি হয়—মনের কোন তরঙ্গই যখন আর থাকে না, তখন আবার বিক্ষেপের—আবার 'অহং'-জ্ঞান লইয়া সংসারে ফিরিবার সম্ভাবনা কোথায়? মনই যখন নাই, তখন কে, কি নিমিত্তই বা সমাধি-অবস্থা ছাড়িয়া দ্বৈতরাজ্যে নামিয়া আসিবে?

স্বামীজী। বেদান্তশাস্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, নিঃশেষ নিরোধ সমাধি থেকে পুনরাবৃত্তি হয় না; যথা—'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ'। কিন্তু অবতারেরা এক-আধটা সামান্য বাসনা জীবহিতকল্পে রেখে দেন। তাই ধরে আবার superconscious state থেকে conscious state-এ (জ্ঞানাতীত অদ্বৈতভূমি থেকে 'আমি-তুমি'-জ্ঞানমূলক দ্বৈতভূমিতে) আসেন।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, যদি এক-আধটা বাসনাও থাকে, তবে তাহাকে নিঃশেষ নিরোধ সমাধি বলি কিরূপে? কারণ, শাস্ত্রে আছে, নিঃশেষ নির্ব্বিকল্প সমাধিতে মনের সর্ব্ব বৃত্তির, সকল বাসনার নিরোধ বা ধ্বংস হইয়া যায়।

স্বামীজী। মহাপ্রলয়ের পরে তবে সৃষ্টিই বা আবার কেমন করে হবে? মহাপ্রলয়েও ত সব ব্রহ্মে মিশে যায়? তার পরেও কিন্তু আবার শাস্ত্রমুখে সৃষ্টিপ্রসঙ্গ শোনা যায়—সৃষ্টি ও লয় প্রবাহাকারে আবার চলতে থাকে। মহাপ্রলয়ের পরে সৃষ্টি ও লয়ের পুনরাবর্ত্তনের ন্যায় অবতারপুরুষদিগের নিরোধ এবং ব্যুত্থানও তদ্রূপ অপ্রাসঙ্গিক কেন হবে?

শিষ্য। আমি যদি বলি, লয়কালে পুনঃসৃষ্টির বীজ ব্রহ্মে লীনপ্রায় থাকে এবং উহা মহাপ্রলয় বা নিরোধ-সমাধি নহে, কিন্তু সৃষ্টির বীজ ও শক্তির (আপনি যেমন বলেন) potential (অব্যক্ত) আকারধারণ মাত্র?

স্বামীজী। তা হলে আমি বলব, যে ব্রহ্মে কোন বিশেষণের আভাস নেই—যা নির্লেপ ও নির্গুণ—তাঁর দ্বারা এই সৃষ্টিই বা কিরূপে projected (বহির্গত) হওয়া সম্ভবে, তার জবাব দে।

শিষ্য। এ ত seeming projection! সে কথার উত্তরে ত শাস্ত্র বলিয়াছে যে, ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টির বিকাশটা মরুমরীচিকার মত দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ সৃষ্টি প্রভৃতি কিছুই হয় নাই। ভাব-বস্তু ব্রহ্মের অভাব বা মিথ্যা মায়াশক্তিবশতঃ এইরূপ ভ্রম দেখাইতেছে।

স্বামীজী। সৃষ্টিটাই যদি মিথ্যা হয়—তবে জীবের নির্ব্বিকল্প-সমাধি ও সমাধি হইতে ব্যুত্থানটাকেও তুই seeming (মিথ্যা) ধরে নিতে পারিস্ ত? জীব স্বতঃই ব্রহ্মস্বরূপ; তার আবার বন্ধের অনুভূতি কি? তুই যে 'আমি আত্মা' এই অনুভব করতে চাস, সেটাও তা হলে ভ্রম, কারণ শাস্ত্র বলছে,

You are already that (তুই সর্ব্বদা ব্রহ্মই যে হয়ে রয়েছিস)। অতএব "অয়মেব হি তে বন্ধঃ সমাধিমনুতিষ্ঠসি" —তুই যে সমাধিলাভ করতে চাচ্ছিস, এটাই তোর বন্ধন।

শিষ্য। এ ত বড় মুশকিলের কথা; আমি যদি ব্রহ্মই, তবে ঐ বিষয়ের সর্ব্বদা অনুভূতি হয় না কেন?

স্বামীজী। Conscious plane-এ ('তুমি-আমি'র রাজত্ব দ্বৈত-ভূমিতে) ঐ কথা অনুভূতি করতে হলে একটা করণ বা যাহা দ্বারা অনুভব করবি, তা একটা চাই (some instrumentality)। মনই হচ্ছে আমাদের সেই করণ। কিন্তু মন পদার্থটা ত জড়। পেছনে আত্মার প্রভায় মনটা চেতনের মত প্রতিভাত হচ্ছে মাত্র। পঞ্চদশীকার তাই বলেছেন— "চিচ্ছায়াবশতঃ শক্তিশ্চেতনেব বিভাতি সা'—চিৎস্বরূপ আত্মার ছায়া বা প্রতিবিম্বের আবেশেই শক্তিকে চৈতন্যময়ী বলিয়া মনে হয় এবং ঐ জন্যই মনকেও চেতনপদার্থ বলিয়া বোধ হয়। অতএব 'মন' দিয়ে শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে যে জানতে পারবি না, একথা নিশ্চয়। মনের পারে যেতে হবে। মনের পারে আর ত কোন কারণ নেই—এক আত্মাই আছেন; সুতরাং যাকে জানবি, সেটাই আবার করণস্থানীয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ এক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এইজন্য শ্রুতি বলছেন, "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ।" ফলকথা, conscious plane-এর (দ্বৈতভূমির) উপরে একটা অবস্থা আছে, সেখানে কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণাদির দ্বৈতভান নেই। মন নিরুদ্ধ হলে তা প্রত্যক্ষ হয়। ভাষান্তর নেই বলে ঐ অবস্থাটিকে

'প্রত্যক্ষ' করা বলছি ; নতুবা সে অনুভব-প্রকাশের ভাষা নেই ! শঙ্করাচার্য্য তাকে 'অপরোক্ষানুভূতি' বলে গেছেন। ঐ প্রত্যক্ষানুভূতি বা অপরোক্ষানুভূতি হলেও অবতারেরা নীচে নেবে এসে দ্বৈতভূমিতে তার আভাস দেন—সে জন্যই বলে (আপ্তপুরুষের) অনুভব হতেই বেদাদি শাস্ত্রের উৎপত্তি হয়েছে। সাধারণ জীবের অবস্থা কিন্তু 'নুনের পুতুলের সমুদ্র মাপতে গিয়ে গলে যাওয়ার' ন্যায় ; বুঝলি ? মোট কথা হচ্ছে যে, "তুই যে নিত্যকাল ব্রহ্ম" এই কথাটা জানতে হবে মাত্র ; তুই সর্ব্বদা তাই হয়ে রয়েছিস, তবে মাঝখান থেকে একটা জড় মন (যাকে শাস্ত্রে মায়া বলে) এসে সেটা বুঝতে দিচ্ছে না ; সেই সূক্ষ্ম, জড়রূপ উপাদানে নির্ম্মিত মনরূপ পদার্থ টা প্রশমিত হলে—আত্মার প্রভায় আত্মা আপনিই উদ্ভাসিত হয়। এই মায়া বা মন যে মিথ্যা, তার একটা প্রমাণ এই যে, মন নিজে জড় ও অন্ধকারস্বরূপ। পেছনে আত্মার প্রভায় চেতনবৎ প্রতীত হয়। এটা যখন বুঝতে পারবি, তখন এক অখণ্ড চেতনে মনের লয় হয়ে যাবে ; তখনই অনুভূতি হবে—'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'।

অতঃপর স্বামীজী বলিলেন, "তোর ঘুম পাচ্ছে বুঝি ?—তবে শো।" শিষ্য স্বামীজীর পাশের বিছানায় শুইয়া নিদ্রা যাইতে লাগিল। রাত্রে স্বামীজীর সুনিদ্রা না হওয়ায় মাঝে মাঝে উঠিতে লাগিলেন ; শিষ্যও তখন নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া তাঁহাকে আবশ্যকমত সেবা করিতে লাগিল। এইরূপে সে রাত্রি কাটিয়া গেল এবং শেষরাত্রে সে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গে আনন্দে শয্যা ত্যাগ করিল। প্রাতে গঙ্গাস্নানান্তে শিষ্য আসিয়া দেখিল

স্বামীজী মঠের নীচের তলায় বড় বেঞ্চখানির উপর পূর্ব্বাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। গত রাত্রের স্বপ্ন-কথা স্মরণ করিয়া স্বামীজীর পাদপদ্ম অর্চ্চনা করিবার জন্য তাহার মন এখন ব্যগ্র হইয়া উঠিল এবং ঐ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া স্বামীজীর অনুমতি প্রার্থনা করিল। তাহার একান্ত নির্ব্বন্ধাতিশয়ে স্বামীজী সম্মত হইলে, সে কতকগুলি ধুস্তূর পুষ্প সংগ্রহ করিয়া আনিয়া স্বামিশরীরে মহাশিবের অনুষ্ঠান চিন্তা করত বিধিমত তাঁহার পূজা করিল।

পূজান্তে স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, "তোর পূজো ত হল কিন্তু বাবুরাম (প্রেমানন্দ) এসে তোকে এখনি খেয়ে ফেলবে! তুই কিনা ঠাকুরের পূজোর বাসনে (পুষ্পপাত্রে) আমার পা রেখে পূজো করলি?" কথাগুলি বলা শেষ হইতে না হইতে স্বামী প্রেমানন্দ সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং স্বামীজী তাঁহাকে বলিলেন, "ওরে, দেখ্, আজ কি কাণ্ড করেছে!! ঠাকুরের পূজোর থালা বাসন চন্দন এনে ও আজ আমায় পূজো করেছে।" স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তা বেশ করেছে; তুমি আর ঠাকুর কি ভিন্ন?" কথা শুনিয়া শিষ্য নির্ভয় হইল।

শিষ্য গোঁড়া হিন্দু; অখাদ্য দূরে থাকুক কাহারও স্পৃষ্ট দ্রব্য পর্য্যন্ত খায় না। এজন্য স্বামীজী শিষ্যকে কখন কখন 'ভটৃচায' বলিয়া ডাকিতেন। প্রাতর্জ্জলযোগসময়ে বিলাতি বিস্কুটাদি খাইতে খাইতে স্বামীজী সদানন্দ স্বামীকে বলিলেন, "ভট্‌চাযকে ধরে নিয়ে আয় ত।" আদেশ শুনিয়া শিষ্য নিকটে উপস্থিত হইলে স্বামীজী ঐ-সকল দ্রব্যের কিঞ্চিৎ তাহাকে প্রসাদস্বরূপে খাইতে দিলেন। শিষ্য দ্বিধা না করিয়া তাহা গ্রহণ করিল দেখিয়া স্বামীজী তাহাকে

বলিলেন, "আজ কি খেলি তা জানিস্? এগুলি মুর্গির ডিমের তৈরী!" উত্তরে সে বলিল, "যাহাই থাকুক আমার জানিবার প্রয়োজন নাই। আপনার প্রসাদরূপ অমৃত খাইয়া অমর হইলাম।" শুনিয়া স্বামীজী বলিলেন, "আজ থেকে তোর জাত, বর্ণ, আভিজাত্য, পাপ, পুণ্যাদি অভিমান জন্মের মত দূর হোক—আমি আশীর্ব্বাদ করছি।"

স্বামীজীর সেদিনকার অযাচিত অপার দয়ার কথা স্মরণ করিয়া শিষ্য মানবজন্ম সার্থক হইয়াছে মনে করে।

অপরাহ্ণে স্বামীজীর কাছে একাউন্টেণ্ট্ জেনারেল বাবু মন্মথ-নাথ ভট্টাচার্য্য উপস্থিত হইলেন। আমেরিকা যাইবার পূর্ব্বে মান্দ্রাজে স্বামীজী অনেকদিন ইঁহার বাটীতে অতিথি হইয়াছিলেন এবং তদবধি ইনি স্বামীজীকে বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বামীজীকে পাশ্চাত্ত্য দেশ ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। স্বামীজী তাঁহাকে ঐসকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান ও অন্য নানারূপে আপ্যায়িত করিয়া বলিলেন, "একদিন এখানে থেকেই যান না।" মন্মথ বাবু তাহাতে "আর একদিন এসে থাকা যাবে" বলিয়া বিদায়গ্রহণ করিয়া নীচে নামিতে নামিতে জনৈক বন্ধুকে বলিতে লাগিলেন, "ইনি যে পৃথিবীতে একটা মহাকাণ্ড করে তবে ছাড়বেন, তা আমরা পূর্ব্বেই মান্দ্রাজে টের পেয়েছিলুম। এমন সর্ব্বোতোমুখী প্রতিভা মানুষে দেখা যায় না।"

স্বামীজী মন্মথ বাবুর সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার ধার অবধি আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বিদায় দিলেন এবং ময়দানে কিছুক্ষণ পদচারণা করিয়া বিশ্রাম করিতে গেলেন।

ঊনবিংশ বল্লী

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠবাটী

বর্ষ—১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ

স্বামীজীর শিষ্যকে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতে উৎসাহিত করা—শ্রদ্ধা ও আত্মপ্রত্যয়ের অভাবে এদেশের মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকদিগের দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে—ইংলণ্ডে চাকুরে লোকদিগের হীনজ্ঞানে অবজ্ঞা—ভারতে শিক্ষিতাভিমানী লোকদিগের অকর্ম্মণ্যতা—যথার্থ শিক্ষা কাহাকে বলে—ইতর জাতিদিগের কর্ম্ম-তৎপরতা ও আত্মনিষ্ঠা—ভারতের ভদ্রজাতীয়দিগের অপেক্ষা অধিক ইতর জাতিরা এইবার জাগিতেছে ও নিজ ন্যায্য পাওনা-গণ্ডা ভদ্রসমাজের নিকট হইতে আদায় করিবার উপক্রম করিতেছে—ভদ্রজাতিরা তাহাদিগকে ঐ বিষয়ে সাহায্য করিলে ভবিষ্যতে উভয় জাতিরই কল্যাণ হইবে—ইতরজাতীয়দের গীতোক্ত ভাবে শিক্ষা দিলে তাহারা নিজ নিজ জাতীয় কর্ম্ম ত্যাগ করা দূরে থাকুক, গৌরবের সহিত সম্পন্ন করিতে থাকিবে—ভদ্রজাতীয়েরা ঐরূপে ইতরজাতীয়দের এখন সাহায্য না করিলে ভবিষ্যতে কি ফল দাঁড়াইবে।

শিষ্য আজ প্রাতে মঠে আসিয়াছে। স্বামীজীর পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া দাঁড়াইবামাত্র স্বামীজী বলিলেন, "কি হবে আর চাকরি করে? না হয় একটা ব্যবসা কর্।" শিষ্য তখন এক স্থানে একটি প্রাইভেট মাষ্টারি করে মাত্র। সংসারের ভার তখনও তাহার ঘাড়ে পড়ে নাই। আনন্দে দিন কাটায়। শিক্ষকতা-কার্য্য-সম্বন্ধে শিষ্য জিজ্ঞাসা করায় স্বামীজী বলিলেন, "অনেক দিন মাষ্টারি করলে বুদ্ধি খারাপ হয়ে যায়; জ্ঞানের বিকাশ হয় না। দিনরাত ছেলের দলে থেকে থেকে ক্রমে জড়বৎ হয়ে যায়। আর মাষ্টারি করিস্ নি।"

শিষ্য। তবে কি করিব?

স্বামীজী। কেন? যদি তোর সংসারই করতে হয়, যদি অর্থ-

উপায়ের স্পৃহাই থাকে, তবে যা—আমেরিকায় চলে যা। আমি ব্যবসায়ের বুদ্ধি দেব। দেখবি পাঁচ বছরে কত টাকা এনে ফেলতে পারবি।

শিষ্য। কি ব্যবসায় করিব? টাকাই বা কোথা হইতে পাইব?

স্বামীজী। পাগলের মত কি বকছিস্? ভেতরে অদম্য শক্তি রয়েছে। শুধু 'আমি কিছু নই' ভেবে ভেবে বীর্য্যহীন হয়ে পড়েছিস। তুই কেন?—সব জাতটা তাই হয়ে পড়েছে! একবার বেড়িয়ে আয়—দেখবি ভারতেতর দেশে লোকের জীবন-প্রবাহ কেমন তর্ তর্ করে প্রবল বেগে বয়ে যাচ্ছে। আর তোরা কি কচ্ছিস্? এত বিদ্যা শিখে পরের দোরে ভিখারীর মত 'চাকরি দাও, চাকরি দাও' বলে চেঁচাচ্ছিস্। জুতো খেয়ে খেয়ে—দাসত্ব করে করে তোরা কি আর মানুষ আছিস্! তোদের মূল্য এক কাণাকড়িও নয়। এমন সজলা সফলা দেশ, যেখানে প্রকৃতি অন্য সকল দেশের চেয়ে কোটীগুণে ধন-ধান্য প্রসব করছেন সেখানে দেহধারণ করে তোদের পেটে অন্ন নেই—পিঠে কাপড় নেই! যে দেশের ধন-ধান্য পৃথিবীর অপর সকল দেশে civilisation (সভ্যতা) বিস্তার করেছে, সেই অন্নপূর্ণার দেশে তোদের এমন দুর্দ্দশা? ঘৃণিত কুক্কুর অপেক্ষাও যে তোদের দুর্দ্দশা হয়েছে! তোরা আবার তোদের বেদবেদান্তের বড়াই করিস্! যে জাত সামান্য অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে পারে না—পরের মুখাপেক্ষী হয়ে জীবনধারণ করে সে জাতের আবার বড়াই! ধর্ম্মকর্ম্ম এখন গঙ্গায়

ভাসিয়ে আগে জীবনসংগ্রামে অগ্রসর হ। ভারতে কত জিনিস জন্মায়। বিদেশী লোক সেই raw material (কাঁচা মাল) দিয়ে তার সাহায্যে সোনা ফলাচ্ছে। আর তোরা ভারবাহী গর্দ্দভের মত তাদের মাল টেনে মরছিস্। ভারতে যে-সব পণ্য উৎপন্ন হয়, দেশবিদেশের লোক তাই নিয়ে তার ওপর বুদ্ধি খরচ করে, নানা জিনিস তৈয়ের করে বড় হয়ে গেল; আর তোরা তোদের বুদ্ধিটাকে সিন্দুকে পুরে রেখে ঘরের ধন পরকে বিলিয়ে 'হা অন্ন হা অন্ন' করে বেড়াচ্ছিস্!

শিষ্য। কি উপায়ে অন্ন-সংস্থান হইতে পারে, মহাশয়?

স্বামীজী। উপায় তোদেরই হাতে রয়েছে। চোখে কাপড় বেঁধে বলছিস্, 'আমি অন্ধ, কিছুই দেখতে পাই না!' চোখের বাঁধন ছিঁড়ে ফেল্, দেখবি মধ্যাহ্নসূর্য্যের কিরণে জগৎ আলো হয়ে রয়েছে। টাকা না জোটে ত জাহাজের খালাসী হয়ে বিদেশে চলে যা। দিশী কাপড়, গামছা, কুলো, ঝাঁটা মাথায় করে আমেরিকা-ইউরোপে পথে পথে ফিরি করগে। দেখবি—ভারত-জাত জিনিসের এখনও কত কদর! আমেরিকায় দেখলুম—হুগলী জেলার কতকগুলি মুসলমান ঐরূপে ফিরি করে করে ধনবান হয়ে পড়েছে। তাদের চেয়েও কি তোদের বিদ্যাবুদ্ধি কম? এই দেখ্ না—এদেশে যে বেনারসী শাড়ী হয়, এমন উৎকৃষ্ট কাপড় পৃথিবীতে আর কোথাও জন্মায় না। এই কাপড় নিয়ে আমেরিকায় চলে যা। সে দেশে ঐ কাপড়ে গাউন তৈরী করে বিক্রী করতে লেগে যা, দেখবি কত টাকা আসে।

শিষ্য। মহাশয়, তারা বেনারসী শাড়ীর গাউন পরিবে কেন? শুনেছি, চিত্রবিচিত্র কাপড় ওদেশের মেয়েরা পছন্দ করে না।

স্বামীজী। নেবে কি না, তা আমি বুঝব এখন। তুই উদ্যম করে চলে যা দেখি! আমার বহু বন্ধুবান্ধব সে দেশে আছে। আমি তোকে তাদের কাছে introduce (পরিচয়) করে দিচ্ছি। তাদের ভেতর ঐগুলি অনুরোধ করে প্রথমটা চালিয়ে দেব। তারপর দেখবি—কত লোক তাদের follow (অনুসরণ) করবে। তুই তখন মাল দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারবি নি।

শিষ্য। ব্যবসায় করিবার মূলধন কোথায় পাইব?

স্বামীজী। আমি যে করে হ'ক তোকে start (কার্য্যারম্ভ) করিয়ে দেব। তার পর কিন্তু তোর নিজের উদ্যমের উপর সব নির্ভর করবে। "হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্"—এই চেষ্টায় যদি মরে যাস্ তা-ও ভাল, তোকে দেখে আরও দশ জন অগ্রসর হবে। আর যদি success (সফলতা) হয়, ত মহাভোগে জীবন কাটবে।

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু সাহসে কুলায় না।

স্বামীজী। তাইত বলছি বাবা, তোদের শ্রদ্ধা নেই—আত্ম-প্রত্যয়ও নেই। কি হবে তোদের? না হবে সংসার, না হবে ধর্ম্ম। হয় ঐ প্রকার উদ্যোগ উদ্যম করে সংসারে successful (গণ্য, মান্য, শ্রীমান) হ—নয় ত সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে আমাদের পথে আয়। দেশ-বিদেশের লোককে ধর্ম্ম উপদেশ দিয়ে তাঁদের উপকার কর। তবে ত আমাদের মত ভিক্ষা মিলবে। আদান-প্রদান না থাকলে কেউ কারোর

দিকে চায় না। দেখছিস্ ত আমরা দুটো ধর্ম্মকথা শুনাই —তাই গেরস্থেরা আমাদের দুমুটো অন্ন দিচ্ছে। তোরা কিছুই করবি নি, তোদের লোকে অন্ন দেবে কেন? চাকরিতে, গোলামিতে এত দুঃখ দেখেও তোদের চেতনা হচ্ছে না!—কাজেই দুঃখও দূর হচ্ছে না! এ নিশ্চয়ই দৈবী মায়ার খেলা! ওদেশে দেখলুম—যারা চাকরি করে parliament-এ (জাতীয় সমিতিতে) তাদের স্থান পেছনে নির্দ্দিষ্ট। যারা নিজের উদ্যমে বিদ্যায় বুদ্ধিতে স্বনামধন্য হয়েছে, তাদের বসবার জন্যই front seat (সামনের আসন-গুলি)। ওসব দেশে জাত-ফাতের উৎপাত নেই। উদ্যম ও পরিশ্রমে ভাগ্যলক্ষ্মী যাঁদের প্রতি প্রসন্না, তাঁরাই দেশের নেতা ও নিয়ন্তা বলে গণ্য হন। আর তোদের দেশে জাতের বড়াই করে করে—তোদের অন্ন পর্য্যন্ত জুটছে না। একটা ছুঁচ গড়বার ক্ষমতা নেই—তোরা আবার ইংরেজদের criticise (দোষগুণ বিচার) করতে যাস্—আহাম্মক্! ওদের পায়ে ধরে জীবনসংগ্রামোপযোগী বিদ্যা, শিল্পবিজ্ঞান, কর্ম্মতৎপরতা শিখগে। যখন উপযুক্ত হবি, তখন তোদের আবার আদর হবে। ওরাও তখন তোদের কথা রাখবে। কোথাও কিছুই নেই, কেবল Congress (কংগ্রেস—জাতীয় মহাসমিতি) করে চেঁচামেচি করলে কি হবে?

শিষ্য। মহাশয়, দেশের সমস্ত শিক্ষিত লোকই কিন্তু উহাতে যোগদান করিতেছে।

স্বামীজী। কয়েকটা পাশ দিলে বা ভাল বক্তৃতা করতে পারলেই

তোদের কাছে শিক্ষিত হল! যে বিদ্যার উন্মেষে ইতর-সাধারণকে জীবনসংগ্রামে সমর্থ করতে পারা যায় না, যাতে মানুষের চরিত্রবল, পরার্থতৎপরতা, সিংহসাহসিকতা এনে দেয় না, সে কি আবার শিক্ষা? যে শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের উপরে দাঁড়াতে পারা যায়, সেই হচ্ছে শিক্ষা। আজকালকার এইসব স্কুল কলেজে পড়ে, তোরা কেমন এক-প্রকারের একটা dyspeptic (অজীর্ণরোগাক্রান্ত) জাত তৈরী হচ্ছিস্। কেবল machine-এর (কলের) মত খাটছিস্, আর 'জায়স্ব' 'ম্রিয়স্ব' এই বাক্যের সাক্ষিস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিস্। এই যে চাষাভুষো, মুচি-মুদ্দাফরাস্—এদের কর্ম্মতৎপরতা ও আত্মনিষ্ঠা তোদের অনেকের চেয়ে ঢের বেশী। এরা নীরবে চিরকাল কাজ করে যাচ্ছে—দেশের ধন-ধান্য উৎপন্ন করছে —মুখে কথাটি নেই। এরা শীঘ্রই তোদের উপরে উঠে যাবে! Capital (পয়সা) তাদের হাতে গিয়ে পড়ছে—তোদের মত তাদের অভাবের জন্য তাড়না নেই। বর্ত্তমান শিক্ষায় তোদের বাহ্যিক হাল চাল বদলে দিচ্ছে—অথচ নূতন নূতন উদ্ভাবনী শক্তির অভাবে তোদের অর্থাগমের উপায় হচ্ছে না। তোরা এই সব সহিষ্ণু নীচ জাতদের ওপর এতদিন অত্যাচার করেছিস্—এখন এরা তার প্রতিশোধ নেবে। আর তোরা, "হা চাকরি, যো চাকরি" করে করে লোপ পেয়ে যাবি।

শিষ্য। মহাশয়, অপর দেশের তুলনায় আমাদিগের উদ্ভাবনী শক্তি অল্প হইলেও ভারতের ইতর জাতিসকল ত আমাদের বুদ্ধিতেই

চালিত হইতেছে। অতএব ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি ভদ্র জাতিদিগকে জীবনসংগ্রামে পরাজিত করিবার শক্তি ও শিক্ষা ইতর জাতিরা কোথায় পাইবে?

স্বামীজী। তোদের মত তারা কতকগুলো বই-ই না হয় না পড়েছে। তোদের মত শার্ট কোট পরে সভ্য না হয় নাই হতে শিখেছে। তাতে আর কি এল গেল! কিন্তু এরাই হচ্ছে জাতের মেরুদণ্ড—সব দেশে। এই ইতর শ্রেণীর লোক কার্য্য বন্ধ করলে তোরা অন্নবস্ত্র কোথায় পাবি? একদিন মেথররা কলকাতায় কাজ বন্ধ করলে হা হুতাশ লেগে যায়—তিন দিন ওরা কাজ বন্ধ করলে মহামারীতে শহর উজোড় হয়ে যায়! শ্রমজীবীরা কাজ বন্ধ করলে তোদের অন্নবস্ত্র জোটে না। এদের তোরা ছোট লোক ভাবছিস্—আর নিজেদের শিক্ষিত বলে বড়াই কচ্ছিস্?

জীবনসংগ্রামে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকাতে নিম্নশ্রেণীর লোকদের এতদিন জ্ঞানোন্মেষ হয় নি। এরা মানববুদ্ধিনিয়ন্ত্রিত কলের ন্যায় একই ভাবে এতদিন কাজ করে এসেছে—আর বুদ্ধিমান চতুর লোকেরা এদের পরিশ্রম ও উপার্জ্জনের সারাংশ গ্রহণ করেছে; সকল দেশেই ঐরূপ হয়েছে। কিন্তু এখন আর সে কাল নেই! ইতর জাতিরা ক্রমে ঐ কথা বুঝতে পাচ্ছে ও তার বিরুদ্ধে সকলে মিলে দাঁড়িয়ে আপনাদের ন্যায্য গণ্ডা আদায় করতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়েছে। ইউরোপ, আমেরিকায় ইতর জাতিরা জেগে উঠে ঐ লড়াই আগে আরম্ভ করে দিয়েছে। ভারতেও তার লক্ষণ দেখা দিয়েছে

—ছোট লোকদের ভিতর আজকাল এত যে ধর্ম্মঘট হচ্ছে ওতেই ঐকথা বোঝা যাচ্ছে। এখন হাজার চেষ্টা করলেও ভদ্র জাতেরা, ছোট জাতদের আর দাবাতে পারবে না। এখন ইতর জাতদের ন্যায্য অধিকার পেতে সাহায্য করলেই ভদ্র জাতদের কল্যাণ।

তাই ত বলি, তোরা এই mass-এর (সাধারণ শ্রেণীর) ভেতর বিদ্যার উন্মেষ যাতে হয়, তাতে লেগে যা। এদের বুঝিয়ে বল্‌গে—"তোমরা আমাদের ভাই—শরীরের একাঙ্গ —আমরা তোমাদের ভালবাসি—ঘৃণা করি না।" তোদের এই sympathy (সহানুভূতি) পেলে এরা শতগুণ উৎসাহে কার্য্যতৎপর হবে। আধুনিক বিজ্ঞানসহায়ে এদের জ্ঞানোন্মেষ করে দে। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্য—সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্বগুলি এদের শেখা। ঐ শিক্ষার বিনিময়ে শিক্ষকগণেরও দারিদ্র্য ঘুচে যাবে। আদান-প্রদানে উভয়েই উভয়ের বন্ধুস্থানীয় হয়ে দাঁড়াবে।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, ইহাদের ভিতর শিক্ষার বিস্তার হইলে ইহারাও ত আবার কালে আমাদের মত উর্ব্বরমস্তিষ্ক অথচ উদ্যমহীন ও অলস হইয়া উহাদিগের অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের পরিশ্রমের সারাংশ গ্রহণ করিতে থাকিবে ?

স্বামীজী। তা কেন হবে ? জ্ঞানোন্মেষ হলেও কুমোর কুমোরই থাকবে—জেলে জেলেই থাকবে—চাষা চাষই করবে। জাত-ব্যবসা ছাড়বে কেন ? "সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ"—এই ভাবে শিক্ষা পেলে এরা নিজ নিজ বৃত্তি ছাড়বে

কেন? জ্ঞানবলে নিজের সহজাত কর্ম্ম যাতে আরও ভাল করে করতে পারে, সেই চেষ্টা করবে। দু-দশ জন প্রতিভাশালী লোক কালে তাদের ভেতর থেকে উঠবেই উঠবে। তাদের তোরা (ভদ্র জাতিরা) তোদের শ্রেণীর ভেতর করে নিবি। তেজস্বী বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণেরা যে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করে নিয়েছিল, তাতে ক্ষত্রিয় জাতটা ব্রাহ্মণদের কাছে তখন কতদূর কৃতজ্ঞ হয়েছিল বল দেখি? ঐরূপ sympathy (সহানুভূতি) ও সাহায্য পেলে মানুষ ত দূরের কথা, পশুপক্ষীও আপনার হয়ে যায়।

শিষ্য। মহাশয়, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য হইলেও ভদ্রেতর শ্রেণীর ভিতর এখনও যেন বহু ব্যবধান রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ভারতবর্ষের ইতর জাতিদিগের প্রতি ভদ্রলোকদিগের সহানুভূতি আনয়ন করা বড় কঠিন ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়।

স্বামীজী। তা না হলে কিন্তু তোদের (ভদ্র জাতদের) কল্যাণ নেই। তোরা চিরকাল যা করে আসছিস—ঘরাঘরি লাঠালাঠি করে, সব ধ্বংস হয়ে যাবি! এই mass (ভদ্রেতর সাধারণ) যখন জেগে উঠবে, আর তাদের ওপর তোদের (ভদ্র লোকদের) অত্যাচার বুঝ্‌তে পারবে—তখন তাদের ফুৎকারে তোরা কোথায় উড়ে যাবি! তারাই তোদের ভেতর civilisation (সভ্যতা) এনে দিয়েছে; তারাই আবার তখন সব ভেঙ্গে দেবে। ভেবে দেখ—গল্ জাতের হাতে—অমন যে প্রাচীন রোমক সভ্যতা কোথায় ধ্বংস হয়ে গেল। এই

জন্য বলি, এই সব নীচ জাতদের ভেতর বিদ্যাদান, জ্ঞানদান করে এদের ঘুম ভাঙ্গাতে যত্নশীল হ। এরা যখন জাগ্‌বে—আর একদিন জাগ্‌বে নিশ্চয়ই—তখন তারাও তোদের কৃত উপকার বিস্মৃত হবে না, তোদের নিকট কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে।

এইরূপ কথোপকথনের পর স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন—“ওসব কথা এখন থাক—তুই এখন কি স্থির কর্‌লি, তা বল্‌। যা হয় একটা কর। হয়, কোন ব্যবসায়ের চেষ্টা দেখ, নয়ত আমাদের মত ‘আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ’—যথার্থ সন্ন্যাসের পথে চলে আয়। এই শেষ পন্থাই অবশ্য শ্রেষ্ঠ পন্থা, কি হবে ছাই সংসারী হয়ে? বুঝে ত দেখছিস সবই ক্ষণিক—‘নলিনীদলগতজলমতিতরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্’। —অতএব যদি এই আত্মপ্রত্যয় লাভ করতে উৎসাহ হয়ে থাকে ত আর কালবিলম্ব করিস্ নে। এখুনি অগ্রসর হ। ‘যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ।’ পরার্থে নিজ জীবন বলি দিয়ে লোকের দোরে দোরে গিয়ে অভয়বাণী শোনা—‘উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।’ ”

বিংশ বল্লী

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠবাটী

বর্ষ—১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ

'উদ্বোধন' পত্রের প্রতিষ্ঠা—উক্ত পত্রের জন্য স্বামী ত্রিগুণাতীতের অশেষ কষ্ট ও ত্যাগস্বীকার—কি উদ্দেশ্যে স্বামীজী ঐ পত্র বাহির করেন—ঠাকুরের সন্ন্যাসী সন্তান-দিগের ত্যাগ ও অধ্যবসায়—গৃহীদের কল্যাণের জন্যই পত্রপ্রচারাদি—'উদ্বোধন' পত্র কি ভাবে চালাইতে হইবে—জীবন উচ্চভাবে গড়িবার উপায়গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হইবে—কাহাকেও ঘৃণা বা ভয় দেখান কর্ত্তব্য নহে—ভারতের অবসন্নতা ঐরূপেই আসিয়াছে—শরীর সবল করা।

আলমবাজার হইতে বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর বাগানে যখন মঠ উঠিয়া যায়, তাহার অল্পদিন পরে স্বামীজী তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণের নিকট প্রস্তাব করেন যে, ঠাকুরের ভাব জনসাধারণের মধ্যে প্রচারকল্পে বাঙ্গালা ভাষায় একখানি সংবাদপত্র বাহির করিতে হইবে। স্বামীজী প্রথমতঃ একখানি দৈনিক সংবাদপত্রের প্রস্তাব করেন। কিন্তু উহা বিস্তর অর্থসাপেক্ষ হওয়ায় পাক্ষিক পত্র বাহির করিবার প্রস্তাবই সকলের অভিমত হইল এবং স্বামী ত্রিগুণাতীতের উপর উহার পরিচালনের ভার অর্পিত হইল। স্বামীজীর নিজের নিকটে এক সহস্র টাকা ছিল, ঠাকুরের একজন গৃহস্থ ভক্ত[১] আর এক সহস্র ধার দিলেন—ঐ টাকায় কার্য্যারম্ভ হইল। একটি প্রেস্[২] খরিদ করা হইল এবং শ্যামবাজার, রামচন্দ্র মৈত্রের গলিতে শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ বসাকের বাটীতে ঐ প্রেস স্থাপিত হইল।

---

১ ৺হরমোহন মিত্র।

২ প্রেসটি স্বামীজীর জীবনকালেই নানা কারণে বিক্রয় করা হয়।

স্বামী ত্রিগুণাতীত এইরূপে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া ১৩০৫ সালের ১লা মাঘ ঐ পত্র প্রথম প্রকাশ করিলেন। স্বামীজী ঐ পত্রের 'উদ্বোধন' নাম মনোনীত করিলেন এবং উহার উন্নতিকল্পে স্বামী ত্রিগুণাতীতকে বহু আশীর্ব্বাদ করিলেন। অক্লিষ্টকর্ম্মা স্বামী ত্রিগুণাতীত স্বামীজীর আদেশে উহার মুদ্রণ ও প্রচারকল্পে যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাওয়া ভার। কখন ভক্ত-গৃহস্থের ভিক্ষান্নে, কখন অনশনে, কখন প্রেস ও পত্র-সংক্রান্ত কর্ম্মোপলক্ষে পায়ে হাঁটিয়া ৫ ক্রোশ পথ চলিয়া—এইরূপে স্বামী ত্রিগুণাতীত ঐ পত্রের উন্নতি ও প্রচারের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কারণ, পয়সা দিয়া কর্ম্মচারী রাখিবার তখন সংস্থান ছিল না এবং স্বামীজীর আদেশ ছিল, পত্রের জন্য গচ্ছিত টাকাব একটি পয়সাও পত্রে ব্যয় ভিন্ন অন্য কোনরূপে খরচ করিতে পারিবে না। স্বামী ত্রিগুণাতীত সেজন্য ভক্তদিগের আলয়ে ভিক্ষাশিক্ষা করিয়া নিজের গ্রাসাচ্ছাদন কোনরূপে চালাইয়া ঐ আদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করিয়াছিলেন।

পত্রের প্রস্তাবনা স্বামীজী নিজে লিখিয়া দেন এবং কথা হয় যে, ঠাকুরের সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তগণই এই পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিবেন। কোনরূপ অশ্লীলতাব্যঞ্জক বিজ্ঞাপনাদি যাহাতে এই পত্রে প্রকাশিত না হয় সে বিষয়ও স্বামীজী নির্দ্দেশ করিয়া দেন। সঙ্ঘরূপে পরিণত রামকৃষ্ণ মিশনের সভ্যগণকে স্বামীজী এই পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতে এবং ঠাকুরের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মত পত্রসহায়ে জনসাধারণে প্রচার করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। পত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইলে শিষ্য একদিন মঠে উপস্থিত হইল। স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া

উপবেশন করিলে তিনি তাহার সহিত 'উদ্বোধন' পত্র সম্বন্ধে এইরূপ কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন—

স্বামীজী। (পত্রের নামটি বিকৃত করিয়া পরিহাসচ্ছলে) 'উদ্বন্ধন' দেখেছিস্ ?

শিষ্য। আজ্ঞে হ্যাঁ ; সুন্দর হয়েছে।

স্বামীজী। এই পত্রের ভাব, ভাষা সব নূতন ছাঁচে গড়তে হবে।

শিষ্য। কিরূপ ?

স্বামীজী। ঠাকুরের ভাব ত সব্বাইকে দিতে হবেই ; অধিকন্তু বাঙ্গালা ভাষায় নূতন ওজস্বিতা আনতে হবে। এই যেমন—কেবল ঘন ঘন verb use (ক্রিয়াপদের ব্যবহার) করলে ভাষার দম্ কমে যায়। বিশেষণ দিয়ে verb-এর (ক্রিয়াপদের) ব্যবহারগুলি কমিয়ে দিতে হবে। তুই ঐরূপ প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ কর্। আমায় আগে দেখিয়ে তবে উদ্বোধনে ছাপতে দিবি।

শিষ্য। মহাশয়, স্বামী ত্রিগুণাতীত এই পত্রের জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিতেছেন—তাহা অন্যের পক্ষে অসম্ভব।

স্বামীজী। তুই বুঝি মনে কচ্ছিস, ঠাকুরের এই সব সন্ন্যাসী সন্তানেরা কেবল গাছতলায় ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকতে জন্মেছে ? ইহাদের যে যখন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে, তখন তার উদ্যম দেখে লোকে অবাক হবে। এদের কাছে কাজ কি করে করতে হয়, তা শেখ্। এই দেখ্, আমার আদেশ পালন করতে ত্রিগুণাতীত সাধনভজন ধ্যানধারণা পর্য্যন্ত ছেড়ে দিয়ে কার্য্যে নেবেছে। এ কি কম sacrifice-এর

(ত্যাগস্বীকারের) কথা—আমার প্রতি কতটা ভালবাসা থেকে এ কর্ম্মপ্রবৃত্তি এসেছে বল্ দেখি! Success (কাজ হাসিল) করে তবে ছাড়বে!! তোদের কি এমন রোক্ আছে?

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, গেরুয়াপরা সন্ন্যাসীর গৃহীদের দ্বারে দ্বারে ঐরূপে ঘোরা আমাদের চক্ষে কেমন কেমন ঠেকে!

স্বামীজী। কেন? পত্রের প্রচার ত গৃহীদেরই কল্যাণের জন্য। দেশে নবভাবপ্রচারের দ্বারা জনসাধারণের কল্যাণ সাধিত হবে। এই ফলাকাঙ্ক্ষারহিত কর্ম্ম বুঝি তুই সাধন-ভজনের চেয়ে কম মনে কচ্ছিস? আমাদের উদ্দেশ্য জীবের হিতসাধন। এই পত্রের আয় দ্বারা টাকা জমাবার মতলব আমাদের নেই। আমরা সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী—মাগছেলে নেই যে, তাদের জন্য কিছু রেখে যেতে হবে। Success (কাজ হাসিল ও আয়-বৃদ্ধি) হয় ত এর income (আয়টা) সমস্তই জীবসেবাকল্পে ব্যয়িত হবে। স্থানে স্থানে সঙ্ঘগঠন, সেবাশ্রম-স্থাপন, আরও কত কি হিতকর কার্য্যে এর উদ্বৃত্ত অর্থের সদ্ব্যয় হতে পারবে। আমরা ত গৃহীদের মত নিজেদের রোজগারের মতলব এঁটে এ কাজ করছি নি। শুধু পরহিতেই আমাদের সকল movement (কার্য্য)—এটা জেনে রাখবি।

শিষ্য। তাহা হইলেও—সকলে এভাব লইতে পারিবে না।

স্বামীজী। নাই বা পারলে। তাতে আমাদের এল গেল কি? আমরা criticism (নিন্দা সুখ্যাতি) গণ্য করে কার্য্যে অগ্রসর হই নি।

শিষ্য। মহাশয়, এই পত্র ১৫ দিন অন্তর বাহির হইবে; আমাদের ইচ্ছা সাপ্তাহিক হয়।

স্বামীজী। তা ত বটে, কিন্তু funds (টাকা) কোথায়? ঠাকুরের ইচ্ছায় টাকার যোগাড় হলে এটাকে পরে দৈনিকও করা যেতে পারে। রোজ লক্ষ কপি ছেপে কলকাতার গলিতে গলিতে free distribution (বিনামূল্যে বিতরণ) করা যেতে পারে।

শিষ্য। আপনার এ সঙ্কল্প বড়ই উত্তম।

স্বামীজী। আমার ইচ্ছে হয়, কাগজটাকে পায়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তোকে editor (সম্পাদক) করে দেব। কোন বিষয়কে প্রথমটা পায়ে দাঁড় করবার শক্তি তোদের এখনও হয় নি। সেটা করতে এই সব সর্ব্বত্যাগী সাধুরাই সক্ষম। এরা কাজ করে করে মরে যাবে তবু হটবার ছেলে নয়। তোরা একটু বাধা পেলে, একটু criticism (নিন্দা) শুনলেই দুনিয়া আঁধার দেখিস্!

শিষ্য। সেদিন দেখিলাম, স্বামী ত্রিগুণাতীত ঠাকুরের ছবি প্রেসে পূজা করিয়া তবে কাজ আরম্ভ করিলেন এবং কার্য্যের সফলতার জন্য আপনার কৃপা প্রার্থনা করিলেন।

স্বামীজী। আমাদের centre (কেন্দ্র) ত ঠাকুরই। আমরা এক একজন সেই জ্যোতিঃকেন্দ্রের এক একটি ray (কিরণ-ধারা)। ঠাকুরকে পূজা করে কাজটা আরম্ভ করেছে—বেশ করেছে! কৈ আমায় ত পূজোর কথা কিছু বললে না?

শিষ্য। মহাশয়, তিনি আপনাকে ভয় করেন। ত্রিগুণাতীত স্বামী

আমায় কল্য বলিলেন—"তুই আগে স্বামীজীর কাছে গিয়ে জেনে আয়, পত্রের ১ম সংখ্যা বিষয়ে তিনি কি অভিমত প্রকাশ করেছেন, তারপর আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করবো।"

স্বামীজী। তুই গিয়ে বলিস্ আমি তাঁর কার্য্যে খুব খুশি হয়েছি। তাকে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানাবি। আর তোরা প্রত্যেকে যতটা পারবি, তাকে সাহায্য করিস্। উহাতে ঠাকুরের কাজই করা হবে।

কথাগুলি বলিয়াই স্বামীজী ব্রহ্মানন্দ স্বামীজীকে নিকটে আহ্বান করিলেন এবং আবশ্যক হইলে ভবিষ্যতে 'উদ্বোধনে'র জন্য ত্রিগুণাতীত স্বামীকে আরও টাকা দিতে আদেশ করিলেন। ঐ দিন রাত্রে আহারান্তে স্বামীজী পুনরায় শিষ্যের সহিত 'উদ্বোধন' পত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে উহাও আমরা এখানে পাঠককে বলিতেছি।

স্বামীজী। 'উদ্বোধনে' সাধারণকে কেবল positive ideas (সকল বিষয় গড়িয়া তুলিবার আদর্শ) দিতে হবে। Negative thought (নেই নেই ভাবে) মানুষকে weak (নির্জীব) করে দেয়। দেখ্‌ছিস না, যে-সকল মা-বাপ ছেলেদের দিন রাত লেখাপড়ার জন্য তাড়া দেয়—বলে 'এটার কিছু হবে না', 'বোকা গাধা'—তাদের ছেলেগুলি অনেকস্থলে তাই হয়ে দাঁড়ায়। ছেলেদের ভাল বললে—উৎসাহ দিলে, সময়ে নিশ্চয় ভাল হয়। ছেলেদের পক্ষে যা নিয়ম, children in the region of higher thoughts (ভাবরাজ্যের উচ্চ অধিকারের তুলনায় যারা ঐরূপ শিশুদের মত তাদের) সম্বন্ধেও তাই।

Positive idea (জীবনগড়ার ভাবগুলি) দিতে পারলে সাধারণে মানুষ হয়ে উঠবে ও নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখবে। ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, কবিতা, শিল্প সকল বিষয়ে যা চিন্তা ও চেষ্টা মানুষ করছে, তাতে ভুল না দেখিয়ে ঐসব বিষয় কেমন করে ক্রমে ক্রমে আরও ভাল রকমে করতে পারবে, তাই বলে দিতে হবে। ভ্রমপ্রমাদ দেখালে মানুষের feeling wounded (মনে আঘাত দেওয়া) হয়। ঠাকুরকে দেখেছি—যাদের আমরা হেয় মনে করতুম—তাদেরও তিনি উৎসাহ দিয়ে জীবনের মতিগতি ফিরিয়ে দিতেন। তাঁর শিক্ষা দেওয়ার রকমই একটা অদ্ভুত ব্যাপার!

কথাগুলি বলিয়া স্বামীজী একটু স্থির হইলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার বলিতে লাগিলেন—

"ধর্ম্মপ্রচারটা কেবল যাতে তাতে, যার তার উপর নাক-সিট্‌কানো ব্যাপার বলে যেন বুঝিস্ নি। Physical, mental, spiritual (শরীর, মন ও আত্মা-সম্বন্ধীয়) সকল ব্যাপারেই মানুষকে positive idea (গড়িবার ভাব)-সকল দিতে হবে। কিন্তু ঘেন্না করে নয়। পরস্পরকে ঘেন্না করে করেই তোদের অধঃপতন হয়েছে। এখন কেবল positive thought (সবল হবার ও জীবন গড়বার ভাব) ছড়িয়ে লোককে তুলতে হবে। প্রথমে ঐরূপে সমস্ত হিঁদু-জাতটাকে তুলতে হবে—তারপর জগৎটাকে তুলতে হবে। ঠাকুরের অবতীর্ণ হওয়ার কারণ এই। তিনি জগতে কারও ভাব নষ্ট করেন নি। মহা অধঃপতিত মানুষকেও তিনি অভয়

দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে তুলে নিয়েছেন। আমাদেরও তাঁর পদানুসরণে সকলকে তুলতে হবে—জাগাতে হবে—বুঝলি ?

"তোদের history, literature, mythology (ইতিহাস, সাহিত্য, পুরাণ) প্রভৃতি সকল শাস্ত্রগ্রন্থ মানুষকে কেবল ভয়ই দেখাচ্ছে! মানুষকে কেবল বলছে—তুই নরকে যাবি, তোর আর উপায় নেই। তাই এত অবসন্নতা ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেছে। সেই জন্য বেদ-বেদান্তের উচ্চ উচ্চ ভাবগুলি সাদা কথায় মনুষকে বুঝিয়ে দিতে হবে। সদাচার, সদ্ব্যবহার ও বিদ্যাশিক্ষা দিয়ে ব্রাহ্মণ-চণ্ডালকে এক ভূমিতে দাঁড় করাতে হবে। 'উদ্বোধন' কাগজে এই সব লিখে আবাল-বৃদ্ধবনিতাকে তোল্ দেখি। তবে জান্‌ব—তোর বেদ-বেদান্ত পড়া সার্থক হয়েছে। কি বলিস্—পারবি ?

শিষ্য। আপনার আশীর্ব্বাদ ও আদেশ হইলে সকল বিষয়েই সিদ্ধকাম হইব বলিয়া মনে হয়।

স্বামীজী। আর একটা কথা—শরীরটাকে খুব মজবুত করতে তোকে শিখতে হবে ও সকলকে শেখাতে হবে। দেখ্‌ছিস্‌নে এখনও রোজ আমি ডাম্‌বেল করি। রোজ রোজ সকালে সন্ধ্যায় বেড়াবি। শারীরিক পরিশ্রম করবি। Body and mind must run parallel (দেহ ও মন সমানভাবে উন্নত হওয়া চাই)। সব বিষয়ে পরের ওপর নির্ভর করলে চলবে কেন ? শরীরটা সবল করবার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারলে নিজেরাই তখন ঐ বিষয়ে যত্ন করবে। সেই প্রয়োজনীয়তা-বোধের জন্যই এখন education-এর (শিক্ষার) দরকার।

একবিংশ বল্লী

স্থান—কলিকাতা

বর্ষ—১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ

সিষ্টার নিবেদিতা প্রভৃতির সহিত স্বামীজীর আলিপুরের পশুশালা দেখিতে গমন—পশুশালা দেখিবার কালে কথোপকথন ও পরিহাস—দর্শনান্তে পশুশালার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু রামব্রহ্ম সান্ন্যাল রায় বাহাদুরের বাসায় চা-পান ও ক্রমবিকাশ-সম্বন্ধে কথোপকথন—ক্রমবিকাশের কারণ বলিয়া পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা চূড়ান্ত মীমাংসা নহে—ঐ বিষয়ের কারণ সম্বন্ধে মহামুনি পতঞ্জলির মত—বাগবাজারে ফিরিয়া আসিয়া স্বামীজীর পুনরায় ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে কথোপকথন—পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট ক্রমবিকাশের কারণ মানবেতর প্রাণিজগতে সত্য হইলেও মানবজগতে সংযম এবং ত্যাগই সর্ব্বোচ্চ পরিণামের কারণ—স্বামীজী সর্ব্বসাধারণকে সর্ব্বাগ্রে শরীর সবল করিতে কেন বলিয়াছেন।

আজ তিন দিন হইল স্বামীজী বাগবাজারের ৺বলরাম বসুর বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। প্রত্যহ অসংখ্য লোকের ভিড়। স্বামী যোগানন্দও স্বামীজীর সঙ্গে একত্রে অবস্থান করিতেছেন। অদ্য সিষ্টার নিবেদিতাকে সঙ্গে লইয়া স্বামীজী আলিপুরের পশুশালা দেখিতে যাইবেন। শিষ্য উপস্থিত হইলে তাহাকে ও স্বামী যোগানন্দকে বলিলেন, "তোরা আগে চলে যা—আমি নিবেদিতাকে নিয়ে গাড়ী করে একটু পরেই যাচ্ছি।"

স্বামী যোগানন্দ শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া ট্রামে করিয়া আড়াইটা আন্দাজ রওনা হইলেন। তখন ঘোড়ার ট্রাম। বেলা প্রায় ৪টার সময় পশুশালায় উপস্থিত হইয়া তিনি বাগানের তদানীন্তন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু রামব্রহ্ম সান্ন্যাল রায় বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। স্বামীজী আসিতেছেন শুনিয়া রামব্রহ্ম বাবু সাতিশয়

সন্তোষ লাভ করিলেন এবং স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বাগানের দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। প্রায় সাড়ে চারিটার সময় স্বামীজী নিবেদিতাকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। রামব্রহ্ম বাবুও পরম সাদরে স্বামীজী ও নিবেদিতাকে অভ্যর্থনা করিয়া পশুশালার ভিতর লইয়া গেলেন এবং প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল তাঁহাদের অনুগমন করিয়া বাগানের নানা স্থান প্রদর্শন করাইতে লাগিলেন। স্বামী যোগানন্দও শিষ্যসমভিব্যাহারে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

রামব্রহ্ম বাবু উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন, উদ্যানস্থ নানা বৃক্ষ দেখাইতে দেখাইতে উদ্ভিদ্-শাস্ত্রের মতে বৃক্ষাদির কালে কিরূপ ক্রমপরিণতি হইয়াছে, কখন কখন তদ্বিষয় আলোচনা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নানা জীব জন্তু দেখিতে দেখিতে স্বামীজীও মধ্যে মধ্যে জীবের উত্তরোত্তর পরিণতি সম্বন্ধে ডারুইনের (Darwin) মতের আলোচনা করিতে লাগিলেন। শিষ্যের মনে আছে, সর্প-গৃহে যাইয়া তিনি চক্রাঙ্কিতগাত্র একটা প্রকাণ্ড সাপ দেখাইয়া বলিলেন, "এ থেকেই কালে tortoise (কচ্ছপ) উৎপন্ন হয়েছে। ঐ সাপই বহুকাল ধরে একস্থানে বসে থেকে ক্রমে কঠোরপৃষ্ঠ হয়ে গিয়েছে।" কথাগুলি বলিয়াই স্বামীজী শিষ্যকে তামাসা করিয়া বলিলেন, "তোরা না কচ্ছপ খাস্? ডারুইনের মতে এই সাপই কাল-পরিণামে কচ্ছপ হয়েছে;— তা হলে তোরা সাপও খাস্!" শিষ্য শুনিয়া ঘৃণায় মুখ বাঁকাইয়া বলিল—"মহাশয়, একটা পদার্থ ক্রমপরিণতির দ্বারা পদার্থান্তর হইয়া যাইলে যখন তাহার পূর্ব্বাকৃতি ও স্বভাব থাকে না,

তখন কচ্ছপ থাইলেই যে সাপ খাওয়া হইল, একথা কেমন করিয়া বলিতেছেন ?”

শিষ্যের কথা শুনিয়া স্বামীজী ও রামব্রহ্ম বাবু হাসিয়া উঠিলেন এবং সিষ্টার নিবেদিতাকে ঐ কথা বুঝাইয়া দেওয়াতে তিনিও হাসিতে লাগিলেন। ক্রমে সকলেই যেখানে সিংহ ব্যাঘ্রাদি রক্ষিত ছিল, সেই ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

রামব্রহ্ম বাবুর আদেশে রক্ষকেরা সিংহ ব্যাঘ্রের জন্য প্রচুর মাংস আনিয়া আমাদের সম্মুখেই উহাদিগকে আহার করাইতে লাগিল। উহাদের সাহ্লাদ-গর্জ্জন এবং সাগ্রহ-ভোজন শুনিবার ও দেখিবার অল্পক্ষণ পরেই উদ্যানমধ্যস্থিত রামব্রহ্ম বাবুর বাসা-বাড়ীতে আমরা সকলে উপস্থিত হইলাম। তথায় চা ও জলপানের উদ্যোগ হইয়াছিল। স্বামীজী অল্পমাত্র চা পান করিলেন। নিবেদিতাও চা পান করিলেন। এক টেবিলে বসিয়া সিষ্টার নিবেদিতাস্পৃষ্ট মিষ্টান্ন ও চা খাইতে সঙ্কুচিত হইতেছে দেখিয়া স্বামীজী শিষ্যকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া উহা খাওয়াইলেন এবং নিজে জলপান করিয়া তাহার অবশিষ্ট শিষ্যকে পান করিতে দিলেন। অতঃপর ডারুইনের ক্রমবিকাশবাদ লইয়া কিছুক্ষণ কথোপকথন চলিতে লাগিল।

রামব্রহ্ম বাবু। ডারুইন ক্রমবিকাশবাদ ও তাহার কারণ যেভাবে বুঝাইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আপনার অভিমত কি ?

স্বামীজী। ডারুইনের কথা সঙ্গত হইলেও evolution-এর (ক্রমবিকাশবাদের) কারণ সম্বন্ধে উহা যে চূড়ান্ত মীমাংসা এ কথা আমি স্বীকার করিতে পারি না।

রামব্রহ্ম বাবু। এ বিষয়ে আমাদের দেশে প্রাচীন পণ্ডিতগণ কোনরূপ আলোচনা করিয়াছিলেন কি ?

স্বামীজী। সাংখ্যদর্শনে ঐ বিষয় সুন্দর আলোচিত হইয়াছে। ভারতের প্রাচীন দার্শনিকদিগের সিদ্ধান্তই ক্রমবিকাশের কারণ সম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসা বলিয়া আমার ধারণা।

রামব্রহ্ম বাবু। সংক্ষেপে ঐ সিদ্ধান্ত বুঝাইয়া বলা চলিলে শুনিতে ইচ্ছা হয়।

স্বামীজী। নিম্ন জাতিকে উচ্চ জাতিতে পরিণত করিতে পাশ্চাত্ত্য মতে struggle for existence (জীবন-সংগ্রাম), survival of the fittest (যোগ্যতমের উদ্বর্তন), natural selection (প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন) প্রভৃতি যেসকল নিয়ম কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেসকল আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে। পাতঞ্জল-দর্শনে কিন্তু এসকলের একটিও উহার কারণ বলিয়া সমর্থিত হয় নাই। পতঞ্জলির মত হচ্ছে, এক species (অপরা-জাতি) থেকে আর এক species-এ (অপরা-জাতিতে) পরিণতি 'প্রকৃতির আপূরণের' (প্রকৃত্যাপূরাৎ) দ্বারা সংসাধিত হয়। আবরণ বা obstacles-এর সঙ্গে দিন রাত struggle (লড়াই) করে যে উহা সাধিত হয়, তা নয়। আমার বিবেচনায় struggle (লড়াই) এবং competition (প্রতিদ্বন্দ্বিতা) জীবের পূর্ণতালাভের পক্ষে অনেক সময় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। হাজার জীব ধ্বংস করে যদি একটা জীবের ক্রমোন্নতি হয় (যাহা পাশ্চাত্ত্য দর্শন সমর্থন করে) তা হলে বলতে হয় এই evolution (ক্রমবিকাশ) দ্বারা

সংসারের বিশেষ কোন উন্নতিই হচ্ছে না। সাংসারিক উন্নতির কথা স্বীকার করিয়া লইলেও আধ্যাত্মিক বিকাশ-কল্পে উহা যে বিষম প্রতিবন্ধক, একথা স্বীকার করিতেই হয়। আমাদের দেশীয় দার্শনিকগণের অভিপ্রায় জীবমাত্রই পূর্ণ আত্মা। আত্মার বিকাশের তারতম্যেই বিচিত্র ভাবে প্রকৃতির অভিব্যক্তি এবং বিকাশ। প্রকৃতির অভিব্যক্তির এবং বিকাশের প্রতিবন্ধকগুলি সর্ব্বতোভাবে সরে দাঁড়ালে পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ। প্রকৃতির অভিব্যক্তির নিম্নস্তরসমূহে যাই হোক, উচ্চস্তরসমূহে কিন্তু প্রতিবন্ধকগুলির সঙ্গে দিন রাত যুদ্ধ করেই যে ওদের অতিক্রম করা যায়, তা নয়; দেখা যায় সেখানে শিক্ষা, দীক্ষা, ধ্যান-ধারণা এবং প্রধানতঃ ত্যাগের দ্বারাই প্রতিবন্ধকগুলি সরে যায় বা অধিকতর আত্মপ্রকাশ উপস্থিত হয়। সুতরাং obstacle (প্রতিবন্ধক)-গুলিকে আত্মপ্রকাশের কার্য্য না বলে কারণরূপে নির্দ্দেশ করা এবং প্রকৃতির এই বিচিত্র অভিব্যক্তির সহায়ক বলা যুক্তিযুক্ত নহে। হাজার পাপীর প্রাণ সংহার করে জগৎ থেকে পাপ দূর করবার চেষ্টা দ্বারা জগতে পাপের বৃদ্ধিই হয়। কিন্তু উপদেশ দিয়ে জীবকে পাপ থেকে নিবৃত্ত করতে পারলে জগতে আর পাপ থাকে না। এখন দেখুন, পাশ্চাত্ত্য Struggle Theory বা জীবসকলের পরস্পর সংগ্রাম ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা উন্নতি-লাভরূপ মতটা কতদূর horrible (ভীষণ) হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

রামব্রহ্ম বাবু স্বামীজীর কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, অবশেষে বলিলেন—"আপনার ন্যায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য দর্শনে অভিজ্ঞ

লোকের ভারতবর্ষে এখন বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। ঐরূপ লোকেই একদেশদর্শী শিক্ষিত জনগণের ভ্রমপ্রমাদ অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতে সমর্থ। আপনার Evolution Theory-র (ক্রমবিকাশ-বাদের) নূতন ব্যাখ্যা শুনিয়া আমি পরম আহ্লাদিত হইলাম।"

বিদায়কালে রামব্রহ্ম বাবু বাগানের ফটক পর্য্যন্ত আসিয়া স্বামীজীকে বিদায় দিলেন এবং স্বামীজীর সঙ্গে সুবিধামত পুনরায় একদিন নিরিবিলি দেখা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। রামব্রহ্ম বাবু এ জীবনে স্বামীজীর নিকট আসিবার ঐ অবসর পাইয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না। কারণ এ ঘটনার অল্প দিন পরেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শিষ্য স্বামী যোগানন্দের সহিত ট্রামে করিয়া রাত্রি প্রায় ৮টার সময় বাগবাজারে ফিরিয়া আসিল। স্বামীজী ঐ সময়ের প্রায় পনর মিনিট পূর্ব্বে ফিরিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা বিশ্রামান্তে তিনি বৈঠকখানায় আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন সেখানে স্বামী যোগানন্দ, ৺শরচ্চন্দ্র সরকার, শশিভূষণ ঘোষ (ডাক্তার), বিপিনবিহারী ঘোষ (ডাক্তার), শান্তিরাম ঘোষ প্রভৃতি পরিচিত বন্ধুগণ এবং স্বামীজীর দর্শনাভিলাষে আগত অপরিচিত পাঁচ-ছয় জন লোকও উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজী অদ্য পশুশালা দেখিতে যাইয়া রামব্রহ্ম বাবুর নিকট ক্রমবিকাশবাদের (Evolution Theory) অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন শুনিয়া ইঁহারা সকলেই ঐ প্রসঙ্গ বিশেষরূপে শুনিবার জন্য ইতঃপূর্ব্বেই সমুৎসুক ছিলেন। অতএব তিনি আসিবামাত্র সকলের অভিপ্রায় বুঝিয়া শিষ্য ঐ কথাই পাড়িল।

শিষ্য। মহাশয়, পশুশালায় ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। অনুগ্রহ করিয়া সহজ কথায় তাহা পুনরায় বলিবেন কি?

স্বামীজী। কেন, কি বুঝিস্ নি?

শিষ্য। এই আপনি অন্য অনেক সময় আমাদের বলিয়াছেন যে, বাহিরের শক্তিসমূহের সহিত সংগ্রাম করিবার ক্ষমতাই জীবনের চিহ্ন এবং উহাই উন্নতির সোপান। আজ আবার যেন উল্টা কথা বলিলেন।

স্বামীজী। উল্টো বলব কেন? তুই-ই বুঝতে পারিস্ নি। Animal kingdom বা নিম্ন প্রাণিজগতে আমরা সত্যসত্যই struggle for existence, survival of the fittest প্রভৃতি নিয়ম স্পষ্ট দেখতে পাই। তাই ডারুইনের theory (তত্ত্ব) কতকটা সত্য বলে প্রতিভাত হয়। কিন্তু human kingdom বা মনুষ্য জগতে, যেখানে rationality-র (জ্ঞান-বুদ্ধির) বিকাশ, সেখানে এ নিয়মের উল্টোই দেখা যায়। মনে কর্, যাঁদের আমরা really great men (বাস্তবিক বড়লোক) বা ideal (আদর্শ) বলে জানি, তাঁদের বাহ্য struggle একেবারেই দেখতে পাওয়া যায় না। Animal kingdom বা মনুষ্যেতর প্রাণিজগতে instinct বা স্বাভাবিক জ্ঞানের প্রাবল্য। মানুষ কিন্তু যত উন্নত হয় ততই তাতে rationality-র (জ্ঞান-বুদ্ধির) বিকাশ। এই জন্য animal kingdom-এর ন্যায় rational human kingdom-এ পরের ধ্বংসসাধন কোরে progress (উন্নতি)

হতে পারে না। মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ evolution (পূর্ণবিকাশ) একমাত্র sacrifice (ত্যাগের) দ্বারা সাধিত হয়। যে পরের জন্য যত sacrifice (ত্যাগ) করতে পারে, মানুষের মধ্যে সে তত বড়। আর নিম্নস্তরের প্রাণিজগতে যে যত ধ্বংস করতে পারে, সে তত বলবান্ জানোয়ার হয়। সুতরাং Struggle Theory—(জীবনসংগ্রাম-তত্ত্ব) এ উভয় রাজ্যে equally applicable (সমভাবে উপযোগী) হতে পারে না। মানুষের struggle (সংগ্রাম) হচ্ছে মনে। মনকে যে যত control (আয়ত্ত) করতে পেরেছে, সে তত বড় হয়েছে। মনের সম্পূর্ণ বৃত্তিহীনতায় আত্মার বিকাশ হয়। Animal kingdom-এ (মানবেতর প্রাণিজগতে) স্থূল দেহের সংরক্ষণে যে struggle (সংগ্রাম) পরিলক্ষিত হয়, human plane of existence-এ (মানবজীবনে) মনের ওপর আধিপত্য-লাভের জন্য বা সত্ত্ববৃত্তিসম্পন্ন হবার জন্য সেই struggle (সংগ্রাম) চলেছে। জীবন্ত বৃক্ষ ও পুকুরের জলে পতিত বৃক্ষচ্ছায়ার ন্যায় মনুষ্যেতর প্রাণী ও মনুষ্যজগতে struggle (সংগ্রাম) বিপরীত দেখা যায়।

শিষ্য। তাহা হইলে আপনি আমাদের শারীরিক উন্নতিসাধনের জন্য এত করিয়া বলেন কেন ?

স্বামীজী। তোরা কি আবার মানুষ ? তবে একটু rationality (জ্ঞান-বুদ্ধি) আছে, এই মাত্র। Physique (দেহটা) ভাল না হলে মনের সহিত struggle (সংগ্রাম) করবি কি করে ? তোরা কি আর জগতের highest evolution (পূর্ণ

বিকাশস্থল) মানুষপদবাচ্য আছিস্? আহার নিদ্রা মৈথুন ভিন্ন তোদের আর আছে কি? এখনও যে চতুষ্পদ হয়ে যাস্ নি এই ঢের। ঠাকুর বল্‌তেন, "মান হুঁশ আছে যার সেই মানুষ",—তোরা ত 'জায়স্ব ম্রিয়স্ব' বাক্যের সাক্ষী হয়ে স্বদেশবাসীর হিংসার স্থল ও বিদেশিগণের ঘৃণার আস্পদ হয়ে রয়েছিস্। তোরা animal (মানবেতর প্রাণীর মধ্যে), তাই struggle (সংগ্রাম) করতে বলি। থিওরী-ফিওরী রেখে দে। নিজেদের দৈনন্দিন কার্য্য ও ব্যবহার স্থিরভাবে আলোচনা করে দেখ্ দেখি, তোরা animal and human planes-এর (মানব এবং মানবেতর ভূমির) মধ্যবর্ত্তী জীব-বিশেষ কি না! Physique-টাকে (দেহটাকে) আগে গড়ে তোল্। তবে ত মনের উপর ক্রমে আধিপত্যলাভ হবে —"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" !—বুঝ্‌লি।

শিষ্য। মহাশয়, 'বলহীনেন' অর্থে ভাষ্যকার কিন্তু "ব্রহ্মচর্য্য-হীনেন" বলেছেন !

স্বামীজী। তা বলুন্‌গে। আমি বলছি—The physically weak are unfit for the realisation of the Self (দুর্ব্বল শরীরে আত্মসাক্ষাৎকারলাভ হয় না)।

শিষ্য। কিন্তু সবল শরীরে অনেক জড়বুদ্ধিও ত দেখা যায়।

স্বামীজী। তাদের যদি তুই যত্ন করে ভাল idea (ভাব) একবার দিতে পারিস্ তা হলে তারা যত শীগ্‌গীর তা work out (কার্য্যে পরিণত) করতে পারবে, হীনবীর্য্য লোক তত শীগ্‌গীর পারবে না। দেখছিস্ না, ক্ষীণশরীরে কাম-ক্রোধের

বেগধারণ হয় না। শুঁট্‌কো লোকগুলো শীগ্‌গীর রেগে যায় —শীগ্‌গীর কামমোহিত হয়।

শিষ্য। কিন্তু এ নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বামীজী। তা নেই কে বলছে? মনের উপর একবার control (আধিপত্যলাভ) হয়ে গেলে, দেহ সবল থাক্ বা শুকিয়েই যাক্, তাতে আর আসে যায় না। মোট কথা হচ্ছে physique (শরীর) ভাল না হলে সে আত্মজ্ঞানের অধিকারীই হতে পারে না; ঠাকুর বল্‌তেন, "শরীরে এতটুকু খুঁত থাকলে জীব সিদ্ধ হতে পারে না।"

কথাগুলি বলিতে বলিতে স্বামীজী উত্তেজিত হইয়াছেন দেখিয়া শিষ্য সাহস করিয়া আর কোন কথা বলিতে পারিল না। স্বামীজীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া স্থির হইয়া রহিল! কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী রহস্য করিয়া উপস্থিত সকলকে বলিতে লাগিলেন— "আর এক কথা শুনেছেন, আজ এই ভট্‌চায বামুন নিবেদিতার এঁটো খেয়ে এসেছে। তার ছোঁয়া মিষ্টান্ন না হয় খেলি, তাতে তত আসে যায় না—কিন্তু তার ছোঁয়া জলটা কি করে খেলি?"

শিষ্য। তা আপনিই ত আদেশ করিয়াছিলেন। গুরুর আদেশে আমি সব করিতে পারি। জলটা খাইতে কিন্তু আমি নারাজ ছিলাম—আপনি পান করিয়া দিলেন কাজেই প্রসাদ বলিয়া খাইতে হইল।

স্বামীজী। তোর জাতের দফা রফা হয়ে গেছে—এখন আর তোকে কেউ ভট্‌চায বামুন বলে মানবে না!

শিষ্য। না মানে নাই মানুক। আমি আপনার আদেশে চণ্ডালের ভাতও খাইতে পারি।

কথা শুনিয়া স্বামীজী ও উপস্থিত সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

কথাবার্ত্তায় রাত্রি প্রায় ১২॥০ হইয়া গেল। শিষ্য ঐ রাত্রে বাসাবাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, দ্বার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ডাকাডাকি করিয়া কাহাকেও জাগাইতে না পারিয়া তাহাকে অগত্যা বাসার রোয়াকে শুইয়া সে রাত্রি যাপন করিতে হইয়াছিল।

কালচক্রের কঠোর পরিবর্ত্তনে স্বামীজী, স্বামী যোগানন্দ ও ভগ্নী নিবেদিতা আজ আর নরশরীরে নাই। তাঁহাদের জীবনের পবিত্র স্মৃতিমাত্রই কেবল পড়িয়া রহিয়াছে।—এবং তাঁহাদের কথাবার্ত্তার যৎকিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিতে পারিয়া শিষ্য আপনাকে ধন্য মনে করিতেছে।

দ্বাবিংশ বল্লী

স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠবাটী

বর্ষ—১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠকে স্বামীজীর অদ্বিতীয় ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে পরিণত করিবার বাসনা—মঠে ব্রহ্মচারীদিগকে কিরূপে শিক্ষা দিবার সঙ্কল্প ছিল—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, অন্নসত্র ও সেবাশ্রম স্থাপন করিয়া ব্রহ্মচারীদিগকে সন্ন্যাস ও ব্রহ্মবিত্তালাভে যোগ্য করিবার অভিপ্রায়—উহাতে সাধারণের কি কল্যাণ হইবে—পরার্থকর্ম্ম বন্ধনের কারণ হয় না—মায়ার আবরণ সরিয়া গেলেই সকল জীবের ব্রহ্মবিকাশ হয়—ঐরূপ ব্রহ্মবিকাশে সত্যসঙ্কল্পত্ব লাভ হয়—মঠকে সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ক্ষেত্রে পরিণত করা—শুদ্ধাদ্বৈতবাদ সংসারে সকল প্রকার অবস্থায় অনুষ্ঠান করিতে পারা যায়, ইহা দেখাইতে স্বামীজীর আগমন—এক-শ্রেণীর বেদান্তবাদীর মত, সংসারের সকলে যতক্ষণ না মুক্ত হইবে, ততক্ষণ তোমার মুক্তি অসম্ভব—ব্রহ্মজ্ঞানলাভে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমগ্র জগৎ, সকল জীবকে নিজসত্তা বলিয়া অনুভব হয়—অজ্ঞান-অবলম্বনেই সংসারে সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার চলিয়াছে—অজ্ঞানের আদি ও অন্ত—শাস্ত্রোক্তি, অজ্ঞান প্রবাহরূপে নিত্য-প্রায় কিন্তু সান্ত—নিখিলব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মে অধ্যস্ত হইয়া রহিয়াছে—যাহা পূর্ব্বে কখন দেখি নাই তদ্বিষয়ের অধ্যাস হয় কি না—ব্রহ্মতত্ত্বাস্বাদ মূকাস্বাদনবৎ।

আজ বেলা প্রায় দুইটার সময় শিষ্য পদব্রজে মঠে আসিয়াছে। নীলাম্বর বাবুর বাগানবাটীতে এখন মঠ উঠাইয়া আনা হইয়াছে। এবং বর্ত্তমান মঠের জমিও অল্প দিন হইল খরিদ করা হইয়াছে। স্বামীজী শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া বেলা চারিটা আন্দাজ মঠের নূতন জমিতে বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। মঠের জমি তখন জঙ্গলপূর্ণ, জমিটির উত্তরাংশে তখন একখানি একতলা কোঠাবাড়ী ছিল; উহারই সংস্করণে বর্ত্তমান মঠ-বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। মঠের জমিটি যিনি খরিদ করাইয়া দেন, তিনিও স্বামীজীর সঙ্গে কিছুদূর পর্য্যন্ত আসিয়া বিদায় লইলেন। স্বামীজী শিষ্যসঙ্গে মঠের জমিতে ভ্রমণ

করিতে লাগিলেন ও কথাপ্রসঙ্গে ভাবী মঠের কার্য্যকারিতা ও বিধিবিধান পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে একতলা ঘরের পূর্ব্বদিকের বারাণ্ডায় পৌঁছিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে স্বামীজী বলিলেন, "এইখানে সাধুদের থাকবার স্থান হবে। সাধন-ভজন, জ্ঞানচর্চ্চায় এই মঠ প্রধান কেন্দ্রস্থান হবে, ইহাই আমার অভিপ্রায়। এখান থেকে যে শক্তির অভ্যুদয় হবে তাতে জগৎ ছেয়ে ফেলবে; মানুষের জীবনগতি ফিরিয়ে দেবে; জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম্মের একত্র সমন্বয়ে এইখান থেকে ideals (মানবহিতকর উচ্চাদর্শসকল) বেরোবে; এই মঠভুক্ত পুরুষদিগের ইঙ্গিতে কালে দিগ্‌দিগন্তরে প্রাণের সঞ্চার হবে; যথার্থ ধর্ম্মানুরাগিগণ সব এখানে কালে এসে জুটবে—মনে ঐরূপ কত কল্পনার উদয় হচ্ছে।

"মঠের ঐ যে দক্ষিণ ভাগের জমি দেখছিস, ওখানে বিদ্যার কেন্দ্রস্থল হবে। ব্যাকরণ, দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, ভক্তি শাস্ত্র আর রাজকীয় ভাষা ঐ স্থানে শিক্ষা দেওয়া হবে। প্রাচীন টোলের ধরনে ঐ বিদ্যামন্দির স্থাপিত হবে। বালব্রহ্মচারীরা ঐখানে বাস করে শাস্ত্রপাঠ করবে। তাদের অশন-বসন সব মঠ থেকে দেওয়া হবে। ঐই সব ব্রহ্মচারীরা পাঁচ বৎসর training-এর (শিক্ষালাভের) পর ইচ্ছে হলে গৃহে ফিরে গিয়ে সংসারী হতে পারবে। মঠের মহাপুরুষগণের অভিমতে সন্ন্যাসও ইচ্ছে হলে নিতে পারবে। এই ব্রহ্মচারিগণের মধ্যে যাদের উচ্ছৃঙ্খল বা অসচ্চরিত্র দেখা যাবে, তাদের মঠস্বামিগণ তখনি বহিষ্কৃত করে দিতে পারবেন। এখানে জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে অধ্যয়ন করান হবে।

এতে যাদের objection (আপত্তি) থাকবে তাদের নেওয়া হবে না। তবে নিজের জাতিবর্ণাশ্রমাচার মেনে যারা চলতে চাইবে, তাদের আহারাদির বন্দোবস্ত নিজেদের করে নিতে হবে। তারা অধ্যয়নমাত্র সকলের সহিত একত্র করবে। তাদেরও চরিত্র-বিষয়ে মঠস্বামিগণ সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবেন। এখানে trained (শিক্ষিত) না হলে কেহ সন্ন্যাসের অধিকারী হতে পারবে না। ক্রমে এইরূপে যখন এই মঠের কার্য্য আরম্ভ হবে, তখন কেমন হবে বল্ দেখি ?”

শিষ্য। আপনি তবে প্রাচীন কালের মত গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অনুষ্ঠান পুনরায় দেশে চালাইতে চান ?

স্বামীজী। নয় ত কি ? Modern system of education-এ (বর্ত্তমানে দেশে যে ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহাতে) ব্রহ্মবিদ্যা-বিকাশের সুযোগ কিছুমাত্র নেই। পূর্ব্বের মত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তবে, এখন broad basis-এর (উদারভাবসমূহের) ওপর তার foundation (ভিত্তিস্থাপন) করতে হবে, অর্থাৎ কালোপযোগী অনেক পরিবর্ত্তন তাতে ঢোকাতে হবে। সে সব পরে বলব।

স্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেন—“মঠের দক্ষিণে ঐ যে জমিটা আছে, ঐটেও কালে কিনে নিতে হবে। ঐখানে মঠের অন্নসত্র হবে। ঐখানে যথার্থ দীনদুঃখিগণকে নারায়ণজ্ঞানে সেবা করবার বন্দোবস্ত থাকবে। ঐ অন্নসত্র ঠাকুরের নামে প্রতিষ্ঠিত হবে। যেমন funds (টাকা) জুটবে, সেই অনুসারে অন্নসত্র প্রথম খুলতে হবে। চাই কি প্রথমে দু-তিনটি লোক নিয়ে start

(কার্য্যারম্ভ) করতে হবে। উৎসাহী ব্রহ্মচারিগণকে এই অন্নসত্র চালাতে train করতে (শিখাইতে) হবে। তাদের যোগাড়-সোগাড় করে—চাই কি ভিক্ষা করে—এই অন্নসত্র চালাতে হবে। মঠ এ বিষয়ে কোনরূপ অর্থসাহায্য করতে পারবে না। ব্রহ্মচারিগণকেই ওর জন্য অর্থসংগ্রহ করে আনতে হবে। সেবাসত্রে ঐভাবে পাঁচ বৎসর training (শিক্ষালাভ) সম্পূর্ণ হলে তবে তারা বিদ্যামন্দির-শাখায় প্রবেশাধিকারলাভ করতে পারবে। অন্নসত্রে পাঁচ বৎসর আর বিদ্যাশ্রমে পাঁচ বৎসর—একুনে দশ বৎসর training-এর (শিক্ষার) পর মঠের স্বামিগণের দ্বারা দীক্ষিত হয়ে সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করতে পারবে—অবশ্য যদি তাদের সন্ন্যাসী হতে ইচ্ছে হয় ও মঠের অধ্যক্ষগণের তাদের উপযুক্ত অধিকারী বুঝে সন্ন্যাসী করা অভিমত হয়। তবে, মঠাধ্যক্ষ কোন কোন বিশেষসদ্‌গুণসম্পন্ন ব্রহ্মচারী সম্বন্ধে ঐ নিয়ম ব্যতিক্রম করে তাকে যখন ইচ্ছে সন্ন্যাস-দীক্ষা দিতেও পারবেন। সাধারণ ব্রহ্মচারিগণকে কিন্তু পূর্ব্বে যেমন বল্লুম সেইভাবে ক্রমে ক্রমে সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করতে হবে। আমার মাথায় এই সব idea (ভাব) রয়েছে।

শিষ্য। মহাশয়, মঠে এইরূপ তিনটি শাখাস্থাপনের উদ্দেশ্য কি হবে?

স্বামীজী। বুঝ্‌লি নি? প্রথমে অন্নদান, তারপর বিদ্যাদান, সর্ব্বোপরি জ্ঞানদান। এই তিন ভাবের সমন্বয় এই মঠ থেকে করতে হবে। অন্নদান করবার চেষ্টা করতে করতে ব্রহ্মচারীদের মনে পরার্থকর্ম্মতৎপরতা ও শিবজ্ঞানে জীবসেবার ভাব দৃঢ় হবে। ও থেকে তাদের চিত্ত ক্রমে নির্ম্মল হয়ে তাতে

সত্ত্বভাবের স্ফুরণ হবে। তা হলেই ব্রহ্মচারিগণ কালে ব্রহ্মবিদ্যা-লাভের যোগ্যতা ও সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশাধিকার লাভ করবে।

শিষ্য। মহাশয়, জ্ঞানদানই যদি শ্রেষ্ঠ হয়, তবে আর অন্নদান ও বিদ্যাদানের শাখাস্থাপনের প্রয়োজন কি ?

স্বামীজী। তুই এতক্ষণেও কথাটা বুঝতে পার্‌লি নি! শোন্—এই অন্ন-হাহাকারের দিনে তুই যদি পরার্থে, সেবাকল্পে দীন-দুঃখীকে ভিক্ষা-শিক্ষা করে, যেরূপে হ'ক—দুমুটো অন্ন দিতে পারিস, তা হলে জীব জগৎ ও তোর মঙ্গল ত হবেই—সঙ্গে সঙ্গেই তুই এই সৎকার্য্যের জন্য সকলের sympathy (সহানুভূতি) পাবি। ঐ সৎকার্য্যের জন্য তোকে বিশ্বাস করে কামকাঞ্চনবদ্ধ সংসারী জীব তোর সাহায্য করতে অগ্রসর হবে। তুই বিদ্যাদানে বা জ্ঞানদানে যত লোক আকর্ষণ করতে পারবি, তার সহস্রগুণ লোক তোর এই অযাচিত অন্নদানে আকৃষ্ট হবে। এই কার্য্যে তুই public sympathy (সাধারণের সহানুভূতি) যত পাবি তত আর কোন কার্য্যে পাবি নি। যথার্থ সৎকার্য্যে মানুষ কেন, ভগবানও সহায় হন। এইরূপে লোক আকৃষ্ট হলে তখন তাদের মধ্য দিয়ে বিদ্যা ও জ্ঞানার্জ্জনের স্পৃহা উদ্দীপিত করতে পারবি। তাই আগে অন্নদান।

শিষ্য। মহাশয়, অন্নসত্র করিতে প্রথম স্থান চাই; তারপর ঐজন্য ঘর-দ্বার নির্ম্মাণ করা চাই, তার পর কাজ চালাইবার টাকা চাই। এত টাকা কোথা হইতে আসিবে ?

স্বামীজী। মঠের দক্ষিণদিকটা আমি এখনি ছেড়ে দিচ্ছি ও ঐ বেলতলায় একখানা চালা তুলে দিচ্ছি। তুই একটি কি দুটি

অন্ধ আতুর সন্ধান করে নিয়ে এসে কাল থেকেই তাদের সেবায় লেগে যা দেখি। নিজে ভিক্ষা করে তাদের জন্য নিয়ে আয়। নিজে রেঁধে তাদের খাওয়া। এইরূপে কিছু দিন করলেই দেখবি—তোর এই কার্য্যে কত লোক সাহায্য করতে অগ্রসর হবে, কত টাকা-কড়ি দেবে! "ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।"

শিষ্য। হাঁ, তাহা বটে। কিন্তু ঐরূপে নিরন্তর কর্ম্ম করিতে করিতে কালে কর্ম্মবন্ধন ত ঘটিতে পারে?

স্বামীজী। কর্ম্মের ফলে তোর যদি দৃষ্টি না থাকে ও সকল প্রকার কামনা-বাসনার পারে যাবার যদি তোর একান্ত অনুরাগ থাকে, তা হলে ঐ সব সৎকার্য্য তোর কর্ম্মবন্ধনমোচনেই সহায়তা করবে। ঐরূপ কর্ম্মে বন্ধন আসবে!—ওকথা তুই কি বলছিস্? এইরূপ পরার্থ কর্ম্মই কর্ম্মবন্ধনের মূলোৎপাটনের একমাত্র উপায়! "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

শিষ্য। আপনার কথায় অন্নসত্র ও সেবাশ্রম সম্বন্ধে আপনার মনোভাব বিশেষ করিয়া শুনিতে প্রাণে উৎসাহ হইতেছে।

স্বামীজী। গরীব-দুঃখীদের জন্য well-ventilated (বায়ু-প্রবেশের উত্তমপথযুক্ত) ছোট ছোট ঘর তৈরী করতে হবে। এক এক ঘরে তাদের দুই জন কি তিন জন মাত্র থাকবে। তাদের উত্তম বিছানা, পরিষ্কার কাপড়-চোপড় সব দিতে হবে। তাদের জন্য একজন ডাক্তার থাকবে। হপ্তায় একবার কি দুবার সুবিধামত তিনি তাদের দেখে যাবেন। সেবাশ্রমটি অন্নসত্রের ভেতর একটা ward-এর (বিভাগের) মত থাকবে,

তাতে রোগীদের শুশ্রূষা করা হবে। ক্রমে যখন fund (টাকা) এসে পড়বে, তখন একটা মস্ত kitchen (রন্ধনশালা) করতে হবে। অন্নসত্রে কেবল "দীয়তাং নীয়তাং ভুজ্যতাম্" এই রব উঠবে। ভাতের ফেন গঙ্গায় গড়িয়ে পড়ে গঙ্গার জল সাদা হয়ে যাবে। এই রকম অন্নসত্র হয়েছে দেখলে তবে আমার প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়।

শিষ্য। আপনার যখন ঐরূপ ইচ্ছা হইতেছে, তখন বোধ হয় কালে ঐ বিষয়টি বাস্তবিকই হইবে।

শিষ্যের কথা শুনিয়া স্বামীজী গঙ্গাপানে চাহিয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন। পরে প্রসন্নমুখে সস্নেহে শিষ্যকে বলিলেন—"তোদের ভেতর কবে কার সিংহ জেগে উঠবে, তা কে জানে? তোদের একটার মধ্যে মা যদি শক্তি জাগিয়ে দেন ত দুনিয়াময় অমন কত অন্নসত্র হবে। কি জানিস্, জ্ঞান শক্তি ভক্তি সকলই সর্ব্বজীবে পূর্ণভাবে আছে। উহাদের বিকাশের তারতম্যটাই কেবল আমরা দেখি ও ইহাকে বড় উহাকে ছোট বলে মনে করি। জীবের মনের ভিতর একটা পর্দ্দা যেন মাঝখানে পড়ে পূর্ণ বিকাশটাকে আড়াল করে রয়েছে। সেটা সরে গেলেই ব্যস্, সব হয়ে গেল! তখন যা চাইবি, যা ইচ্ছে করবি, তাই হবে।"

স্বামীজীর কথা শুনিয়া শিষ্য ভাবিতে লাগিল, তাহার মনের ভিতরের ঐ পর্দ্দাটা কবে সরিয়া যাইয়া তাহার ঈশ্বরদর্শন হইবে!

স্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেন—"ঈশ্বর করেন ত এই মঠকে মহাসমন্বয়ক্ষেত্র করে তুলতে হবে। ঠাকুর আমাদের

সর্ব্বভাবের সাক্ষাৎ সমন্বয়মূর্ত্তি। ঐ সমন্বয়ের ভাবটি এখানে জাগিয়ে রাখলে ঠাকুর জগতে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। সর্ব্বমত, সর্ব্বপথ, আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ সকলে যাতে এখানে এসে আপন আপন ideal (আদর্শ) দেখতে পায়, তা করতে হবে। সেদিন যখন মঠের জমিতে ঠাকুরকে স্থাপন করলুম, তখন মনে হল—যেন এখান হতে তাঁর ভাবের বিকাশ হয়ে চরাচর বিশ্ব ছেয়ে ফেলছে! আমি ত যথাসাধ্য করছি ও করব—তোরাও ঠাকুরের উদার ভাব লোকদের বুঝিয়ে দে; কেবল বেদান্ত পড়ে কি হবে? Practical life-এ (দৈনন্দিন কর্ম্মময় জীবনে) শুদ্ধাদ্বৈতবাদের সত্যতা প্রমাণিত করতে হবে। শঙ্কর এই অদ্বৈতবাদকে জঙ্গলে পাহাড়ে রেখে গেছেন; আমি এবার সেটাকে সেখান থেকে সংসারে ও সমাজের সর্ব্বত্র রেখে যাব বলে এসেছি। ঘরে ঘরে, মাঠে ঘাটে, পর্ব্বতে প্রান্তরে এই অদ্বৈতবাদের দুন্দুভিনাদ তুলতে হবে। তোরা আমার সহায় হয়ে লেগে যা।"

শিষ্য। মহাশয়, ধ্যানসহায়ে ঐ ভাব অনুভূতি করিতেই যেন আমার ভাল লাগে। লাফাতে ঝাঁপাতে ইচ্ছা হয় না।

স্বামীজী। সেটা ত নেশা করে অচেতন হয়ে থাকার মত; শুধু ঐরূপ থেকে কি হবে? অদ্বৈতবাদের প্রেরণায় কখন বা তাণ্ডব নৃত্য করবি, কখনও বা বুঁদ হয়ে থাকবি। ভাল জিনিস পেলে কি একা খেয়ে সুখ হয়? দশ জনকে দিতে হয় ও খেতে হয়। আত্মানুভূতিলাভ করে না হয় তুই মুক্ত হয়ে গেলি—তাতে জগতের এল গেল কি? ত্রিজগৎ মুক্ত করে নিয়ে যেতে হবে। মহামায়ার রাজ্যে আগুন

ধরিয়ে দিতে হবে! তখনি নিত্য-সত্যে প্রতিষ্ঠিত হবি। সে আনন্দের কি তুলনা আছে রে!—'নিরবধি গগনাভং'—আকাশকল্প ভূমানন্দে প্রতিষ্ঠিত হবি। জীবজগতের সর্ব্বত্র তোর নিজ সত্তা দেখে অবাক হয়ে পড়বি! স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত তোর আপনার সত্তা বলে বোধ হবে। তখন সকলকে আপনার মত যত্ন না করে থাকতে পারবি নি। এইরূপ অবস্থাই হচ্ছে Practical Vedanta (কর্ম্মের ভিতর বেদান্তের অনুভূতি)—বুঝ্‌লি। তিনি (ব্রহ্ম) এক হয়েও ব্যবহারিক ভাবে বহুরূপে সামনে রয়েছেন। নাম ও রূপ এই ব্যবহারের মূলে রয়েছে। যেমন ঘটের নাম-রূপটা বাদ দিয়ে কি দেখতে পাস্—একমাত্র মাটি, যা এর প্রকৃত সত্তা। সেইরূপ ভ্রমে ঘট পট মঠ সব ভাবছিস্ ও দেখছিস্। জ্ঞান-প্রতিবন্ধক এই যে অজ্ঞান, যার বাস্তব কোন সত্তা নেই, তাই নিয়ে ব্যবহার চলছে। মাগ-ছেলে, দেহ-মন যা কিছু—সবই নামরূপসহায়ে অজ্ঞানের সৃষ্টিতে দেখতে পাওয়া যায়। অজ্ঞানটা যেই সরে দাঁড়াল, তখনি ব্রহ্ম-সত্তা-অনুভূতি হয়ে গেল।

শিষ্য। এই অজ্ঞান কোথা হইতে আসিল?

স্বামীজী। কোত্থেকে এল তা পরে বলব। তুই যখন দড়াকে সাপ ভেবে ভয়ে দৌড়তে লাগ্‌লি, তখন কি দড়াটা সাপ হয়ে গিয়েছিল?—না, তোর অজ্ঞতাই তোকে অমন করে ছুটিয়েছিল?

শিষ্য। অজ্ঞতা হইতেই ঐরূপ করিয়াছিলাম।

স্বামীজী। তা হলে ভেবে দেখ্—তুই যখন আবার দড়াকে দড়া

বলে জানতে পারবি, তখন নিজের পূর্ব্বকার অজ্ঞতা ভেবে হাসি পাবে কি না?—তখন নামরূপ মিথ্যা বলে বোধ হবে কি না?

শিষ্য। তা হবে।

স্বামীজী। তা যদি হয়, তবে নামরূপ মিথ্যা হয়ে দাঁড়াল। এইরূপে ব্রহ্মসত্তাই একমাত্র সত্য হয়ে দাঁড়াল। এই অনন্ত সৃষ্টিবৈচিত্র্যেও তাঁর স্বরূপের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। কেবল তুই এই অজ্ঞানের মন্দান্ধকারে এটা মাগ, এটা ছেলে, এটা আপন, এটা পর ভেবে সেই সর্ব্ববিভাসক আত্মার সত্তা বুঝতে পারিস নে। যখন গুরুর উপদেশ ও নিজের বিশ্বাস দ্বারা এই নামরূপাত্মক জগৎটা না দেখে এর মূল সত্তাটাকে কেবল অনুভব করবি তখনি আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকল পদার্থে তোর আত্মানুভূতি হবে—তখনি "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ" হবে।

শিষ্য। মহাশয়, এই অজ্ঞানের আদি-অন্তের কথা জানিতে ইচ্ছা হয়।

স্বামীজী। যে জিনিসটা পরে থাকে না—সে জিনিসটা যে মিথ্যা, তা ত বুঝতে পেরেছিস্? যে যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ হয়েছে, সে বলবে অজ্ঞান আবার কোথায়? সে দড়াকে দড়াই দেখে—সাপ বলে দেখতে পায় না। যারা দড়াকে সাপ বলে দেখে, তাদের ভয়-ভীতি দেখে তার হাসি পায়! সেজন্য অজ্ঞানের বাস্তব স্বরূপ নেই। অজ্ঞানকে সৎও বলা যায় না—অসৎও বলা যায় না। "সন্নাপ্যসন্নাপ্যুভয়াত্মিকা নো"। যে জিনিসটা এইরূপে মিথ্যা

বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে তার বিষয়ে প্রশ্নই বা কি, আর উত্তরই বা কি? ঐ বিষয়ে প্রশ্ন করাটা যুক্তিযুক্তও হতে পারে না। কেন তা শোন্। এই প্রশ্নোত্তরটাও ত সেই নামরূপ বা দেশকাল ধরে করা হচ্ছে? যে ব্রহ্মবস্তু নামরূপ দেশকালের অতীত, তাকে প্রশ্নোত্তর দিয়ে কি বুঝান যায়? এইজন্য শাস্ত্র, মন্ত্র প্রভৃতি ব্যবহারিক ভাবে সত্য—পারমার্থিক রূপে সত্য নয়। অজ্ঞানের স্বরূপই নাই, তা আবার কি বুঝবি? যখন ব্রহ্মের প্রকাশ হবে, তখন আর ঐরূপ প্রশ্ন করবার অবসরই থাকবে না। ঠাকুরের সেই 'মুচি-মুটের' গল্প শুনেছিস না?—ঠিক তাই। অজ্ঞানকে যেই চেনা যায়, অমনি সে পালিয়ে যায়।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, অজ্ঞানটা আসিল কোথা হইতে?

স্বামীজী। যে জিনিসটাই নেই, তা আবার আসবে কি করে? থাকলে ত আসবে?

শিষ্য। তবে এই জীব-জগতের কি করিয়া উৎপত্তি হইল?

স্বামীজী। এক ব্রহ্মসত্তাই ত রয়েছেন! তুই মিথ্যা নামরূপ দিয়ে তাকে রূপান্তরে নামান্তরে দেখ্ছিস।

শিষ্য। এই মিথ্যা নাম-রূপই বা কেন? কোথা হইতে আসিল?

স্বামীজী। শাস্ত্রে এই নামরূপাত্মক সংস্কার বা অজ্ঞতাকে প্রবাহ-রূপে নিত্যপ্রায় বলেছে। কিন্তু উহা সান্ত। ব্রহ্মসত্তা কিন্তু সর্ব্বদা দড়ার মত স্বস্বরূপেই রয়েছেন। এইজন্য বেদান্ত-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মে অধ্যস্ত ইন্দ্রজালবৎ ভাসমান। তাতে ব্রহ্মের কিছুমাত্র স্বরূপ বৈলক্ষণ্য ঘটে নি। বুঝ্লি?

শিষ্য। একটা কথা এখনও বুঝিতে পারিতেছি না।

স্বামীজী। কি বল্ না?

শিষ্য। এই যে আপনি বলিলেন, এই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াদি ব্রহ্মে অধ্যস্ত, তাদের কোন স্বরূপসত্তা নাই—তা কি করিয়া হইতে পারে? যে যাহা পূর্ব্বে দেখে নাই, সে জিনিসের ভ্রম তাহার হইতেই পারে না। যে কখনও সাপ দেখে নাই, তাহার দড়াতে যেমন সর্পভ্রম হয় না, সেইরূপ যে এই সৃষ্টি দেখে নাই, তার ব্রহ্মে সৃষ্টিভ্রম হইবে কেন? সুতরাং সৃষ্টি ছিল বা আছে তাই সৃষ্টিভ্রম হইয়াছে! ইহাতেই দ্বৈতাপত্তি উঠিতেছে।

স্বামীজী। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ তোর প্রশ্ন এইরূপে প্রথমেই প্রত্যাখ্যান করবেন যে, তাঁর দৃষ্টিতে সৃষ্টি প্রভৃতি একেবারেই প্রতিভাত হচ্ছে না। তিনি একমাত্র ব্রহ্মসত্তাই দেখছেন। রজ্জুই দেখছেন, সাপ দেখছেন না। তুই যদি বলিস্, 'আমি ত এই সৃষ্টি বা সাপ দেখছি'—তবে তোর দৃষ্টিদোষ দূর করতে তিনি তোকে রজ্জুর স্বরূপ বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করবেন। যখন তাঁর উপদেশ ও বিচার বলে তুই রজ্জুসত্তা বা ব্রহ্মসত্তা বুঝতে পারবি, তখন এই ভ্রমাত্মক সর্পজ্ঞান ও সৃষ্টিজ্ঞান নাশ হয়ে যাবে। তখন এই সৃষ্টিস্থিতিলয়রূপ ভ্রমজ্ঞান ব্রহ্মে আরোপিত ভিন্ন আর কি বলতে পারিস্? অনাদি প্রবাহরূপে এই সৃষ্টি-ভানাদি চলে এসে থাকে ত থাকুক, তার নির্ণয়ে লাভালাভ কিছুই নাই। ব্রহ্মতত্ত্ব 'করামলকবৎ' প্রত্যক্ষ না হলে এ প্রশ্নের পর্য্যাপ্ত মীমাংসা হতে পারে না; এবং তখন আর প্রশ্নও

উঠে না, উত্তরেরও প্রয়োজন হয় না। ব্রহ্মতত্ত্বাস্বাদ তখন 'মূকাস্বাদনবৎ' হয়।

শিষ্য। তবে আর এত বিচার করিয়া কি হইবে?

স্বামীজী। ঐ বিষয়টি বুঝ্‌বার জন্য বিচার। সত্যবস্তু কিন্তু বিচারের পারে—"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া"।

এইরূপ কথা হইতে হইতে শিষ্য স্বামীজীর সঙ্গে মঠে আসিয়া উপস্থিত হইল। মঠে আসিয়া স্বামীজী মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণকে অদ্যকার ব্রহ্মবিচারের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম বুঝাইয়া দিলেন। উপরে উঠিতে উঠিতে শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন, "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

(উত্তর কাণ্ড)

অষ্টম সংস্করণ

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

দুই টাকা

প্রকাশক—স্বামী আত্মবোধানন্দ
উদ্বোধন কার্য্যালয়
১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

১৩৫৩

প্রিণ্টার—[illegible]গেন্দ্রনাথ
বোস প্রেস
৩০ নং, ব্রজনাথ মিত্র
কলিকাতা

নিবেদন

গত সাত বৎসর যাবৎ "স্বামি-শিষ্য-সংবাদ" উদ্বোধন পত্রে ধারাবাহিক ক্রমে প্রকাশিত হইয়াছে। এতদিনে পুস্তকাকারে উদ্বোধন আফিস হইতে প্রকাশিত হইল।

স্বামিজী যখন প্রথমবার বিলাত হইতে আসিয়া কলিকাতা বাগবাজার ৺বলরাম বসুর বাড়ীতে অবস্থান করেন, তখন হইতে শিষ্যের সহিত স্বামিজীর নানারূপ বিচার ও শাস্ত্রপ্রসঙ্গ হইত। পূজনীয় মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় ঐ সময়ে একদিন তথায় উপস্থিত ছিলেন। ঐ দিন তিনি শিষ্যকে বলেন যে, স্বামিজীর সহিত যে সব প্রসঙ্গ হয়, তাহা যেন সে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে। মাষ্টার মহাশয়ের আদেশে শিষ্য সেই সকল প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল—তাহাতেই বিস্তৃত আকারে "স্বামি-শিষ্য-সংবাদ" লিখিত হইয়াছে। এখানে ইহাও প্রকাশ থাকে যে, বেলুড়মঠের শ্রীযুক্ত নির্ম্মলানন্দ স্বামী মহারাজও এই সকল প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে শিষ্যকে বহুধা উৎসাহিত করিয়াছিলেন। এই দুই মহাপুরুষের নিকট শিষ্য এই জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছে।

এই সকল প্রবন্ধের অধিকাংশই ডায়েরী হইতে লিখিত হইয়াছে। যেখানে স্মৃতি হইতে লেখা হইয়াছে, সেই সকল স্থান স্বামিজীর গুরুভ্রাতৃগণ ও শিষ্যবর্গকে (যাঁহাদের সম্মুখে প্রসঙ্গোক্ত বিষয় সকল স্বামিজী ঐ ভাবে বলিয়াছিলেন) দেখাইয়া, তাঁহাদের দ্বারা প্রসঙ্গের সত্যতা পরীক্ষা করাইয়া ছাপান হইয়াছে। সুতরাং

এই সকল প্রসঙ্গে কোনরূপ ভ্রম প্রমাদ আছে বলিয়া শিষ্যের
নাই। এই প্রসঙ্গের পঠন-পাঠন দ্বারা যদি কাহারও কল্যাণ
হয়, তবেই শিষ্য আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিবে।

প্রকাশ থাকে যে, এই "স্বামি-শিষ্য-সংবাদের' সমং
(entire right) শিষ্য বেলুড়-মঠের ট্রাষ্টি-(Trustee)
দান করিয়াছে। ইহার সমগ্র আয় স্বামিজীর সমাধিমা
ব্যয়সঙ্কুলানে ব্যয়িত হইবে; এবং অতঃপর যাহা উদ্বৃত্ত থ
তাহা রামকৃষ্ণ-মঠের সেবাকল্পে ব্যয়িত হইবে। গ্র
প্রকাশিত হইলে, ইহার উত্তরোত্তর সমগ্র সংস্করণে শি
সংসারসম্পর্কে শিষ্যের দায়াদগণের কোনরূপ দাবী থাকিল
থাকিবে না। ইতি—

গ্রন্থকা

মাঘ, ১৩১৯

সূচীপত্র

উত্তর কাণ্ড—কাল, ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ।

স্বামি-শিষ্য সংবাদ

(উত্তর কাণ্ড)

প্রথম বল্লী

স্থান—বেলুড় মঠ (নির্ম্মাণকালে)

বর্ষ—১৮৯৮

বিষয়

ভারতের উন্নতির উপায় কি ?

পরার্থে কর্ম্মানুষ্ঠান বা কর্ম্মযোগ

শিষ্য। স্বামিজী, আপনি এদেশে বক্তৃতা দেন না কেন ? বক্তৃতা-প্রভাবে ইউরোপ আমেরিকা মাতাইয়া আসিলেন ; কিন্তু ভারতে ফিরিয়া আপনার ঐ বিষয়ে উদ্যম ও অনুরাগ যে কেন কমিয়া গিয়াছে, তাহার কারণ বুঝিতে পারি না। পাশ্চাত্যদেশসকলের অপেক্ষা এখানেই আমাদিগের বিবেচনায়, ঐরূপ উদ্যমের অধিক প্রয়োজন।

স্বামিজী। এদেশে আগে Ground (জমি) তৈরী করতে হবে। তবে বীজ ফেল্‌লে গাছ হবে। পাশ্চাত্যের মাটীই এখন বীজ ফেল্‌বার উপযুক্ত, খুব উর্ব্বরা। ওদেশের লোকেরা এখন ভোগের শেষ সীমায় উঠেছে। ভোগে

তৃপ্ত হয়ে এখন তাদের মন তাতে আর শান্তি পাচ্ছে না। একটা দারুণ অভাব বোধ কর্‌ছে। তোদের দেশে না আছে ভোগ, না আছে যোগ। ভোগের ইচ্ছা কতকটা তৃপ্ত হলে, তবে লোকে যোগের কথা শোনে ও বোঝে। অন্নাভাবে ক্ষীণ দেহ, ক্ষীণ মন, রোগ-শোক-পরিতাপের জন্মভূমি ভারতে লেক্‌চার ফেক্‌চার দিয়ে কি হবে?

শিষ্য। কেন, আপনিই ত কখন কখন বলিয়াছেন, এদেশ ধর্ম্ম-ভূমি! এদেশে লোকে যেমন ধর্ম্মকথা বুঝে ও কার্য্যতঃ ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, অন্যদেশে সেরূপ নহে। তবে আপনার জ্বলন্ত বাগ্মিতায় কেন না দেশ মাতিয়া উঠিবে—কেন না ফল হইবে?

স্বামিজী। ওরে ধর্ম্মকর্ম্ম কর্‌তে গেলে, আগে কূর্ম্মাবতারের পূজা চাই; পেট হচ্ছেন সেই কূর্ম্ম। এঁকে আগে ঠাণ্ডা না কল্লে, তোর ধর্ম্মকর্ম্মের কথা কেউ নেবে না। দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ না, পেটের চিন্তাতেই ভারত অস্থির! বিদেশীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বাণিজ্যে অবাধ রপ্তানি, সর্ব্বাপেক্ষা তোদের পরস্পরের ভিতর ঘৃণিত দাসসুলভ ঈর্ষাই তোদের দেশের অস্থি মজ্জা খেয়ে ফেলেছে। ধর্ম্মকথা শুনাতে হলে আগে এদেশের লোকের পেটের চিন্তা দূর করতে হবে। নতুবা শুধু লেক্‌চার্ ফেক্‌চারে বিশেষ কোন ফল হবে না।

শিষ্য। তবে আমাদের এখন কি করা প্রয়োজন?

স্বামিজী। প্রথমতঃ কতকগুলি ত্যাগী পুরুষের প্রয়োজন—যারা নিজেদের সংসারের জন্য না ভেবে পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হবে। আমি মঠ স্থাপন করে কতকগুলি বাল-সন্ন্যাসীকে তাই ঐরূপে তৈরী কচ্ছি। শিক্ষা শেষ হলে, এরা দ্বারেদ্বারে গিয়ে সকলকে তাদের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার বিষয় বুঝিয়ে বলবে, ঐ অবস্থার উন্নতি কিরূপে হতে পারে সে বিষয়ে উপদেশ দেবে, আর, সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের মহান্ সত্যগুলি সোজা কথায় জলের মত পরিষ্কার করে তাদের বুঝিয়ে দেবে। তোদের দেশের Mass of People (জনসাধারণ) যেন একটা Sleeping Leviathan (একটা বিরাট জানোয়ার, ঘুমিয়ে রয়েছে)! এদেশের এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, এতে শতকরা বড় জোর একজন কি দুইজন দেশের লোক শিক্ষা পাচ্ছে। যারা পাচ্ছে—তারাও দেশের হিতের জন্য কিছু করে উঠতে পারছে না। কি করেই বা বেচারি করবে বল? কলেজ থেকে বেরিয়েই দেখে, সে সাত ছেলের বাপ্! তখন যা তা করে একটা কেরানীগিরি, বড় জোর একটা ডেপুটীগিরি জুটিয়ে নেয়। ওই হল শিক্ষার পরিণাম! তারপর সংসারের ভারে উচ্চকর্ম্ম উচ্চচিন্তা করবার তাদের আর সময় কোথায়? তার নিজের স্বার্থই সিদ্ধ হয় না,—পরার্থে সে আবার কি করবে?

শিষ্য। তবে কি আমাদের উপায় নাই?

স্বামিজী। অবশ্য আছে। এ সনাতন ধর্ম্মের দেশ। এদেশ পড়ে গেছে বটে, কিন্তু নিশ্চয়ই আবার উঠ্‌বে। এমন উঠ্‌বে যে জগৎ দেখে অবাক্ হয়ে যাবে। দেখিস নি?—নদী বা সমুদ্রে তরঙ্গ যত নামে, ঢেউটা তারপর তত জোরে ওঠে—এখানেও সেইরূপ হবে। দেখ্‌ছিস্ না, পূর্ব্বাকাশে অরুণোদয় হয়েছে, সূর্য্য ওঠবার আর বিলম্ব নেই। তোরা এই সময়ে কোমর বেঁধে লেগে যা—সংসার ফংসার করে কি হবে? তোদের এখন কাজ হচ্ছে দেশেদেশে গাঁয়েগাঁয়ে গিয়ে দেশের লোকদের বুঝিয়ে দেওয়া যে, আর আলিস্যি করে বসে থাক্‌লে চলছে না! শিক্ষাহীন, ধর্ম্মহীন বর্ত্তমান অবনতিটার কথা তাদের বুঝিয়ে দিয়ে বল্‌গে—"ভাই সব ওঠ, জাগ, কত দিন আর ঘুমুবে?" আর, শাস্ত্রের মহান্ সত্যগুলি সরল করে তাদের বুঝিয়ে দিগে। এতদিন এ দেশের ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্মটা একচেটে করে বসে ছিল। কালের স্রোতে তা যখন আর টিক্‌লো না, তখন সেই ধর্ম্মটা দেশের সকল লোকে যাতে পায়, তার ব্যবস্থা কর্‌গে। সকলকে বোঝাগে ব্রাহ্মণদের ন্যায় তোমাদেরও ধর্ম্মে সমানাধিকার। আচণ্ডালকে এই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কর্। আর সোজা কথায় তাদের ব্যবসা বাণিজ্য কৃষি প্রভৃতি গৃহস্থ-জীবনের অত্যাবশ্যক বিষয়গুলি উপদেশ দিগে। নতুবা তোদের লেখা পড়াকেও ধিক্—আর তোদের বেদবেদান্ত পড়াকেও ধিক্!

শিষ্য। মহাশয়, আমাদের সে শক্তি কোথায়? আপনার শতাংশের একাংশ শক্তি থাকিলে, নিজেও ধন্য হইতাম, অপরকেও ধন্য করিতে পারিতাম।

স্বামিজী। দূর মূর্খ! শক্তি ফক্তি কেউ কি দেয়? ও তোর ভেতরেই রয়েছে, সময় হলেই আপনা আপনি বেরিয়ে পড়্‌বে। তুই কাজে লেগে যা না; দেখ্‌বি এত শক্তি আস্‌বে যে সামলাতে পারবি নি। পরার্থে এতটুকু কাজ কর্‌লে ভিতরেব শক্তি জেগে ওঠে; পরের জন্য এতটুকু ভাব্‌লে, ক্রমে হৃদয়ে সিংহবলের সঞ্চার হয়। তোদের এত ভালবাসি; কিন্তু ইচ্ছা হয় তোরা পরের জন্য খেটে খেটে মরে যা—আমি দেখে খুসী হই।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, যাহারা আমার উপর নির্ভর করিতেছে, তাহাদের কি হইবে?

স্বামিজী। তুই যদি পরের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হস্, ত ভগবান তাদের একটা উপায় কর্‌বেনই কর্‌বেন। "নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি," গীতায় পড়েছিস্ ত?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ।

স্বামিজী। ত্যাগই হচ্ছে আসল কথা—ত্যাগী না হলে কেউ পরের জন্য ষোল আনা প্রাণ দিয়ে কাজ করতে পারে না। ত্যাগী সকলকে সমভাবে দেখে—সকলের সেবায় নিযুক্ত হয়। বেদান্তেও পড়েছিস্, সকলকে সমান-ভাবে দেখ্‌তে হবে; তবে একটি স্ত্রী ও কয়েকটি ছেলেকে বেশী আপনার বলে ভাব্‌বি কেন? তোর

দোরে স্বয়ং নারায়ণ কাঙ্গাল বেশে এসে অনাহারে মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে রয়েছেন! তাঁকে কিছু না দিয়ে, খালি নিজের ও নিজের স্ত্রী-পুত্রদেরই উদর নানাপ্রকার চর্ব্ব্য চোষ্য দিয়ে পূর্ত্তি করা—সে ত পশুর কাজ।

শিষ্য। মহাশয়, পরার্থে কার্য্য করিতে সময়ে সময়ে বহু অর্থের প্রয়োজন হয়। তাহা কোথায় পাইব?

স্বামিজী। বলি, যতটুকু ক্ষমতা আছে ততটুকুই আগে কর্ না। পয়সার অভাবে যদি কিছু নাই দিতে পারিস্—একটা মিষ্টি কথা বা দুটো সৎ উপদেশও ত তাদের শোনাতে পারিস্! না—তাতেও তোর টাকার দরকার?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ, তা পারি।

স্বামিজী। 'হাঁ পারি' কেবল মুখে বল্লে হচ্ছে না। কি পারিস্—তা কাজে আমায় দেখা, তবেত জান্‌ব—আমার কাছে আসা সার্থক। লেগে যা—কদিনের জন্য জীবন? জগতে যখন এসেছিস্, তখন একটা দাগ রেখে যা। নতুবা গাছ পাথরও ত হচ্ছে মর্‌ছে—ঐরূপ জন্মাতে মরতে মানুষের কখন ইচ্ছা হয় কি? আমায় কাজে দেখা যে, তোর বেদান্ত পড়া সার্থক হয়েছে। সকলকে এই কথা শোনাগে—"তোমাদের ভিতর অনন্ত শক্তি রয়েছে, সেই শক্তিকে জাগিয়ে তোল।" নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে?—মুক্তি কামনাও ত মহা স্বার্থপরতা। ফেলে দে ধ্যান—ফেলে দে মুক্তি ফুক্তি—আমি যে কাজে লেগেছি, সেই কাজে লেগে যা।

শিষ্য অবাক্ হইয়া শুনিতে লাগিল। স্বামিজী পুনরায় বলিতে লাগিলেন—

তোরা ঐরূপে আগে জমি তৈরী কর্‌গে। আমার মত হাজার হাজার বিবেকানন্দ পরে বক্তৃতা কর্‌তে নরলোকে শরীর ধারণ কর্‌বে ; তার জন্য ভাবনা নেই। এই দেখ্‌না, আমাদের (শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্যদিগের) ভিতরে যারা আগে ভাবতো—তাদের কোন শক্তি নেই, তারাই এখন অনাথ-আশ্রম, দুর্ভিক্ষ-ফণ্ড কত কি খুল্‌ছে! দেখ্‌ছিস না—নিবেদিতা, ইংরেজের মেয়ে হয়েও, তোদের সেবা কর্‌তে শিখেছে? আর তোরা তোদের নিজের দেশের লোকের জন্য তা কর্‌তে পার্‌বিনি? যেখানে মহামারী হয়েছে, যেখানে জীবের দুঃখ হয়েছে, যেখানে দুর্ভিক্ষ হয়েছে—চলে যা সেদিকে। নয়—মরেই যাবি। তোর আমার মত কত কীট হচ্ছে মরছে। তাতে জগতের কি আস্‌ছে যাচ্ছে? একটা মহান্ উদ্দেশ্য নিয়ে মরে যা। মরে ত যাবিই ; তা ভাল উদ্দেশ্য নিয়েই মরা ভাল! এই ভাব ঘরে ঘরে প্রচার কর, নিজের ও দেশের মঙ্গল হবে। তোরাই দেশের আশা ভরসা। তোদের কর্ম্মহীন দেখ্‌লে আমার বড় কষ্ট হয়। লেগে যা—লেগে যা। দেরি করিস্ নি—মৃত্যু ত দিন দিন নিকটে আস্‌ছে! পরে কর্‌বি বলে আর বসে থাকিস্‌নি—তা হলে কিছুই হবে না।

দ্বিতীয় বল্লী

স্থান—বেলুড় মঠ (নির্ম্মাণকালে)

বর্ষ—১৮৯৮

বিষয়

জ্ঞানযোগ ও নির্ব্বিকল্প সমাধি—অভীঃ—
সকলেই একদিন ব্রহ্মবস্তু লাভ করিবে

শিষ্য। স্বামিজী, ব্রহ্ম যদি একমাত্র সত্য বস্তু হন তবে জগতে এত বিচিত্রতা দেখা যায় কেন?

স্বামিজী। ব্রহ্ম বস্তুকে (সত্যই হন বা আর যাই হন) কে জানে বল্? জগৎটাকেই আমরা দেখি ও সত্য বলে দৃঢ় বিশ্বাস করে থাকি। তবে সৃষ্টিগত বৈচিত্র্যটাকে সত্য বলে স্বীকার করে বিচারপথে অগ্রসর হলে কালে একত্বমূলে পৌছান যায়। যদি সেই একত্বে অবস্থিত হতে পার্‌তিস্, তা হলে এই বিচিত্রতাটা দেখ্‌তে পেতিস্ না।

শিষ্য। মহাশয়, যদি একত্বেই অবস্থিত হইতে পারিব, তবে এই প্রশ্নই বা কেন করিব? আমি বিচিত্রতা দেখিয়াই যখন প্রশ্ন করিতেছি, তখন উহাকে সত্য বলিয়া অবশ্য মানিয়া লইতেছি।

স্বামিজী। বেশ কথা। সৃষ্টির বিচিত্রতা দেখে, উহাকে সত্য বলে মেনে নিয়ে, একত্বের মূলানুসন্ধান করাকে শাস্ত্রে

ব্যতিরেকী বিচার বলে। অর্থাৎ অভাব বা অসত্য বস্তুকে ভাব বা সত্য বস্তু বলে ধরে নিয়ে, বিচার করে দেখান যে, সেটা ভাব নয়, অভাব বস্তু। তুই ঐরূপে মিথ্যাকে সত্য বলে ধরে সত্যে পৌঁছানর কথা বল্‌ছিস্—কেমন ?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, তবে আমি ভাবকেই সত্য বলি এবং ভাব-রাহিত্যটাকেই মিথ্যা বলে স্বীকার করি।

স্বামিজী। আচ্ছা। এখন দেখ্, বেদ বল্‌ছে—একমেবাদ্বিতীয়ম্। যদি বস্তুতঃ এক ব্রহ্মই থাকেন, তবে তোর নানাত্ব ত মিথ্যা হচ্ছে ; বেদ মানিস্ ত ?

শিষ্য। বেদের কথা আমি মানি বটে। কিন্তু যদি কেহ না মানে তাহাকেও ত নিরস্ত করিতে হইবে ?

স্বামিজী। তাও হয়। জড়-বিজ্ঞান সহায়ে তাকে প্রথম বেশ করে বুঝিয়ে দেখিয়ে দিতে হয় যে, ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষকেও আমরা বিশ্বাস কর্‌তে পারি না ; ইন্দ্রিয়সকলও ভুল সাক্ষ্য দেয় ; এবং যথার্থ সত্য বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির বাইরে রয়েছে। তারপর তাকে বল্‌তে হয়, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের পারে যাবার উপায় আছে। উহাকেই ঋষিরা যোগ বলেছেন। যোগ অনুষ্ঠান-সাপেক্ষ—উহা হাতে নাতে কর্‌তে হয়। বিশ্বাস কর আর নাই কর, করলেই ফল পাওয়া যায়। করে দেখ্—হয়, কি না হয়। আমি বাস্তবিকই দেখেছি, ঋষিরা যা বলেছেন সব সত্য ! এই দেখ্, তুই যাকে বিচিত্রতা বল্‌ছিস্, তা এক সময় লুপ্ত

হয়ে যায়, অনুভব হয় না। তা আমি নিজের জীবনে ঠাকুরের কৃপায় প্রত্যক্ষ করেছি।

শিষ্য। কখন্ ঐরূপ করিয়াছেন?

স্বামিজী। একদিন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরের বাগানে আমায় ছুঁয়ে দিয়েছিলেন; দেবামাত্র দেখলুম, ঘরবাড়ী, দোর দালান, গাছপালা, চন্দ্র, সূর্য্য—সব যেন আকাশে লয় পেয়ে যাচ্ছে। ক্রমে আকাশও যেন কোথায় লয় পেয়ে গেল—তারপর কি যে প্রত্যক্ষ হয়েছিল, কিছুই স্মরণ নেই; তবে মনে আছে, ঐরূপ দেখে বড় ভয় হয়েছিল—চীৎকার করে ঠাকুরকে বলেছিলুম, 'ওগো তুমি আমার কি কর্‌চ গো, আমার যে বাপ, মা আছে!'—ঠাকুর তাতে হাস্‌তে হাস্‌তে 'তবে এখন থাক' বলে ফের ছুঁয়ে দিলেন। তখন ক্রমে আবার দেখলুম—ঘরবাড়ী, দোর, দালান—যা যেমন সব ছিল, ঠিক সেই রকম রয়েছে! আর একদিন—আমেরিকার একটি lakeএর (হ্রদের) ধারে ঠিক ঐরূপ হয়েছিল।

শিষ্য অবাক্ হইয়া শুনিতেছিল। কিয়ৎ পরে বলিল—আচ্ছা মহাশয়, ঐরূপ অবস্থা মস্তিষ্কের বিকারেও ত হতে পারে? আর এক কথা, ঐ অবস্থাতে আপনার বিশেষ আনন্দ উপলব্ধি হয়েছিল কি?

স্বামিজী। যখন রোগের খেয়াল নয়, নেশা করে নয়, রকম-বেরকমের দম টেনেও নয়, সহজ মানুষের সুস্থাবস্থায় এ অবস্থা হয়ে থাকে, তখন তাকে মস্তিষ্কের বিকার কি

করে বল্‌বি? বিশেষতঃ যখন আবার ঐরূপ অবস্থা-লাভের কথা বেদের সঙ্গে মিল্‌ছে, পূর্ব্বপূর্ব্ব আচার্য্য ও ঋষিগণের আপ্তবাক্যের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। আমায় কি শেষে তুই বিকৃত মস্তিষ্ক ঠাওরালি?

শিষ্য। না মহাশয়, আমি তাহা বলিতেছি না। শাস্ত্রে যখন শতশত এরূপ একত্বানুভূতির দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, আপনি যখন বলিতেছেন যে ইহা করামলকবৎ প্রত্যক্ষসিদ্ধ, আর আপনার অপরোক্ষানুভূতি যখন বেদাদি শাস্ত্রোক্ত বাক্যের অবিসম্বাদী, তখন ইহাকে মিথ্যা বলিতে সাহস হয় না। শ্রীশঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন—ক্ব গতং কেন বা নীতং, ইত্যাদি।

স্বামিজী। জান্‌বি, এই একত্বজ্ঞান—যাকে তোদের শাস্ত্রে ব্রহ্মানু-ভূতি বলে—হলে জীবের আর ভয় থাকে না—জন্মমৃত্যুর পাশ ছিন্ন হয়ে যায়। এই হেয় কামকাঞ্চনে বদ্ধ হয়ে জীব সে ব্রহ্মানন্দ লাভ কর্‌তে পারে না। সেই পরমানন্দ পেলে, জগতের সুখদুঃখে জীব আর অভিভূত হয় না।

শিষ্য। আচ্ছা মহাশয়, যদি তাহাই হয়, এবং আমরা যদি যথার্থ পূর্ণব্রহ্মস্বরূপই হই, তাহা হইলে ঐরূপে সমাধিতে সুখ-লাভে আমাদের যত্ন হয় না কেন? আমরা তুচ্ছ কাম-কাঞ্চনের প্রলোভনে পড়িয়া বারবার মৃত্যুমুখে ধাবমান হইতেছি কেন?

[স্ব]ামিজী। তুই মনে কচ্ছিস্, জীবের সে শান্তিলাভে আগ্রহ নেই বুঝি? একটু ভেবে দেখ্—বুঝতে পার্‌বি, যে যা

কচ্ছে, সে তা ভূমা সুখের আশাতেই করছে। তবে সকলে ঐ কথা বুঝে উঠ্‌তে পারছে না। সে পরমানন্দ লাভের ইচ্ছা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলে পূর্ণভাবে রয়েছে। আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মও সকলের অন্তরের অন্তরে রয়েছেন। তুইও সেই পূর্ণব্রহ্ম। এই মুহূর্ত্তে ঠিক ঠিক ভাবলেই ঐ কথার অনুভূতি হয়। কেবল অনুভূতির অভাব মাত্র। তুই যে চাকরী করে স্ত্রী-পুত্রের জন্য এত খাট্‌ছিস্, তার উদ্দেশ্যও সেই সচ্চিদানন্দলাভ। এই মোহের মারপেঁচে পড়ে ঘা খেয়ে খেয়ে ক্রমশঃ স্বস্বরূপে নজর আস্‌বে। বাসনা আছে বলেই ধাক্কা খাচ্ছিস্ ও খাবি। ঐরূপে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে নিজের দিকে দৃষ্টি পড়্‌বে; সকলেরই এক সময় পড়বেই পড়বে। তবে কারও এ জন্মে—কারও বা লক্ষ জন্মে।

শিষ্য। সে চৈতন্য হওয়া, মহাশয়, আপনার আশীর্ব্বাদ ও ঠাকুরের কৃপা না হইলে কখনও হইবে না।

স্বামিজী। ঠাকুরের কৃপা-বাতাস ত বইছেই। তুই পাল তুলে দেনা! যখন যা করবি, খুব একাত্মমনে করবি। দিনরাত ভাব্‌বি, আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ—আমার আবার ভয় ভাবনা কি? এই দেহ মন বুদ্ধি সবই ক্ষণিক—এর পারে যা তাই আমি।

শিষ্য। ঐ ভাব ক্ষণিক আসিলেও আবার খনি উড়িয়া যায় ও ছাই ভস্ম সংসার ভাবি।

স্বামিজী। ও রকম প্রথম প্রথম হয়ে থাকে। ক্রমে শুধ্‌রে যাবে।

তবে মনের খুব তীব্রতা, ঐকান্তিক ইচ্ছা চাই। ভাব্‌বি যে আমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব, আমি কি কখন অন্যায় কাজ কর্‌তে পারি? আমি কি সামান্য কাম-কাঞ্চনলোভে পড়ে সাধারণ জীবের ন্যায় মুগ্ধ হতে পারি? মনে এমনি করে জোর কর্‌বি। তবে ত ঠিক কল্যাণ হবে।

শিষ্য। মহাশয়, এক একবার মনের বেশ জোর হয়। আবার ভাবি, ডেপুটিগিরির জন্য পরীক্ষা দিব—ধন মান হবে, বেশ মজায় থাক্‌ব।

স্বামিজী। মনে যখন ওসব আস্‌বে, তখনি বিচার কর্‌বি। তুই ত বেদান্ত পড়েছিস্‌?—ঘুমুবার সময়ও বিচারের তরোয়াল-খানা শিয়রে রেখে ঘুমুবি, যেন স্বপ্নেও লোভ সাম্‌নে না এগুতে পারে। এইরূপে জোর করে বাসনা ত্যাগ কর্‌তে কর্‌তে ক্রমে যথার্থ বৈরাগ্য আস্‌বে—তখন দেখ্‌বি, স্বর্গের দ্বার খুলে গেছে।

শিষ্য। আচ্ছা স্বামিজী, ভক্তিশাস্ত্রে যে বলে, বেশী বৈরাগ্য হলে ভাব থাকে না?

স্বামিজী। আরে ফেলে দে তোর সে ভক্তিশাস্ত্র, যাতে ওরকম কথা আছে। বৈরাগ্য! বিষয়বিতৃষ্ণা—না হলে, কাক-বিষ্ঠার ন্যায় কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না কর্‌লে, "ন সিধ্যতি ব্রহ্মশতান্তরেঽপি," ব্রহ্মার কোটীকল্পেও জীবের মুক্তি নেই। জপ, ধ্যান, পূজা, হোম, তপস্যা, কেবল তীব্র বৈরাগ্য আন্‌বার জন্য। তা যার হয়নি, তার জান্‌বি,—

নোঙ্গর ফেলে নৌকোয় দাঁড় টানার মত হচ্ছে! "ন ধনেন ন চেজ্জ্যয়া ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।"

শিষ্য। আচ্ছা মহাশয়, কামকাঞ্চন ত্যাগ হইলেই কি সব হইল?

স্বামিজী। ও দুটো ত্যাগের পরও অনেক লেঠা আছেন! এই যেমন, তারপর আসেন লোকখ্যাতি! সেটা যে সে লোক সাম্‌লাতে পারে না। লোকে মান দিতে থাকে, নানা ভোগ এসে জোটে। এতেই ত্যাগীদের মধ্যে বার আনা লোক বাঁধা পড়ে। এই যে মঠ ফঠ কর্‌ছি, নানা রকমের পরার্থে কাজ করে সুখ্যাতি হচ্ছে—কে জানে, আমাকেই বা আবার ফিরে আস্‌তে হয়!

শিষ্য। মহাশয়, আপনিই ঐ কথা বলিতেছেন—তবে আমরা আর যাই কোথায়?

স্বামিজী। সংসারে রয়েছিস্, তাতে ভয় কি? "অভীরভীরভীঃ"—ভয় ত্যাগ কর্। নাগ মহাশয়কে দেখেছিস্ ত?—সংসারে থেকেও সন্ন্যাসীর বাড়া! এমনটি বড় একটা দেখা যায় না। গেরস্ত যদি কেহ হয় ত, যেন নাগ মহাশয়ের মত হয়। নাগ মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গ আলো করে বসে আছেন। ওদেশের লোকদের বল্‌বি,—যেন তাঁর কাছে যায়। তা হলে তাদের কল্যাণ হবে।

শিষ্য। মহাশয়, যথার্থ কথাই বলিয়াছেন; নাগ মহাশয়কে শ্রীরামকৃষ্ণলীলা-সহচর জীবন্ত দীনতা বলিয়া বোধ হয়!

স্বামিজী। তা একবার বল্‌তে? আমি তাঁকে একবার দর্শন কর্‌তে যাব—তুইও যাবি? জলে ভেসে গেছে, এমন

মাঠ দেখতে আমার এক এক সময়ে বড় ইচ্ছা হয়। আমি যাব। দেখ্‌ব। তুই তাঁকে লিখিস্।

শিষ্য। আমি লিখিয়া দিব। আপনার দেওভোগ যাইবার কথা শুনিলে তিনি আনন্দে উন্মাদপ্রায় হইবেন। বহুপূর্ব্বে আপনার একবার যাইবার কথা হইয়াছিল, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন,—"পূর্ব্ববঙ্গ আপনার চরণধূলিতে তীর্থ হয়ে যাবে।"

স্বামিজী। জানিস্ ত, নাগ মহাশয়কে ঠাকুর বল্‌তেন—'জ্বলন্ত আগুন'।

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ, তা শুনিয়াছি।

স্বামিজী। অনেক রাত হয়েছে, তবে এখন আয়—কিছু খেয়ে যা।

শিষ্য। যে আজ্ঞা।

অনন্তর কিছু প্রসাদ পাইয়া, শিষ্য কলিকাতা যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিল—স্বামিজী কি অদ্ভুত পুরুষ!—যেন সাক্ষাৎ জ্ঞানমূর্ত্তি আচার্য্য শঙ্কর!

তৃতীয় বল্লী

স্থান—বেলুড় মঠ (নির্ম্মাণকালে)

বিষয়

'শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধা ভক্তি এক'—পূর্ণপ্রজ্ঞ না হইলে প্রেমানুভূতি অসম্ভব—যথার্থ জ্ঞান বা ভক্তি যতক্ষণ লাভ হয় নাই, ততক্ষণই বিবাদ,—ধর্ম্মরাজ্যে বর্ত্তমান-ভারতে কিরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য—শ্রীরামচন্দ্র, মহাবীর ও গীতাকার শ্রীকৃষ্ণের পূজা প্রচলন করা আবশ্যক—অবতার মহাপুরুষগণের আবির্ভাব-কারণ ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মাহাত্ম্য।

শিষ্য। স্বামিজী, জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্য কিরূপে হইতে পারে? দেখিতে পাই, ভক্তিপথাবলম্বিগণ আচার্য্য শঙ্করের নাম শুনিলে কানে হাত দেন, আবার জ্ঞান-মার্গীরা ভক্তদের আকুল ক্রন্দন, উল্লাস ও নৃত্যগীতাদি দেখিয়া বলেন, ওরা পাগলবিশেষ।

স্বামিজী। কি জানিস্, গৌণজ্ঞান ও গৌণভক্তি নিয়েই কেবল বিবাদ উপস্থিত হয়। ঠাকুরের সেই ভূত-বানরের গল্প শুনেছিস ত?*

---

* শিবরামের যুদ্ধ হইয়াছিল। এখানে রামের গুরু শিব ও শিবের গুরু রাম; সুতরাং যুদ্ধের পরে দুজনে ভাবও হইল। কিন্তু শিবের চেলা ভূতপ্রেত-গুলির আর রামের সঙ্গী বানরগুলির মধ্যে ঝগড়া কিচকিচি সেই দিন হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত মিটিল না।

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ।

স্বামিজী। কিন্তু মুখ্যা ভক্তি ও মুখ্য জ্ঞানে কোন প্রভেদ নেই। মুখ্যা ভক্তি মানে হচ্ছে —ভগবানকে প্রেমস্বরূপে উপলব্ধি করা। তুই যদি সর্ব্বত্র সকলের ভিতরে ভগবানের প্রেমমূর্ত্তি দেখ্‌তে পাস্‌ ত কার উপর আর হিংসা দ্বেষ কর্‌বি? সেই প্রেমানুভূতি, এতটুকু বাসনা—বা ঠাকুর যাকে বলতেন কামকাঞ্চনাসক্তি—থাক্‌তে হবার যো নেই। সম্পূর্ণ প্রেমানুভূতিতে দেহবুদ্ধি পর্য্যন্ত থাকে না। আর মুখ্য জ্ঞানের মানে হচ্ছে সর্ব্বত্র একত্বানুভূতি, আত্মস্বরূপের সর্ব্বত্র দর্শন। তাও এতটুকু অহংবুদ্ধি থাকৃতে হবার যো নেই।

শিষ্য। তবে আপনি যাহাকে প্রেম বলেন, তাহাই কি পরমজ্ঞান?

স্বামিজী। তা বই কি! পূর্ণপ্রজ্ঞ না হলে কারও প্রেমানুভূতি হয় না। দেখ্‌ছিস্‌ ত বেদান্তশাস্ত্রে ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ বলে। ঐ সচ্চিদানন্দ শব্দের মানে হচ্ছে—সৎ অর্থাৎ অস্তিত্ব; চিৎ অর্থাৎ চৈতন্য বা জ্ঞান; আর আনন্দ বা প্রেম। ভগবানের সৎ ভাবটি নিয়ে ভক্ত ও জ্ঞানীর মধ্যে কোন বিবাদ বিসম্বাদ নেই। কিন্তু জ্ঞানমার্গী ব্রহ্মের চিৎ বা চৈতন্য সত্তাটির উপরেই সর্ব্বদা বেশী ঝোঁক দেয়, আর ভক্তগণ আনন্দ সত্তাটিই সর্ব্বক্ষণ নজরে রাখে। কিন্তু চিৎস্বরূপ অনুভূতি হবামাত্র তখনি আনন্দস্বরূপেরও উপলব্ধি হয়। কারণ, যাহা চিৎ তাহাই যে আনন্দ।

শিষ্য। তবে ভারতবর্ষে এত সাম্প্রদায়িক ভাব প্রবল কেন; এবং ভক্তি ও জ্ঞান-শাস্ত্রেই বা এত বিরোধ কেন?

স্বামিজী। কি জানিস্, গৌণভাব নিয়েই অর্থাৎ যে ভাবগুলো ধরে মানুষ ঠিক জ্ঞান বা ঠিক ভক্তি লাভ কর্‌তে অগ্রসর হয়, সেইগুলো নিয়েই যত লাঠালাঠি দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কিন্তু তোর কি বোধ হয়? End (উদ্দেশ্য) বড়, কি means (উপায়গুলো) বড়? নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য হতে উপায় কখন বড় হতে পারে না। কেন না, অধিকারি-ভেদে একই উদ্দেশ্য লাভ নানাবিধ উপায়ে হয়। এই যে দেখ্‌ছিস্ জপ ধ্যান পূজা হোম ইত্যাদি ধর্ম্মের অঙ্গ, এগুলি সবই হচ্ছে উপায়। আর পরাভক্তি বা পরব্রহ্মস্বরূপকে দর্শনই হচ্ছে মুখ্য উদ্দেশ্য। অতএব একটু তলিয়ে দেখ্‌লেই বুঝতে পার্‌বি—বিবাদ হচ্ছে কি নিয়ে। একজন বল্‌ছেন, পূবমুখো হয়ে বসে ভগবানকে ডাক্‌লে তবে তাঁকে পাওয়া যায়; আর এক জন বল্‌ছেন, না, পশ্চিমমুখো হয়ে বস্‌তে হবে, তবেই তাঁকে পাওয়া যাবে। হয় ত একজন বহুকাল পূর্ব্বে পূবমুখো হয়ে বসে ধ্যান ভজন করে ঈশ্বরলাভ করে-ছিলেন; তাঁর চেলারা তাই দেখে অমনি ঐ মত চালিয়ে দিয়ে বল্‌তে লাগ্‌লো, পূবমুখো হয়ে না বস্‌লে ঈশ্বরলাভ কখনই হবে না। আর একদল বল্‌লে, সে কি কথা?—পশ্চিমুখো বসে অমুক ভগবান্ লাভ করেছে, আমরা শুনেছি যে?—আমরা তোদের ঐ মত মানি

না। এইরূপে সব দল বেঁধেছে। একজন হয়ত হরিনাম জপ করে পরাভক্তি লাভ করেছিলেন; অমনি শাস্ত্র তৈরী হল, "নাস্ত্যেব গতিরন্যথা"। কেউ আবার আল্লা বলে সিদ্ধ হলেন, তখনি তার আর এক মত চল্‌তে লাগ্‌ল। আমাদের এখন দেখতে হবে, এই সকল জপ, পূজাদির থেই (আরম্ভ) কোথায়? সে থেই হচ্ছে শ্রদ্ধা; সংস্কৃতভাষার 'শ্রদ্ধা' কথাটি বুঝাবার মত শব্দ আমাদের ভাষায় নেই। উপনিষদে আছে, ঐ শ্রদ্ধা নচিকেতার হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল। 'একাগ্রতা' কথাটির দ্বারাও শ্রদ্ধা কথার সমুদয় ভাবটুকু প্রকাশ করা যায় না। বোধ হয় 'একাগ্রনিষ্ঠা' বল্‌লে সংস্কৃত শ্রদ্ধা কথাটার অনেকটা কাছাকাছি মানে হয়। নিষ্ঠার সহিত একাগ্র মনে যে কোন তত্ত্ব হোক্ না, ভাব্‌তে থাকলেই দেখতে পাবি, মনের গতি ক্রমেই একত্বের দিকে চলেছে বা সচ্চিদানন্দ স্বরূপের অনুভূতির দিকে যাচ্ছে। ভক্তি এবং জ্ঞান-শাস্ত্র উভয়েই ঐরূপ এক একটি নিষ্ঠা জীবনে আন্‌বার জন্য মানুষকে বিশেষ-ভাবে উপদেশ কর্‌ছে। যুগপরম্পরায় বিকৃত ভাব ধারণ করে সেই সকল মহান্ সত্য ক্রমে দেশাচারে পরিণত হয়েছে। শুধু যে তোদের ভারতবর্ষে ঐরূপ হয়েছে তা নয়—পৃথিবীর সকল জাতিতে ও সকল সমাজেই ঐরূপ হয়েছে। আর, বিচারবিহীন সাধারণ জীব, ঐগুলো নিয়ে সেই অবধি বিবাদ করে মর্‌ছে।

থেই হারিয়ে ফেলেছে; তাই এত লাঠালাঠি চলেছে।

শিষ্য। মহাশয়, তবে এখন উপায় কি?

স্বামিজী। পূর্ব্বের মত ঠিক ঠিক শ্রদ্ধা আন্‌তে হবে। আগাছা-গুলো উপ্‌ড়ে ফেল্‌তে হবে। সকল মতে সকল পথেই দেশকালাতীত সত্য পাওয়া যায় বটে; কিন্তু সেগুলোর উপর অনেক আবর্জ্জনা পড়ে গেছে। সেগুলি সাফ করে ঠিক ঠিক তত্ত্বগুলি লোকের সামনে ধরতে হবে; তবেই তোদের ধর্ম্মের ও দেশের মঙ্গল হবে।

শিষ্য। কেমন করিয়া উহা করিতে হইবে?

স্বামিজী। কেন? প্রথমতঃ মহাপুরুষদের পূজা চালাতে হবে। যাঁরা সেই সব সনাতন তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করে গেছেন, তাঁদের লোকের কাছে Ideal (আদর্শ বা ইষ্ট) রূপে খাড়া করতে হবে। যেমন ভারতবর্ষে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, মহাবীর ও শ্রীরামকৃষ্ণ। দেশে শ্রীরামচন্দ্র, ও মহাবীরের পূজা চালিয়ে দে দিকি? বৃন্দাবনলীলা ফীলা এখন রেখে দে। গীতাসিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা চালা; শক্তিপূজা চালা।

শিষ্য। কেন, বৃন্দাবনলীলা মন্দ কি?

স্বামিজী। এখন শ্রীকৃষ্ণের ঐরূপ পূজায় তোদের দেশে ফল হবে না। বাঁশি বাজিয়ে এখন আর দেশের কল্যাণ হবে না। এখন চাই মহাত্যাগ, মহানিষ্ঠা, মহাধৈর্য্য

এবং স্বার্থগন্ধশূন্য শুদ্ধবুদ্ধি-সহায়ে মহা উদ্যম প্রকাশ করে সকল বিষয় ঠিক ঠিক জান্‌বার জন্য উঠে পড়ে লাগা।

শিষ্য। মহাশয়, তবে আপনার মতে বৃন্দাবনলীলা কি সত্য নহে?

স্বামিজী। তা কে বল্‌ছে? ঐ লীলার ঠিক ঠিক ধারণাও উপলব্ধি কর্‌তে বড় উচ্চ সাধনার প্রয়োজন। এই ঘোর কাম-কাঞ্চনাসক্তির সময় ঐ লীলার উচ্চ ভাব কেউ ধারণা কর্‌তে পারবে না।

শিষ্য। মহাশয়, তবে কি আপনি বলিতে চাহেন, যাহারা মধুর-সখ্যাদি ভাব অবলম্বনে এখন সাধনা করিতেছে, তাহারা কেহই ঠিক পথে যাইতেছে না?

স্বামিজী। আমার ত বোধ হয় তাই—বিশেষতঃ আবার যারা মধুর ভাবের সাধক বলে পরিচয় দেয়, তারা; তবে দুই একটি ঠিক ঠিক লোক থাক্‌লেও থাক্‌তে পারে। বাকী সব জান্‌বি—ঘোর তমোভাবাপন্ন—full of morbidity (অস্বাভাবিক মানসিক দুর্ব্বলতা-সমাচ্ছন্ন)! তাই বল্‌ছি,—দেশটাকে এখন তুলতে হলে মহাবীরের পূজা চালাতে হবে, শক্তিপূজা চালাতে হবে; শ্রীরামচন্দ্রের পূজা ঘরে ঘরে কর্‌তে হবে। তবে তোদের ও দেশের কল্যাণ। নতুবা উপায় নেই।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, শুনিয়াছি, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব ত সকলকে লইয়া সংকীর্ত্তনে বিশেষ আনন্দ করিতেন।

স্বামিজী। তাঁর কথা স্বতন্ত্র। তাঁর সঙ্গে জীবের তুলনা হয়?

তিনি সব মতে সাধন করে দেখিয়েছেন, সকলগুলিই এক তত্ত্বে পৌঁছে দেয়। তিনি যা করেছেন, তা কি তুই আমি কর্‌তে পার্‌ব? তিনি যে কে ও কত বড়, তা আমরা কেউই এখনও বুঝতে পারি নি! এজন্যই আমি তাঁর কথা যেখানে সেখানে বলি না। তিনি যে কি ছিলেন, তা তিনিই জান্‌তেন; তাঁর দেহটাই কেবল মানুষের মত ছিল; কিন্তু চাল চলন সব স্বতন্ত্র অমানুষিক ছিল!

শিষ্য। আচ্ছা মহাশয়, আপনি তাঁহাকে অবতার বলিয়া মানেন কি?

স্বামিজী। তোর অবতার কথার মানেটা কি?—তা আগে বল্।

শিষ্য। কেন? যেমন শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ, বুদ্ধ, ঈশা ইত্যাদি পুরুষের ন্যায় পুরুষ।

স্বামিজী। তুই যাদের নাম কর্‌লি, আমি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে তাদের সকলের চেয়ে বড় বলে জানি—মানা ত ছোট কথা—জানি। থাক্ এখন সে কথা, এইটুকুই এখন শুনে রাখ্—সময় ও সমাজ উপযোগী এক এক মহাপুরুষ আসেন—ধর্ম্ম উদ্ধার কর্‌তে; তাঁদের মহা-পুরুষ বল্, বা অবতার বল্, তাতে কিছু আসে যায় না। তাঁরা সংসারে এসে জীবকে নিজ জীবন গঠন করবার Ideal (আদর্শ) দেখিয়ে যান্। যিনি যখন আসেন, তখন তাঁর ছাঁচে গড়ন চল্‌তে থাকে, মানুষ তৈরী হয়, ও সম্প্রদায় চল্‌তে থাকে। কালে ঐ সকল সম্প্রদায়

বিকৃত হলে, আবার ঐরূপ অন্য সংস্কারক আসেন ; এই প্রথা প্রবাহরূপে চলে আস্‌ছে।

শিষ্য। মহাশয়, তবে আপনি ঠাকুরকে অবতার বলে ঘোষণা করেন না কেন? আপনার ত শক্তি, বাগ্মিতা যথেষ্ট আছে।

স্বামিজী। তার কারণ, আমি তাঁকে অল্পই বুঝেছি। তাঁকে অত বড় মনে হয় যে, তাঁর সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে গেলে আমার ভয় হয়, পাছে সত্যের অপলাপ হয়; পাছে আমার এই অল্পশক্তিতে না কুলোয়; বড় কর্‌তে গিয়ে, তাঁর ছবি আমার ঢঙে এঁকে, তাঁকে পাছে ছোট করে ফেলি!

শিষ্য। কিন্তু আজকাল অনেকে ত তাঁহাকে অবতার বলিয়া প্রচার করিতেছে।

স্বামিজী। তা করুক্। যে যেমন বুঝেছে, সে তেমন কর্‌ছে। তোর ঐরূপ বিশ্বাস হয় ত তুইও কর্।

শিষ্য। আমি আপনাকেই সম্যক্ বুঝিতে পারি না, তা আবার ঠাকুরকে? মনে হয়, আপনার কৃপাকণা পাইলেই আমি এ জন্মে ধন্য হইব!

অদ্য এইখানেই কথার পরিসমাপ্তি হইল এবং শিষ্য স্বামিজীর পদধূলি লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

চতুর্থ বল্লী

স্থান—বেলুড় মঠ (নির্ম্মাণকালে)

বর্ষ—১৮৯৮

বিষয়

ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে, কামকাঞ্চনাসক্তি ত্যাগ করা গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী উভয়ের পক্ষেই সমভাবে প্রয়োজন—কৃপাসিদ্ধ কাহাকে বলে- দেশকালনিমিত্তের অতীত রাজ্যে কে কাহাকে কৃপা করিবে।

শিষ্য। স্বামিজী, ঠাকুর বলিতেন, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না করিলে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়া যায় না। তবে যাহারা গৃহস্থ তাহাদের উপায় কি? তাহাদের ত দিনরাত ঐ উভয় লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে হয়?

স্বামিজী। কামকাঞ্চনের আসক্তি না গেলে, ঈশ্বরে মন যায় না; তা গেরস্তই হোক্ আর সন্ন্যাসীই হোক্। ঐ দুই বস্তুতে যতক্ষণ মন আছে, জান্‌বি, ততক্ষণ ঠিক ঠিক অনুরাগ, নিষ্ঠা বা শ্রদ্ধা কখনই আস্‌বে না।

শিষ্য। তবে গৃহস্থদিগের উপায়?

স্বামিজী। উপায় হচ্ছে, ছোট খাট বাসনাগুলিকে পূর্ণ করে নেওয়া, আর বড় বড় গুলিকে বিচার করে ত্যাগ করা। ত্যাগ ভিন্ন ঈশ্বরলাভ হবে না—"যদি ব্রহ্মা

স্বয়ং বদেৎ”—(বেদকর্ত্তা ব্রহ্মা স্বয়ং উহা বলিলেও হইবে না।)

শিষ্য। আচ্ছা মহাশয়, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই কি বিষয় ত্যাগ হয়?

স্বামিজী। তা কি কখন হয়?—তবে সন্ন্যাসীরা কামকাঞ্চন সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ কর্‌তে প্রস্তুত হচ্ছে, চেষ্টা কর্‌ছে, আর গেরস্তরা নোঙ্গর ফেলে নৌকায় দাঁড় টান্‌ছে—এই প্রভেদ। ভোগের সাধ কখন মেটে কি রে? “ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে”—দিন দিন বাড়্‌তেই থাকে।

শিষ্য। কেন? ভোগ করিয়া করিয়া বিরক্ত হইলে শেষে ত বিতৃষ্ণা আসিতে পারে?

স্বামিজী। দূর ছোঁড়া, তা কজনের আস্‌তে দেখেছিস্‌? ক্রমাগত বিষয় ভোগ করতে থাক্‌লে, মনে সেই সব বিষয়ের ছাপ পড়ে যায়—দাগ পড়ে যায়—মন বিষয়ের রঙে রোঙে যায়। ত্যাগ—ত্যাগ—এই হচ্ছে মূলমন্ত্র।

শিষ্য। কেন মহাশয়, ঋষিবাক্য ত আছে—“গৃহেষু পঞ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহস্তপঃ, নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্‌”—গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া ইন্দ্রিয় সকলকে বিষয় অর্থাৎ রূপরসাদি ভোগ হইতে বিরত রাখাকেই তপস্যা বলে; বিষয়ের প্রতি অনুরাগ দূর হইলে, গৃহই তপোবনে পরিণত হয়।

স্বামিজী। গৃহে থেকে যারা কামকাঞ্চন ত্যাগ করতে পারে, তারা ধন্য; কিন্তু তা কয় জনের হয়?

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, আপনি ত ইতিপূর্ব্বেই বলিলেন যে, সন্ন্যাসীদের মধ্যেও অধিকাংশের সম্পূর্ণরূপে কামকাঞ্চন-ত্যাগ হয় নাই ?

স্বামিজী। তা বলেছি ; কিন্তু একথাও বলেছি যে, তারা ত্যাগের পথে চলেছে, তারা কামকাঞ্চনের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে। গেরস্তদের কামকাঞ্চনাসক্তিটাকে এখনও বিপদ বলেই ধারণা হয়নি, আত্মোন্নতির চেষ্টাই হচ্ছে না। ওটার বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করতে হবে, এ ভাবনাই এখনও আসে নাই।

শিষ্য। কেন মহাশয়, তাহাদিগের মধ্যেও ত অনেকে ঐ আসক্তি ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিতেছে ?

স্বামিজী। যারা কর্‌ছে তারা অবশ্য ক্রমে ত্যাগী হবে ; তাদেরও কামকাঞ্চনাসক্তি ক্রমে কমে যাবে। কিন্তু কি জানিস্—'যাচ্ছি যাব' 'হচ্ছে হবে' যারা এইরূপে চলেছে, তাদের আত্মদর্শন এখনও অনেক দূরে। "এখনি ভগবান লাভ কর্‌ব, এই জন্মেই কর্‌ব"—এই হচ্ছে বীরের কথা। ঐরূপ লোকে এখনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ কর্‌তে প্রস্তুত হয় ; শাস্ত্র তাদের সম্বন্ধেই বলেছেন—"যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ"—যখনি বৈরাগ্য আস্‌বে, তখনি সংসার ত্যাগ কর্‌বে।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, ঠাকুর ত বলিতেন, ঈশ্বরের কৃপা হইলে, তাঁহাকে ডাকিলে তিনি এই সকল আসক্তি এক দণ্ডে কাটাইয়া দেন।

স্বামিজী। হাঁ, তাঁর কৃপা হলে হয় বটে, কিন্তু তাঁর কৃপা পেতে হলে আগে শুদ্ধ, পবিত্র হওয়া চাই; কায়মনোবাক্যে পবিত্র হওয়া চাই; তবেই তাঁর কৃপা হয়।

শিষ্য। কিন্তু কায়মনোবাক্যে সংযম করিতে পারিলে, কৃপার আর দরকার কি? তাহা হইলে ত আমি নিজেই নিজের চেষ্টায় আত্মোন্নতি করিলাম।

স্বামিজী। তুই প্রাণপণে চেষ্টা কচ্ছিস্ দেখে, তবে তাঁর কৃপা হয়। Struggle (উদ্যম বা পুরুষকার) না করে বসে থাক্, দেখ্‌বি কখনও কৃপা হবে না।

শিষ্য। ভাল হইব, ইহা বোধ হয় সকলেরই ইচ্ছা; কিন্তু কি দুর্লক্ষ্য সূত্রে যে মন নীচগামী হয়, তাহা বলিতে পারি না; সকলেরই কি মনে ইচ্ছা হয় না যে, আমি সৎ হইব—ভাল হইব—ঈশ্বর লাভ করিব?

স্বামিজী। যাদের ভেতর ওরূপ ইচ্ছা হয়েছে, তাদেরই ভেতরে জান্‌বি Struggle (ঐরূপ হইবার চেষ্টা) এসেছে, এবং ঐ চেষ্টা কর্‌তে কর্‌তেই ঈশ্বরের দয়া হয়।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, অনেক অবতারে ত ইহাও দেখা যায়, যাহাদের আমরা ভয়ানক পাপী ব্যভিচারী ইত্যাদি মনে করি, তাহারাও সাধন ভজন না করিয়া তাঁহাদের কৃপায় অনায়াসে ঈশ্বর লাভে সক্ষম হইয়াছিল—ইহার অর্থ কি?

স্বামিজী। জান্‌বি, তাদের ভেতর ভয়ানক অশান্তি এসেছিল; ভোগ কর্‌তে কর্‌তে বিতৃষ্ণা এসেছিল, অশান্তিতে তাদের

হৃদয় জ্বলে যাচ্ছিল; হৃদয়ে এত অভাব বোধ হচ্ছিল যে, একটা শান্তি না পেলে, তাদের দেহ ছুটে যেত তাই ভগবানের দয়া হয়েছিল। তমোগুনের ভেতর দিয়ে ঐ সকল লোক ধর্ম্মপথে উঠেছিল।

শিষ্য। তমোগুণ বা যাহাই হউক, কিন্তু ঐ ভাবেও ত তাহাদের ঈশ্বরলাভ হইয়াছিল?

স্বামিজী। হাঁ, তা হবে না কেন? কিন্তু পায়খানার দোর দিয়ে না ঢুকে সদর দোর দিয়ে বাড়ীতে ঢোকা ভাল নয় কি? —এবং ঐ পথেও ত "কি করে মনের এ অশান্তি দূর করি" এইরূপ একটা বিষয় হাঁক্‌পাকানি ও চেষ্টা আছে?

শিষ্য। তাহা ঠিক, তবে আমার মনে হয়, যাহারা ইন্দ্রিয়াদি দমন ও কামকাঞ্চন ত্যাগ করিয়া ঈশ্বর লাভ করিতে উদ্যত, তাহারা পুরুষকারবাদী ও স্বাবলম্বী; এবং যাহারা কেবলমাত্র তাঁহার নামে বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া পড়িয়া আছে, তাহাদের কামকাঞ্চনাসক্তি তিনিই কালে দূর করিয়া অন্তে পরম পদ দেন।

স্বামিজী। হাঁ, তবে ঐরূপ লোক বিরল; সিদ্ধ হবার পর লোকে উহাদিগকেই কৃপাসিদ্ধ বলে। জ্ঞানী ও ভক্ত এই উভয়েরই মতে কিন্তু ত্যাগই হচ্ছে মূলমন্ত্র।

শিষ্য। তাতে আর সন্দেহ কি! শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় একদিন আমায় বলিয়াছিলেন যে, "কৃপা পক্ষে কোন নিয়ম নাই। যদি থাকে, তবে তাকে কৃপা বলা যায় না। সেখানে সবই বে-আইনী কারখানা।"

স্বামিজী। তা নয় রে তা নয়; ঘোষজা যেখানকার কথা বলেছে, সেখানেও আমাদের অজ্ঞাত একটা আইন বা নিয়ম আছেই আছে। বে-আইনী কারখানাটা হচ্ছে শেষ কথা, দেশকাল নিমিত্তের অতীত স্থানের কথা; সেখানে Law of Causation (কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ) নেই, কাজেই সেখানে কে কারে কৃপা করবে?—সেখানে সেব্য সেবক, ধ্যাতা ধ্যেয়, জ্ঞাতা জ্ঞেয় এক হয়ে যায়—সব সমরস।

শিষ্য। আজ তবে আসি। আপনার কথা শুনিয়া আজ বেদ-বেদান্তের সার বুঝা হইল; এতদিন কেবল বাগাড়ম্বর মাত্র করা হইতেছিল।

স্বামিজীর পদধূলি লইয়া শিষ্য কলিকাতাভিমুখে অগ্রসর হইল।

পঞ্চম বল্লী

স্থান—বেলুড় মঠ (নির্ম্মাণকালে)

বর্ষ—১৮৯৮

বিষয়

খাদ্যাখাদ্যের বিচার কি ভাবে করিতে হইবে—আমিষাহার কাহার করা কর্ত্তব্য—ভারতের বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কি ভাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠা হওয়া প্রয়োজন।

শিষ্য। স্বামিজী, খাদ্যাখাদ্যের সহিত ধর্ম্মাচরণের কিছু সম্বন্ধ আছে কি ?

স্বামিজী। অল্প বিস্তর আছে বই কি।

শিষ্য। মাছ মাংস খাওয়া উচিত এবং আবশ্যক কি ?

স্বামিজী। খুব খাবি বাবা! তাতে যা পাপ হবে, তা আমার। *

---

* স্বামিজীর ঐরূপ উত্তরে কেহ না ভাবিয়া বসেন—তিনি মাংসাহার বিষয়ের অধিকারী বিচার করিতেন না। তাঁহার যোগবিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থে তিনি আহার সম্বন্ধে ইহাই সাধারণ নিয়ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, দুষ্পাচ্য বলিয়া যাহা অজীর্ণাদি রোগের উৎপত্তি করে অথবা উহা না করিলেও শরীরের উষ্ণতা অযথা বৃদ্ধি করিয়া যাহা ইন্দ্রিয় ও মনে চাঞ্চল্য উপস্থিত করে, তাহা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। অতএব আধ্যাত্মিক উন্নতিকামী ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাঁহাদের মাংসাহারে প্রবৃত্তি আছে, তাঁহাদিগকে স্বামিজী পূর্ব্বোক্ত দুই বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া উহা ভোজন করিতে উপদেশ দিতেন। নতুবা আমিষাহার একেবারে বর্জ্জন করিতে বলিতেন। অথবা, আমিষাহার করিব কি না—এ প্রশ্নের সমাধান তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক পবিত্রাদি লক্ষ্য করিয়া আপনিই করিয়া লইতে বলিতেন।

তোদের দেশের লোকগুলোর দিকে একবার চেয়ে দেখ দেখি—মুখে মলিনতার ছায়া—বুকে সাহস ও উদ্যম-শূন্যতা—পেটটি বড়—হাত পায়ে বল নেই—ভীরু ও কাপুরুষ !

শিষ্য। মাছ মাংস খাইলে যদি উপকারই হইবে, তবে বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম্মে অহিংসাকে 'পরমো ধর্ম্মঃ' বলিয়াছে কেন ?

স্বামিজী। বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম আলাদা নয়। বৌদ্ধধর্ম্ম মরে যাবার সময় হিন্দুধর্ম্ম উহার কতকগুলি নিয়ম নিজেদের ভিতর ঢুকিয়ে আপনার করে নিয়েছিল। ঐ ধর্ম্মই এখন ভারতবর্ষে বৈষ্ণবধর্ম্ম বলে বিখ্যাত। 'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ'—বৌদ্ধধর্ম্মের এই মত খুব ভাল, তবে অধিকারী বিচার না করে বলপূর্ব্বক রাজ-শাসনের দ্বারা ঐ মত ইতর সাধারণ সকলের উপর চালাতে গিয়ে, বৌদ্ধধর্ম্ম দেশের মাথাটি একেবারে খেয়ে দিয়ে গেছে। ফলে হয়েছে এই যে, লোকে পিঁপড়েকে চিনি দিচ্ছে—আর, টাকার জন্য ভায়ের সর্ব্বনাশ সাধন কচ্ছে !—এমন "বকঃ পরমধার্ম্মিকঃ" এ জীবনে অনেক দেখেছি। অন্যপক্ষে দেখ্ —বৈদিক ও মনূক্ত ধর্ম্মে মৎস্য মাংস খাবার বিধান রয়েছে, আবার অহিংসার কথাও আছে। অধিকারি-বিশেষে

ভারতের ইতর সাধারণ গৃহস্থের সম্বন্ধে কিন্তু স্বামিজী আমিষাহারের পক্ষপাতী লেন। তিনি বলিতেন, বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য আমিষাশী জাতিদিগের ইত তাহাদিগের জীবন-সংগ্রামে সর্ব্বপ্রকারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে, এজন্য ংসাহার তাহাদের পক্ষে এখন একান্ত প্রয়োজনীয়।

হিংসা ও অধিকারিবিশেষে অহিংসাধর্ম্ম পালনের ব্যবস্থ
আছে। শ্রুতি বলেছেন—'মা হিংস্যাৎ সর্ব্ব-ভূতানি,
মনুও বলেছেন—'নিবৃত্তিস্তু মহাফলা'।

শিষ্য। এখন কিন্তু দেখিয়াছি মহাশয়, ধর্ম্মের দিকে একা
ঝোঁক হইলেই লোকে আগে মাছ মাংস ছাড়িয়া দেয়
অনেকের চক্ষে ব্যভিচারাদি গুরুতর পাপের অপেক্ষাও
যেন মাছ মাংস খাওয়াটা বেশী পাপ!—এ ভাবটা
কোথা হইতে আসিল?

স্বামিজী। কোত্থেকে এলো, তা জেনে তোর দরকার কি? তবে
ঐ মত ঢুকে যে তোদের সমাজের ও দেশের সর্ব্বনাশ
সাধন করেছে, তা ত দেখ্‌তে পাচ্ছিস্? দেখ্‌না—
তোদের পূর্ব্ববঙ্গের লোক খুব মাছ মাংস খায়, কচ্ছপ
খায়, তাই তারা পশ্চিমবাঙ্গলার লোকের চেয়ে সুস্থ-
শরীর। তোদের পূর্ব্ববাঙ্গলার বড় মানুষেরাও এখন
রাত্রে লুচি বা রুটি খেতে শেখেনি। তাই আমাদের
দেশের লোকগুলোর মত অম্বলের ব্যারামে ভোগে না।
শুনেছি, পূর্ব্ববাঙ্গলার পাড়াগাঁয়ে লোকে অম্বলের ব্যারাম
কাকে বলে, তা বুঝ্‌তেই পারে না।

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ। আমাদের দেশে অম্বলের ব্যারাম বলিয়া
কোন ব্যারাম নাই। এদেশে আসিয়া ঐ ব্যারামের নাম
শুনিয়াছি। দেশে আমরা দুবেলাই মাছ ভাত খাইয়া
থাকি।

স্বামিজী। তা খুব খাবি। ঘাস পাতা খেয়ে যত পেটরোগা

বাবাজীর দলে দেশ ছেয়ে ফেলেছে। ও সব সত্ত্বগুণের চিহ্ন নয়। মহা তমোগুণের ছায়া—মৃত্যুর ছায়া। সত্ত্বগুণের চিহ্ন হচ্ছে—মুখে উজ্জ্বলতা—হৃদয়ে অদম্য উৎসাহ—Tremendous activity—আর, তমোগুণের লক্ষণ হচ্ছে আলস্য—জড়তা—মোহ—নিদ্রা এই সব!

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, মাছ মাংসে ত রজোগুণ বাড়ায়।

স্বামিজী। আমি ত তাই চাই। এখন রজোগুণেরই ত দরকার। দেশের যে সব লোককে এখন সত্ত্বগুণী বলে মনে কচ্ছিস্—তাদের ভিতর পনর আনা লোকই ঘোর তমোভাবাপন্ন। এক আনা লোক সত্ত্বগুণী মেলে ত ঢের! এখন চাই প্রবল রজোগুণের তাণ্ডব উদ্দীপনা—দেশ যে ঘোর তমসাচ্ছন্ন, দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ না? এখন দেশের লোককে মাছ মাংস খাইয়ে উদ্যমী করে তুল্‌তে হবে, জাগাতে হবে—কার্য্যতৎপর কর্‌তে হবে। নতুবা ক্রমে দেশশুদ্ধ লোক জড় হয়ে যাবে—গাছ পাথরের মত জড় হয়ে যাবে। তাই বল্‌ছিলুম, মাছ মাংস খুব খাবি।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, মনে যখন সত্ত্বগুণের অত্যন্ত স্ফূর্ত্তি হয়, তখন মৎস্য মাংসে স্পৃহা থাকে কি?

স্বামিজী। না, তা থাকে না। সত্ত্বগুণের যখন খুব বিকাশ হয়, তখন মাছ মাংসে রুচি থাকে না। কিন্তু সত্ত্বগুণ প্রকাশের এই সব লক্ষণ জান্‌বি, পরের জন্য সর্ব্বস্ব পণ—কামিনীকাঞ্চনে সম্পূর্ণ অনাসক্তি—নিরভিমানিত্ব—অহংবুদ্ধিশূন্যত্ব। এই সব লক্ষণ যার হয়, তার আর animal

foodএর (আমিষাহারের) ইচ্ছা হয় না। আর যেখানে দেখবি—মনে ঐ সব গুণের স্ফূর্ত্তি নেই, অথচ অহিংসার দলে নাম লিখিয়েছে—সেখানে জান্‌বি, হয় ভণ্ডামি, না হয় লোকদেখান ধর্ম্ম। তোর যখন ঠিক্ ঠিক্ সত্ত্বগুণের অবস্থা হবে তখন আমিষাহার ছেড়ে দিস।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, ছান্দোগ্য শ্রুতিতে ত আছে "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ"—শুদ্ধ বস্তু আহার করিলে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়, ইত্যাদি। অতএব সত্ত্বগুণী হইবার জন্য রজঃ ও তমোগুণোদ্দীপক পদার্থ সকলের ভোজন পূর্ব্বেই ত্যাগ করা কি এখানে শ্রুতির অভিপ্রায় নহে?

স্বামিজী। ঐ শ্রুতির অর্থ কর্‌তে গিয়ে শঙ্করাচার্য্য বলেছেন—"আহার" অর্থে "ইন্দ্রিয়-বিষয়"; আর, শ্রীরামানুজ স্বামী "আহার" অর্থে খাদ্য ধরেছেন। আমার মত হচ্ছে তাঁহাদের ঐ উভয় মতের সামঞ্জস্য করে নিতে হবে। কেবল দিনরাত খাদ্যাখাদ্যের বাদ্‌বিচার করে জীবনটা কাটাতে হবে—না, ইন্দ্রিয়সংযম করতে হবে? ইন্দ্রিয়সংযমটাকেই মুখ্য উদ্দেশ্য বলে ধর্‌তে হবে; আর ঐ ইন্দ্রিয় সংযমের জন্যই ভাল মন্দ খাদ্যাখাদ্যের অল্প বিস্তর বিচার কর্‌তে হবে। শাস্ত্র বলেন, খাদ্য ত্রিবিধ দোষে দুষ্ট ও পরিত্যাজ্য হয়। (১ম) জাতিদুষ্ট—যেমন পেঁয়াজ, রশুন ইত্যাদি। (২য়) নিমিত্তদুষ্ট—যেমন ময়রার দোকানের খাবার, দশ গণ্ডা মাছি মরে পড়ে রয়েছে—রাস্তার ধূলোই কত উড়ে পড়্‌ছে,

ইত্যাদি। (৩য়) আশ্রয়দুষ্ট—যেমন অসৎ লোকের দ্বারা স্পৃষ্ট অন্নাদি। খাদ্য জাতিদুষ্ট ও নিমিত্তদুষ্ট হয়েছে কি না, তা সকল সময়েই খুব নজর রাখ্‌তে হয়। কিন্তু এদেশে ঐদিকে নজর একেবারেই উঠে গেছে। কেবল শেষোক্ত দোষটি—যা যোগী ভিন্ন অন্য কেউ প্রায় বুঝ্‌তেই পারে না,—নিয়েই দেশে যত লাঠালাঠি চল্‌ছে —'ছুঁয়োনা' 'ছুঁয়োনা' করে ছুঁৎমার্গীর দল দেশটাকে ঝালাপালা করেছে। তাও ভালমন্দ লোকের বিচার নেই—গলায় একগাছা সূতো থাকলেই হল, তার হাতে অন্ন খেতে ছুঁৎমার্গীদের আর আপত্তি নেই। খাদ্যের আশ্রয়দোষ ধর্‌তে পারা একমাত্র ঠাকুরকেই দেখেছি। এমন অনেক ঘটনা হয়েছে, যেখানে তিনি কোন কোন লোকের ছোঁয়া খেতে পারেন নি। বিশেষ অনুসন্ধানের পর জান্‌তে পেরেছি—বাস্তবিকই সে সকল লোকের ভিতর কোন না কোন বিশেষ দোষ ছিল। তোদের যত কিছু ধর্ম্ম এখন দাঁড়িয়েছে গিয়ে ভাতের হাঁড়ীর মধ্যে! অপর জাতির ছোঁয়া ভাতটা না খেলেই যেন ভগবান্ লাভ হয়ে গেল! শাস্ত্রের মহান্ সত্য সকল ছেড়ে কেবল খোসা নিয়েই মারামারি চল্‌ছে।

শিষ্য। মহাশয়, তবে কি আপনি বলিতে চান, সকলের স্পৃষ্ট অন্ন খাওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য?

স্বামিজী। তা কেন বল্‌বো? আমার কথা হচ্ছে, তুই বামুন,

অপর জাতের অন্ন নাই খেলি; কিন্তু তুই সব বামুনের অন্ন কেন খাবিনি? তোরা রাঢ়ীশ্রেণী বলে বারেন্দ্র বামুনের অন্ন খেতে আপত্তি হবে কেন? আর বারেন্দ্র বামুনই বা তোদের অন্ন না খাবে কেন? মারাঠী তেলিঙ্গী ও কনোজী বামুনই বা তোদের অন্ন না খাবে কেন? কল্‌কাতায় জাতবিচারটা আরও কিছু মজার; দেখা যায়, অনেক বামুন কায়েতই হোটেলে ভাত মার্‌ছেন; তাঁরাই আবার মুখ পুঁছে এসে সমাজের নেতা হচ্ছেন; তাঁরাই অন্যের জন্য জাতবিচার ও অন্নবিচারের আইন কর্‌ছেন! বলি, ঐ সব কপটীদের আইনমত কি সমাজকে চল্‌তে হবে? ওদের কথা ফেলে দিয়ে সনাতন ঋষিদের শাসন চালাতে হবে—তবেই দেশের কল্যাণ।

শিষ্য। তবে কি মহাশয়, কলিকাতায় অধুনাতন সমাজে ঋষি-শাসন চলিতেছে না?

স্বামিজী। শুধু কল্‌কাতায় কেন?—আমি ভারতবর্ষ তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছি, কোথাও ঋষিশাসনের ঠিক্ ঠিক্ প্রচলন নেই। কেবল লোকাচার, দেশাচার, আর স্ত্রী-আচার—এতেই সকল জায়গায় সমাজ শাসিত হচ্ছে। শাস্ত্র ফাস্ত্র কি কেউ পড়ে—না, পড়ে সেইমত সমাজকে চালাতে চায়?

শিষ্য। তবে মহাশয়, এখন আমাদের কি করিতে হইবে?

স্বামিজী। ঋষিগণের মত চালাতে হবে; মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি

ঋষিদের মন্ত্রে দেশটাকে দীক্ষিত কর্‌তে হবে। তবে সময়োপযোগী কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করে দিতে হবে। এই দেখ্‌না, ভারতের কোথাও আর চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগ দেখা যায় না। প্রথমতঃ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চার্‌ জাতে দেশের লোকগুলোকে ভাগ কর্‌তে হবে। সব বামুন এক করে একটি ব্রাহ্মণ জাত গড়্‌তে হবে। এইরূপ সব ক্ষত্রিয়, সব বৈশ্য, সব শূদ্রদের নিয়ে অন্য তিনটি জাত্‌ করে সকল জাতিকে বৈদিক প্রণালীতে আন্‌তে হবে। নতুবা শুধু 'তোমায় ছোঁবনা' বল্লেই কি দেশের কল্যাণ হবে রে? কখন নয়।

ষষ্ঠ বল্লী

স্থান—বেলুড় মঠ (নির্ম্মাণকালে)

বর্ষ—১৮৯৮

বিষয়

ভারতের দুর্দ্দশার কারণ—উহা দূরীকরণের উপায়—বৈদিক ছাঁচে দেশটাকে পুনরায় গড়িয়া তোলা এবং মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির ন্যায় মানুষ তৈয়ার করা।

শিষ্য। স্বামিজী, বর্ত্তমান কালে আমাদের সমাজ ও দেশের এত দুর্দ্দশা হইয়াছে কেন?

স্বামিজী। তোরাই সে জন্য দায়ী।

শিষ্য। বলেন কি?—কেমন করিয়া?

স্বামিজী। বহুকাল থেকে দেশের নীচ জাতদের ঘেন্না করে করে তোরা এখন জগতে ঘৃণাভাজন হয়ে পড়েছিস্!

শিষ্য। কবে আবার আমরা উহাদের ঘৃণা করিলাম?

স্বামিজী। কেন? ভট্‌চাযের দল তোরাই ত, বেদবেদান্তাদি যত সারবান্ শাস্ত্রগুলি ব্রাহ্মণেতর জাত্‌দের কখন পড়্‌তে দিস্‌নি—তাদের ছুঁস্‌নি—তাদের কেবল নীচে দাবিয়ে রেখেছিস্—স্বার্থপরতা থেকে তোরাই ত চিরকাল ঐরূপ করে আসছিস্। ব্রাহ্মণেরাই ত ধর্ম্মশাস্ত্রগুলিকে একচেটে করে বিধি-নিষেধ তাদেরই হাতে রেখেছিল; আর, ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতগুলিকে নীচ বলে বলে তাদের

মনে ধারণা করিয়ে দিয়েছিল যে, তারা সত্য সত্যই হীন। তুই যদি একটা লোককে খেতে শুতে বস্‌তে সর্ব্বক্ষণ বলিস্ "তুই নীচ," "তুই নীচ," তবে সময়ে তার ধারণা হবেই হবে যে "আমি সত্য সত্যই নীচ।" ইংরাজীতে একে বলে Hypnotise (হিপ্‌নোটাইজ্) করা। ব্রাহ্মণেতর জাতগুলির একটু একটু করে চমক্ ভাঙ্গছে। ব্রাহ্মণদের তন্ত্রে মন্ত্রে তাদের আস্থা কমে যাচ্ছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারে পদ্মার পাড় ধসে যাবার মত ব্রাহ্মণদের সব তুক্ তাক্ এখন ভেঙ্গে পড়্‌ছে দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ ত?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, আচার-বিচারটা আজকাল ক্রমেই শিথিল হইয়া পড়িতেছে।

স্বামিজী। পড়্‌বে না? ব্রাহ্মণরা যে ক্রমে ঘোর অনাচার অত্যাচার আরম্ভ করেছিল; স্বার্থপর হয়ে কেবল নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখ্‌বার জন্য কত কি অদ্ভুত অবৈদিক, অনৈতিক, অযৌক্তিক মত চালিয়েছিল, তার ফলও তাই হাতেহাতে পাচ্ছে।

শিষ্য। কি ফল পাইতেছে মহাশয়?

স্বামিজী। ফলটা কি, দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ না? তোরা যে ভারতের অপর সাধারণ জাতগুলিকে ঘেন্না করেছিলি, তার জন্যই এখন তোদের হাজার বৎসরের দাসত্ব কর্‌তে হচ্ছে,—তাই তোরা এখন বিদেশীর ঘৃণাস্থল ও স্বদেশ-বাসিগণের উপেক্ষাস্থল হয়ে রয়েছিস্!

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, এখনও ত ব্যবস্থাদি ব্রাহ্মণের মতেই চলিতেছে; গর্ভাধান হইতে যাবতীয় ক্রিয়াকলাপই লোকে—ব্রাহ্মণেরা যেরূপ বলিতেছেন—সেইরূপই করিতেছে। তবে আপনি ঐরূপ বলিতেছেন কেন?

স্বামিজী। কোথায় চল্‌ছে? শাস্ত্রোক্ত দশবিধ সংস্কার কোথায় চল্‌ছে? আমি ত ভারতবর্ষটা সব ঘুরে দেখেছি, সর্ব্বত্রই শ্রুতি-স্মৃতি-বিগর্হিত দেশাচারে সমাজ শাসিত হচ্ছে! লোকাচার, দেশাচার ও স্ত্রী-আচার, এই এখন সর্ব্বত্র স্মৃতিশাস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে! কে কার কথা শুনছে? টাকা দিতে পারলেই ভট্‌চাযের দল যা তা বিধি-নিষেধ লিখে দিতে রাজী আছেন! কয়জন ভট্‌চায বৈদিক কল্প, গৃহ্য ও শ্রৌত সূত্র পড়ছেন? তারপর দেখ্, বাঙ্গালায় রঘুনন্দনের শাসন, আর একটু এগিয়ে দেখ্‌বি মিতাক্ষরার শাসন, আর একদিকে গিয়ে দেখ্, মনুস্মৃতির শাসন চলেছে! তোরা ভাবিস্—সর্ব্বত্র বুঝি একমত চলেছে! সেজন্যই আমি চাই—বেদের প্রতি লোকের সম্মান বাড়িয়ে বেদের চর্চ্চা করাতে ও সর্ব্বত্র বেদের শাসন চালাতে।

শিষ্য। মহাশয়, তাহা কি এখন আর চলা সম্ভবপর?

স্বামিজী। বেদের সকল প্রাচীন নিয়মগুলিই চল্‌বে না বটে, কিন্তু সময়োপযোগী বাদ-সাদ্ দিয়ে, নিয়মগুলি বিধিবদ্ধ করে নূতন ছাঁচে গড়ে, সমাজকে দিলে, চল্‌বে না কেন?

শিষ্য। মহাশয়, আমার ধারণা ছিল, অন্ততঃ মনুর শাসনটা ভারতে সকলেই এখনও মানে।

।ামিজী। কোথায় মান্‌ছে? তোদের নিজেদের দেশেই দেখ্‌না তন্ত্রের বামাচার তোদের হাড়ে হাড়ে ঢুকেছে। এমন কি, আধুনিক বৈষ্ণব ধর্ম্ম—যা মৃত বৌদ্ধধর্ম্মের কঙ্কালাবশিষ্ট—তাতেও ঘোর বামাচার ঢুকেছে। ঐ অবৈদিক বামাচারের প্রভাবটা খর্ব্ব কর্‌তে হবে।

শিষ্য। মহাশয়, এ পঙ্কোদ্ধার এখন সম্ভব কি?

।ামিজী। তুই কি বল্‌ছিস্, ভীরু, কাপুরুষ। অসম্ভব বলে বলে তোরা দেশটা মজালি। মানুষের চেষ্টায় কি না হয়?

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণ দেশে পুনরায় না জন্মালে উহা সম্ভবপর মনে হয় না।

।ামিজী। আরে, পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থ চেষ্টার জন্যই ত তাঁরা মনু; যাজ্ঞবল্ক্য হয়ে ছিলেন, না, আর কিছু? চেষ্টা কর্‌লে আমরাই যে মনু, যাজ্ঞবল্ক্যের চেয়ে ঢের বড় হতে পারি, আমাদের মতই বা তখন চলবে না কেন?

শিষ্য। মহাশয়, ইতিপূর্ব্বে আপনিই ত বলিলেন, প্রাচীন আচারাদি দেশে চালাইতে হইবে। তবে মন্বাদিকে আমাদেরই মত একজন বলিয়া উপেক্ষা করিলে চলিবে কেন?

।ামিজী। কি কথায় কি কথা নিয়ে এলি? তুই আমার কথাই বুঝ্‌তে পাচ্ছিস্ না। আমি কেবল বলেছি যে প্রাচীন বৈদিকাচারগুলি, সমাজ ও সময়োপযোগী করে নূতন ছাঁচে গড়ে নূতন ভাবে দেশে চালাতে হবে। নয় কি?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ।

।ামিজী। তবে ও কি বল্‌ছিলি? তোরা শাস্ত্র পড়েছিস্,

আমার আশা ভরসা তোরাই। আমার কথাগুলি ঠিক্ ঠিক্ বুঝে সেই ভাবে কাজে লেগে যা।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, আমাদের কথা শুনিবে কে? দেশের লোক উহা লইবে কেন?

স্বামিজী। তুই যদি ঠিক্ ঠিক্ বুঝাতে পারিস্ ও যা বল্‌বি তা হাতেনাতে করে দেখাতে পারিস্ ত অবশ্য নেবে। আর তোতাপাখীর মতন যদি কেবল শ্লোকই আওড়াস্, বাক্যবাগীশ হয়ে কাপুরুষের মত কেবল অপরের দোহাই দিস ও কাজে কিছুই না দেখাস, তা হলে তোর কথা কে শুন্‌বে বল্?

শিষ্য। মহাশয়, সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে এখন সংক্ষেপে দুই একটি উপদেশ দিন।

স্বামিজী। উপদেশ ত তোকে ঢের দিলুম; একটি উপদেশও অন্ততঃ কাজে পরিণত কর্। জগৎ দেখুক যে, তোর শাস্ত্র পড়া ও আমার কথা শোনা সার্থক হয়েছে। এই যে মন্বাদি শাস্ত্র পড়্‌লি, আরও কত কি পড়্‌লি, বেশ করে ভেবে দেখ্ এর মূল ভিত্তি বা উদ্দেশ্য কি? সেই ভিত্তিটা বজায় রেখে সার সার তত্ত্বগুলি প্রাচীন ঋষিদের মত সংগ্রহ কর্ ও সময়োপযোগী মত সকল তাতে নিবদ্ধ কর; কেবল এইটুকু লক্ষ্য রাখিস্, যেন সমগ্র ভারতবর্ষের সকল জাতের, সকল সম্প্রদায়েরই ঐ সকল নিয়ম পালনে যথার্থ কল্যাণ হয়। লেখ্ দেখি, ঐরূপ একখানা স্মৃতি; আমি দেখে সংশোধন করে দেব এখন।

শিষ্য। মহাশয়, ব্যাপারটি সহজসাধ্য নহে; কিন্তু ঐরূপে স্মৃতি লিখিলেও উহা চলিবে কি?

স্বামিজী। কেন চল্‌বে না? তুই লেখ্ না। "কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী"—যদি ঠিক্ ঠিক্ লিখিস্ ত একদিন না একদিন চল্‌বেই। আপনাতে বিশ্বাস রাখ্। তোরাই ত পূর্ব্বে বৈদিক ঋষি ছিলি। শুধু শরীর বদ্‌লিয়ে এসেছিস্ বইত নয়?—আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌ছি, তোদের ভিতর অনন্ত শক্তি রয়েছে! সেই শক্তি জাগা; ওঠ্, ওঠ্ লেগে পড়, কোমর বাঁধ।—কি হবে দুদিনের ধন মান নিয়ে? আমার ভাব কি জানিস্—আমি মুক্তি ফুক্তি চাই না। আমার কাজ হচ্ছে—তোদের ভেতর এই ভাবগুলি জাগিয়ে দেওয়া; একটা মানুষ তৈরী কর্‌তে লক্ষ জন্ম যদি নিতে হয়, আমি তাতেও প্রস্তুত।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, ঐরূপে কার্য্যে লাগিয়াই বা কি হইবে? মৃত্যু ত পশ্চাতে!

স্বামিজী। দূর ছোঁড়া, মর্‌তে হয়, একবারই মরবি। কাপুরুষের মত অহরহঃ মৃত্যু-চিন্তা করে বার বার মর্‌বি কেন?

শিষ্য। আচ্ছা মহাশয়, মৃত্যু-চিন্তা না হয় নাই করিলাম কিন্তু এই অনিত্য সংসারে কর্ম্ম করিয়াই বা ফল কি?

স্বামিজী। ওরে মৃত্যু যখন অনিবার্য্য, তখন ইট পাটকেলের মত মরার চেয়ে বীরের ন্যায় মরা ভাল। এ অনিত্য সংসারে দুদিন বেশী বেঁচেই বা লাভ কি? It is better to wear out than to rust out—জরাজীর্ণ হয়ে একটু

একটু করে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরার চেয়ে বীরের ন্যায় অপরের এতটুকু কল্যাণের জন্যও লড়াই করে ফস্ করে মরাটা ভাল নয় কি ?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ। আপনাকে আজ অনেক বিরক্ত করিলাম।

স্বামিজী। ঠিক্ ঠিক্ জিজ্ঞাসুর কাছে দুরাত্রি বক্‌লেও আমার শ্রান্তি বোধ হয় না, আমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করে অনবরত বক্‌তে পারি। ইচ্ছা কর্‌লে ত আমি হিমালয়ের গুহায় সমাধিস্থ হয়ে বসে থাক্‌তে পারি। আর, আজকাল দেখ্‌ছিস্ ত মায়ের ইচ্ছায় কোথাও আমার খাবার ভাবনা নেই, কোন না কোন রকম জোটেই জোটে; তবে কেন ঐরূপ করি না? কেনই বা এদেশে রয়েছি? কেবল দেশের দশা দেখে ও পরিণাম ভেবে আর স্থির থাক্‌তে পারিনে!—সমাধি ফমাদি তুচ্ছ বোধ হয়—"তুচ্ছং ব্রহ্মপদং" হয়ে যায়!—তোদের মঙ্গল-কামনা হচ্ছে আমার জীবন-ব্রত। যে দিন ঐ ব্রত শেষ হবে, সে দিন দেহ ফেলে চোঁচা দৌড় মার্‌ব!

শিষ্য মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্বামিজীর ঐ সকল কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হৃদয়ে নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কতক্ষণ বসিয়া রহিল! পরে বিদায় গ্রহণের আশায় তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বলিল, "মহাশয়, আজ তবে আসি।"

স্বামিজী। আস্‌বি কেন রে? মঠে থেকেই যা না। সংসারীদের ভেতর গেলে মন আবার মলিন হয়ে যাবে। এখানে দেখ, কেমন হাওয়া, গঙ্গার তীর, সাধুরা সাধন ভজন

করছে, কত ভাল কথা হচ্ছে। আর কল্‌কাতায় গিয়েই ছাই ভস্ম ভাব্‌বি।

শিষ্য সহর্ষে বলিল, "আচ্ছা মহাশয়, তবে আজ এখানেই থাকিব।"

স্বামিজী। 'আজ' কেন রে?—একেবারে থেকে যেতে পারিস না? কি হবে ফের সংসারে গিয়ে?

শিষ্য স্বামিজীর ঐ কথা শুনিয়া মস্তক অবনত করিয়া রহিল; মনে নানা চিন্তার যুগপৎ উদয় হওয়ায় কোনই উত্তর দিতে পারিল না।

সপ্তম বল্লী

স্থান—বেলুড় মঠ (নির্ম্মাণকালে)

বর্ষ—১৮৯৮

বিষয়

স্থানকালাদির শুদ্ধতাবিচার কতক্ষণ—আত্মার প্রকাশের অন্তরায় যাহা নাশ করে তাহাই সাধনা—'ব্রহ্মজ্ঞানে কর্ম্মের লেশমাত্র নাই', শাস্ত্রবাক্যের অর্থ—নিষ্কাম কর্ম্ম কাহাকে বলে—কর্ম্মের দ্বারা আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, তথাপি স্বামিজী দেশের লোককে কর্ম্ম করিতে বলিয়াছেন কেন? ভারতের ভবিষ্যৎ কল্যাণ সুনিশ্চিত।

স্বামিজীর শরীর সম্প্রতি অনেকটা সুস্থ; মঠের নূতন জমিতে যে প্রাচীন বাড়ী ছিল, তাহার ঘরগুলি মেরামত করিয়া বাসোপযোগী করা হইতেছে, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। সমগ্র জমিটি মাটি ফেলিয়া ইতিপূর্ব্বেই সমতল করা হইয়া গিয়াছে। স্বামিজী আজ অপরাহ্নে শিষ্যকে সঙ্গে করিয়া মঠের জমিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। স্বামিজীর হস্তে একটি দীর্ঘ যষ্টি, গায়ে গেরুয়া রঙ্গের ফ্লানেলের আলখাল্লা, মস্তক অনাবৃত। শিষ্যের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে দক্ষিণ মুখে অগ্রসর হইয়া ফটক পর্য্যন্ত গিয়া পুনরায় উত্তরাস্যে ফিরিতেছেন—এইরূপে বাড়ী হইতে ফটক ও ফটক হইতে বাড়ী পর্য্যন্ত বারম্বার পদচারণা করিতেছেন! দক্ষিণ পার্শ্বে বিল্বতরুমূল বাঁধান হইয়াছে; ঐ বেলগাছের অদূরে দাঁড়াইয়া স্বামিজী এইবার ধীরে ধীরে গান ধরিলেন—

"গিরি, গণেশ আমার শুভকারী।
বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়ে বোধন,
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন,
ঘরে আন্‌ব চণ্ডী, শুন্‌ব কত চণ্ডী,
আস্‌বে কত দণ্ডী, যোগী জটাধারী॥"

(ইত্যাদি)

গান গাহিতে গাহিতে শিষ্যকে বলিলেন,—"হেথা আস্‌বে কত দণ্ডী, যোগী জটাধারী—বুঝ্‌লি? কালে এখানে কত সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হবে"—বলিতে বলিতে বিল্বতরুমূলে উপবেশন করিলেন ও বলিলেন, "বিল্বতরুমূল বড়ই পবিত্র স্থান। এখানে বসে ধ্যান ধারণা কর্‌লে শীঘ্র উদ্দীপনা হয়। ঠাকুর একথা বল্‌তেন।"

শিষ্য। মহাশয়, যাহারা আত্মানাত্মবিচারে রত, তাহাদের স্থানাস্থান, কালাকাল, শুদ্ধি অশুদ্ধি বিচারের আবশ্যকতা আছে কি?

স্বামিজী। যাঁদের আত্মজ্ঞানে "নিষ্ঠা" হয়েছে, তাঁদের ঐ সকল বিচার কর্‌বার প্রয়োজন নেই বটে, কিন্তু ঐ নিষ্ঠা কি অমনি হলেই হল? কত সাধ্য সাধনা কর্‌তে হয়, তবে হয়! তাই প্রথম প্রথম এক আধটা বাহ্য অবলম্বন নিয়ে নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াবার চেষ্টা করতে হয়। পরে যখন আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা লাভ হয়, তখন কোন অবলম্বনের আর দরকার থাকে না।

শাস্ত্রে নানা প্রকার সাধনমার্গ যে সব নির্দ্দিষ্ট হয়েছে,

সে কেবল ঐ আত্মজ্ঞানলাভের জন্য। তবে অধিকারী ভেদে সাধনা ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু ঐ সকল সাধনাদিও এক প্রকার কর্ম্ম, এবং যতক্ষণ কর্ম্ম, ততক্ষণ আত্মার দেখা নাই। আত্ম-প্রকাশের অন্তরায়গুলি শাস্ত্রোক্ত সাধনরূপ কর্ম্ম দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হয়, কর্ম্মের নিজের সাক্ষাৎ আত্ম-প্রকাশের শক্তি নেই; কতকগুলি আবরণকে দূর করে দেয় মাত্র। তারপর আত্মা আপন প্রভায় আপনি উদ্ভিন্ন হয়। বুঝ্‌লি? এইজন্য তোর ভাষ্যকার বল্‌ছেন—"ব্রহ্মজ্ঞানে কর্ম্মের লেশমাত্র সম্বন্ধ নেই।"

শিষ্য। কিন্তু মহাশয় কোন না কোনরূপ কর্ম্ম না করিলে যখন আত্ম-প্রকাশের অন্তরায়গুলির নিরাশ হয় না, তখন পরোক্ষভাবে কর্ম্মই ত জ্ঞানের কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে।

স্বামিজী। কার্য্যকারণ পরম্পরা-দৃষ্টিতে আপাততঃ ঐরূপ প্রতীয়মান হয় বটে। মীমাংসা-শাস্ত্রে ঐরূপ দৃষ্টি অবলম্বন করেই, কাম্য কর্ম্ম নিশ্চিত ফল প্রসব করে একথা বলা হয়েছে। নির্ব্বিশেষ আত্মার দর্শন কিন্তু কর্ম্মের দ্বারা হবার নয়। কারণ, আত্মজ্ঞানপিপাসুর পক্ষে বিধান এই যে, সাধনাদি কর্ম্ম কর্‌বে, অথচ তার ফলাফলে উদাসীন থাক্‌বে। তবেই হল, ঐ সকল সাধনাদি কর্ম্ম সাধকের চিত্তশুদ্ধির কারণ ভিন্ন আর কিছুই নয়; কারণ ঐ সাধনাদির ফলেই যদি আত্মাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা যেত, তবে আর শাস্ত্রে সাধককে ঐ সকল কর্ম্মের ফল ত্যাগ কর্‌তে বল্‌ত না। অতএব মীমাংসাশাস্ত্রোক্ত

ফলপ্রসূ কর্ম্মবাদের নিরাকরণকল্পেই গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্মযোগের অবতারণা করা হয়েছে। বুঝ্‌লি ?

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, কর্ম্মের ফলাফলেরই যদি প্রত্যাশা না রাখিলাম, তবে কষ্টকর কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন ?

স্বামিজী। শরীর ধারণ করে সর্ব্বক্ষণ একটা কিছু না করে থাক্‌তে পারা যায় না। জীবকে যখন কর্ম্ম কর্‌তেই হচ্ছে, তখন যেরূপে কর্ম্ম কর্‌লে আত্মার দর্শন পেয়ে মুক্তিলাভ হয়, সেইরূপে কর্ম্ম কর্‌তেই নিষ্কাম কর্ম্মযোগে বলা হয়েছে। আর তুই যে বল্লি—'প্রবৃত্তি হবে কেন ?'—তার উত্তর হচ্ছে এই যে যত কিছু কর্ম্ম করা যায়, তা সবই প্রবৃত্তি-মূলক ; কিন্তু কর্ম্ম করে করে যখন কর্ম্ম হতে কর্ম্মান্তরে, জন্ম হতে জন্মান্তরেই কেবল গতি হতে থাকে, তখন লোকের বিচারপ্রবৃত্তি কালে আপনা আপনি জেগে উঠে জিজ্ঞাসা করে, এই কর্ম্মের অন্ত কোথায় ? তখনি সে—গীতামুখে ভগবান্‌ যা বল্‌ছেন—"গহনা কর্ম্মণো গতিঃ"—তার মর্ম্ম বুঝতে পারে। অতএব যখন কর্ম্ম করে করে আর শান্তিলাভ হয় না, তখনই সা[illegible] কর্ম্মত্যাগী হয়। কিন্তু দেহ ধারণ করে কিছু [illegible] নিয়ে ত থাকতে হবে—কি নিয়ে থাক্‌বে বল্‌[illegible] দু চার্‌টে সৎকর্ম্ম করে যায়, কিন্তু ঐ কর্ম্মের [illegible] প্রত্যাশা রাখে না। কারণ, তখন তারা জেনেছে যে [illegible] কর্ম্মফলেই জন্মমৃত্যুর বহুধা অঙ্কুর নিহিত আছে। সে[illegible] জন্যই ব্রহ্মজ্ঞেরা সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী—লোক-দেখানো দু চারটে

কর্ম্ম করলেও তাতে তাঁদের কিছুমাত্র আঁট নেই। এরাই শাস্ত্রে নিষ্কাম কর্ম্মযোগী বলে কথিত হয়েছে।

শিষ্য। তবে কি মহাশয়, নিষ্কাম ব্রহ্মজ্ঞের উদ্দেশ্যহীন কর্ম্ম উন্মত্তের চেষ্টাদির ন্যায়?

স্বামিজী। তা কেন? নিজের জন্য, আপন শরীর মনের সুখের জন্য কর্ম্ম না করাই হচ্ছে কর্ম্মফল ত্যাগ করা। ব্রহ্মজ্ঞ নিজ সুখান্বেষণই করেন না; কিন্তু অপরের কল্যাণ বা যথার্থ সুখ লাভের জন্য কেন কর্ম্ম কর্‌বেন না? তাঁরা ফলাসঙ্গরহিত হয়ে যা কিছু কর্ম্ম করে যান্, তাতে জগতের হিত হয়—সে সব কর্ম্ম "বহুজনহিতায়," "বহুজনসুখায়" হয়। ঠাকুর বলতেন, "তাদের পা কখনও বেতালে পড়ে না।" তাঁরা যা যা করেন, তাই অর্থবন্ত হয়ে দাঁড়ায়। উত্তরচরিতে পড়িস্ নি—

"ঋষীণাং পুনরাদ্যানং বাচমর্থোঽনুধাবতি।"

অর্থাৎ ঋষিদের বাক্যের অর্থ আছেই আছে, কখনও নিরর্থক বা মিথ্যা হয় না। মন যখন আত্মায় লীন হয়ে বৃত্তিহীন-প্রায় হয়, তখন 'ইহামুত্রফলভোগবিরাগ' জন্মায় অর্থাৎ সংসারে বা মৃত্যুর পর স্বর্গাদিতে কোন প্রকার সুখভোগ কর্‌বার বাসনা থাকে না—মনে আর সংকল্প-বিকল্পের তরঙ্গ থাকে না। কিন্তু ব্যুত্থানকালে অর্থাৎ সমাধি বা ঐ বৃত্তিহীনাবস্থা থেকে নেমে মন যখন আবার 'আমি আমার' রাজ্যে আসে, তখন পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম বা অভ্যাস বা প্রারব্ধজনিত সংস্কারবশে দেহাদির কর্ম্ম

চল্‌তে থাকে। মন তখন প্রায়ই Superconscious (জ্ঞানাতীত) অবস্থায় থাকে; না খেলে নয়—তাই খাওয়া দাওয়া থাকে—দেহাদি বুদ্ধি এত অল্প বা ক্ষীণ হয়ে যায়। এই জ্ঞানাতীত ভূমিতে পৌঁছে যা যা করা যায়, তাই ঠিক ঠিক কর্‌তে পারা যায়; সেই সকল কার্য্যে জীবের ও জগতের যথার্থ হিত হয়; কারণ, তখন কর্ত্তার মন আর স্বার্থপরতায় বা নিজের লাভ লোকসান খতিয়ে দূষিত হয় না। ঈশ্বর Superconscious stateএ (জ্ঞানাতীত ভূমিতে) সর্ব্বদা অবস্থান করেই এই জগদ্রূপ বিচিত্র সৃষ্টি করেছেন;—এ সৃষ্টিতে সেইজন্য কোন কিছু Imperfect (অসম্পূর্ণ) দেখা যায় না। এইজন্যই বল্‌ছিলুম—আত্মজ্ঞ জীবের ফলাসঙ্গরহিত কর্ম্মাদি অঙ্গহীন বা অসম্পূর্ণ হয় না—তাতে জীবের ও জগতের ঠিক ঠিক কল্যাণ হয়।

শিষ্য। আপনি ইতিপূর্ব্বে বলিলেন, জ্ঞান এবং কর্ম্ম পরস্পর বিরোধী। ব্রহ্মজ্ঞানে কর্ম্মের তিলমাত্র স্থান নাই, অথবা কর্ম্মের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান বা দর্শন হয় না, তবে আপনি মহা রজোগুণের উদ্দীপক উপদেশ মধ্যে মধ্যে দেন কেন? এই সেদিন আমাকেই বলিতেছিলেন—"কর্ম্ম—কর্ম্ম—কর্ম্ম—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

স্বামিজী। আমি দুনিয়া ঘুরে দেখ্‌লুম—এ দেশের মত এত অধিক তামসপ্রকৃতির লোক পৃথিবীর আর কোথাও নেই। বাহিরে সাত্ত্বিকতার ভান, ভিতরে একেবারে

ইট্-পাট্‌কেলের মত জড়ত্ব—এদের দ্বারা জগতের কি কাজ হবে? এমন অকর্ম্মা, অলস, শিশ্নোদরপরায়ণ জাত দুনিয়ায় কতদিন আর বেঁচে থাক্‌তে পার্‌বে? ওদেশ (পাশ্চাত্য) বেড়িয়ে আগে দেখে আয়, পরে আমার ঐ কথার প্রতিবাদ করিস্। তাদের জীবনে কত উদ্যম, কত কর্ম্মতৎপরতা, কত উৎসাহ, কত রজোগুণের বিকাশ। তোদের দেশের লোকগুলোর রক্ত যেন হৃদয়ে রুদ্ধ হয়ে রয়েছে—ধমনীতে যেন আর রক্ত ছুট্‌তে পার্‌ছে না—সর্ব্বাঙ্গে Paralysis (পক্ষাঘাত) হয়ে যেন এলিয়ে পড়েছে! আমি তাই এদের ভিতর রজোগুণ বাড়িয়ে কর্ম্মতৎপরতা দ্বারা এদেশের লোকগুলোকে আগে ঐহিক জীবনসংগ্রামে সমর্থ কর্‌তে চাই। শরীরে বল নেই—হৃদয়ে উৎসাহ নেই—মস্তিষ্কে প্রতিভা নেই!—কি হবে রে, এই জড়পিণ্ডগুলো দ্বারা? আমি নেড়ে চেড়ে এদের ভিতর সাড়্ আন্‌তে চাই—এজন্য আমার প্রাণান্ত পণ। বেদান্তের অমোঘ মন্ত্রবলে এদের জাগাব। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"—এই অভয়বাণী শুনাতেই আমার জন্ম। তোরা ঐ কার্য্যে আমার সহায় হ। যা গাঁয়ে গাঁয়ে, দেশে দেশে এই অভয়বাণী আচণ্ডালব্রাহ্মণকে শুনাগে। সকলকে ধরে ধরে বল্‌গে যা, তোমরা অমিতবীর্য্য—অমৃতের অধিকারী। এইরূপে আগে রজঃশক্তির উদ্দীপনা কর্—জীবনসংগ্রামে সকলকে উপযুক্ত কর্, তারপর পরজীবনে মুক্তিলাভের

কথা তাদের বল। আগে ভিতরের শক্তি জাগ্রত করে দেশের লোককে নিজের পায়ের ওপর দাঁড় করা, উত্তম অশন বসন—উত্তম ভোগ আগে কর্‌তে শিখুক, তার পর সর্ব্বপ্রকার ভোগের বন্ধন থেকে কি করে মুক্ত হতে পার্‌বে, তা বলে দে। আলস্য, হীনবুদ্ধিতা, কপটতায় দেশ ছেয়ে ফেলেছে—বুদ্ধিমান লোক এ দেখে কি স্থির হয়ে থাক্‌তে পারে? কান্না পায় না? মাদ্রাজ, বম্বে, পাঞ্জাব, বাঙ্গালা—যে দিকে চাই, কোথাও যে জীবনীশক্তির চিহ্ন দেখি না। তোরা ভাবছিস্—আমরা শিক্ষিত। কি ছাই মাথামুণ্ড শিখেছিস্? কতকগুলি পরের কথা ভাষান্তরে মুখস্থ করে মাথার ভিতরে পুরে, পাশ করে ভাবছিস্—আমরা শিক্ষিত! ছ্যাঃ! ছ্যাঃ! এর নাম আবার শিক্ষা!! তোদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? হয় কেরানীগিরি, না হয় একটা দুষ্ট উকীল হওয়া, না হয় বড় জোর কেরানীগিরিরই রূপান্তর একটা ডেপুটিগিরি চাক্‌রী—এই ত?—এতে তোদেরই বা কি হল, আর দেশেরই বা কি হল? একবার চোখ্ খুলে দেখ্, স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমিতে অন্নের জন্য কি হাহাকারটা উঠেছে! তোদের ঐ শিক্ষায় সে অভাব পূর্ণ হবে কি—কখনও নয়। পাশ্চাত্যবিজ্ঞান-সহায়ে মাটি খুঁড়্‌তে লেগে যা, অন্নের সংস্থান কর—চাকুরী গুখুরী করে নয়—নিজের চেষ্টায় পাশ্চাত্যবিজ্ঞান-সহায়ে নিত্য নূতন পন্থা আবিষ্কার করে। ঐ অন্নবস্ত্রের

সংস্থান কর্‌বার জন্যই আমি লোকগুলোকে রজোগুণ-তৎপর হতে উপদেশ দিই। অন্নবস্ত্রাভাবে, চিন্তায় চিন্তায় দেশ উৎসন্ন হয়ে গেছে—তার তোরা কি কচ্ছিস্? ফেলে দে তোর শাস্ত্র ফাস্ত্র গঙ্গাজলে। দেশের লোক-গুলোকে আগে অন্নসংস্থান কর্‌বার উপায় শিখিয়ে দে, তার পর ভাগবত পড়ে শুনাস্। (কর্ম্মতৎপরতা দ্বারা ঐহিক অভাব দূর না হলে, ধর্ম্ম-কথায় কেউ কান দেবে না। তাই বলি, আগে আপনার ভিতর অন্তর্নিহিত আত্ম-শক্তিকে জাগ্রত কর্, তারপর দেশের ইতর সাধারণ সকলের ভিতর যতটা পারিস্ ঐ শক্তিতে বিশ্বাস জাগ্রত করে, প্রথম অন্নসংস্থান, পরে ধর্ম্মলাভ কর্‌তে তাদের শেখা।) আর বসে থাক্‌বার সময় নেই—কখন কার মৃত্যু হবে, তা কে বল্‌তে পারে?

কথাগুলি বলিতে বলিতে ক্ষোভ, দুঃখ ও করুণার সহিত অপূর্ব্ব এক তেজের মিলনে স্বামিজীর বদন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। চক্ষে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। তাঁহার তখনকার সেই দিব্যমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে শিষ্যের আর কথা সরিল না! কতক্ষণ পরে স্বামিজী পুনরায় বলিলেন, "ঐরূপ কর্ম্মতৎপরতা ও আত্মনির্ভরতা কালে দেশে আস্‌বেই আস্‌বে—বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছি; There is no escape (গত্যন্তর নাই); যারা বুদ্ধিমান্, তারা ভাবী তিন যুগের ছবি সাম্‌নে প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পায়।

"ঠাকুরের জন্মাবার সময় হতেই পূর্ব্বাকাশে অরুণোদয় হয়েছে—কালে তার উদ্ভিন্ন ছটায় দেশ মধ্যাহ্ন-সূর্য্য-করে আলোকিত হবে।"

অষ্টম বল্লী

স্থান—বেলুড় মঠ (নির্ম্মাণকালে)

বর্ষ—১৮৯৮

বিষয়

ব্রহ্মচর্য্যরক্ষার কঠোর নিয়ম—সাত্ত্বিক-প্রকৃতিবিশিষ্ট লোকেই ঠাকুরের ভাব লইতে পারিবে—শুধু ধ্যানাদিতে নিযুক্ত থাকাই এ যুগের ধর্ম্ম নহে—এখন চাই উহার সহিত গীতোক্ত কর্ম্মযোগ।

বর্ত্তমান মঠ-বাটী নির্ম্মাণ হইয়াছে, সামান্য একটু আধটু যাহা বাকী আছে, তাহা স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, স্বামিজীর অভিমতে শেষ করিতেছেন। স্বামিজীর শরীর তত ভাল নয়, তাই ডাক্তারগণ তাঁহাকে নৌকায় করিয়া গঙ্গাবক্ষে সকাল সন্ধ্যায় বেড়াইতে বলিয়াছেন। নড়ালের রায়বাবুদের বজ্‌রাখানি কিছুদিনের জন্য স্বামী নিত্যানন্দ চাহিয়া আনিয়াছেন। মঠের সাম্‌নে সেখানা বাঁধা রহিয়াছে। স্বামিজী ইচ্ছামত কখনও কখনও ঐ বজ্‌রায় করিয়া গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করিয়া থাকেন।

আজ রবিবার। শিষ্য মঠে আসিয়াছে এবং আহারান্তে স্বামিজীর ঘরে বসিয়া স্বামিজীর সহিত কথোপকথন করিতেছে। মঠে স্বামিজী এই সময় সন্ন্যাসী ও বালব্রহ্মচারিগণের জন্য কতকগুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন; গৃহস্থদের সঙ্গ হইতে দূরে থাকাই ঐগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল; যথা,—পৃথক্ আহারের স্থান, পৃথক্ বিশ্রামের স্থান ইত্যাদি। ঐ বিষয় লইয়াই এখন কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

স্বামিজী। গেরস্তদের গায়ে কাপড়ে আজকাল কেমন একটা সংযমহীনতার গন্ধ পাই; তাই মঠে নিয়ম করেছি, গেরস্তরা সাধুদের বিছানায় না বসে, শোয়। আগে শাস্ত্রে পড়্‌তুম যে, ঐরূপ পাওয়া যায় এবং সেজন্য সন্ন্যাসীরা গৃহস্থদের গন্ধ সহিতে পারে না; এখন দেখ্‌ছি ঠিক কথা। নিয়মগুলি প্রতিপালন করে চল্‌লে, বাল-ব্রহ্মচারিদের কালে ঠিক ঠিক সন্ন্যাস হবে। সন্ন্যাস-নিষ্ঠা দৃঢ় হলে পর, গৃহস্থদের সহিত সমভাবে মিলে মিশে থাক্‌লেও আর ক্ষতি হবে না। কিন্তু এখন নিয়মের গণ্ডির ভিতর না রাখ্‌লে সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীরা সব বিগড়ে যাবে। যথার্থ ব্রহ্মচারী হতে হলে প্রথম প্রথম সংযম সম্বন্ধে কঠোর নিয়ম পালন করে চল্‌তে হয়, স্ত্রীলোকের নাম-গন্ধ থেকে ত দূরে থাক্‌তেই হয়, তা ছাড়া, স্ত্রী-সঙ্গীদের সঙ্গও ত্যাগ কর্‌তেই হয়।

গৃহস্থাশ্রমী শিষ্য স্বামিজীর কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল এবং মঠের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীদিগের সহিত পূর্ব্বের মত সমভাবে মিশিতে পারিবে না ভাবিয়া বিমর্ষ হইয়া কহিল, "কিন্তু মহাশয়, এই মঠ ও মঠস্থ যাবতীয় লোককে আমার বাড়ী ঘর স্ত্রী-পুত্রের অপেক্ষা অধিক আপনার বলিয়া মনে হয়। ইহারা সকলে যেন কতকালের চেনা! মঠে আমি যেমন সর্ব্বতোমুখী স্বাধীনতা উপভোগ করি জগতের কোথাও আর তেমন করি না!"

স্বামিজী। যত শুদ্ধসত্ত্ব লোক আছে, সবারই এখানে ঐরূপ অনুভূতি হবে। যার হয় না, সে জান্‌বি, এখানকার

লোক নয়। কত লোক হুজুগে মেতে এসে আবার যে পালিয়ে যায়, উহাই তার কারণ। ব্রহ্মচর্য্যবিহীন, দিন রাত অর্থ অর্থ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমন সব লোকে এখানকার ভাব কখনও বুঝতে পার্‌বে না, কখনও মঠের লোককে আপনার বলে মনে কর্‌বে না। এখানকার সন্ন্যাসীরা সেকেলে ছাই-মাখা, মাথায় জটা, চিম্‌টে হাতে, ঔষধ দেওয়া সন্ন্যাসীদের মত নয়; তাই লোকে দেখে শুনে কিছুই বুঝতে পারে না। আমাদের ঠাকুরের চাল চলন, ভাব—সকলই নূতন ধরণের ছিল—তাই আমরাও সব নূতন রকমের; কখনও সেজে গুজে 'বক্তৃতা' দিই, আবার কখনও 'হর হর ব্যোম্ ব্যোম্' বলে ছাই মেখে পাহাড় জঙ্গলে ঘোর তপস্যায় মন দিই!

শুধু সেকেলে পাঁজি পুঁথির দোহাই দিলে এখন আর কি চলে রে? এই পাশ্চাত্য সভ্যতার উদ্বেল প্রবাহ তর্‌ তর্‌ করে এখন দেশ জুড়ে বয়ে যাচ্ছে। তার উপযোগিতা একটুও প্রত্যক্ষ না করে কেবল পাহাড়ে বসে ধ্যানস্থ থাক্‌লে এখন আর কি চলে? এখন চাই—গীতায় ভগবান্ যা বলেছেন—প্রবল কর্ম্মযোগ—হৃদয়ে অসীম সাহস, অমিত বল পোষণ করা। তবে ত দেশের লোকগুলো সব জেগে উঠ্‌বে, নতুবা 'তুমি যে তিমিরে', তারাও সেই তিমিরে।

বেলা প্রায় অবসান। স্বামিজী গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণোপযোগী সাজ

করিয়া নীচে নামিলেন এবং মঠের জমিতে যাইয়া পূর্ব্বদিকে এখন যেখানে পোস্তা গাঁথা হইয়াছে, সেখানে পদচারণা করিয়া কিছুক্ষণ বেড়াইতে লাগিলেন। পরে বজ্‌রাখানি ঘাটে আনা হইলে, স্বামী নির্ভয়ানন্দ, নিত্যানন্দ ও শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া নৌকায় উঠিলেন।

নৌকায় উঠিয়া স্বামিজী ছাতে বসিলে, শিষ্য তাঁহার পাদমূলে উপবেশন করিল। গঙ্গার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি নৌকার তলদেশে প্রতিহত হইয়া কল কল শব্দ করিতেছে, মৃদুল মলয়ানিল প্রবাহিত হইতেছে, আকাশের পশ্চিমদিক্ এখনও সন্ধ্যার রক্তিম রাগে রঞ্জিত হয় নাই—ভগবান্ মরীচিমালী অস্ত যাইতে এখনও অর্দ্ধঘণ্টা বাকী। নৌকা উত্তর দিকে চলিয়াছে। স্বামিজীর মুখে প্রফুল্লতা, নয়নে কোমলতা, কথায় উদাসীনতা এবং প্রতি হাবভাবে জিতেন্দ্রিয়তা, অভিব্যক্ত হইতেছে!—সে এক ভাবপূর্ণরূপ, যে না দেখিয়াছে, তাহাকে বুঝান অসম্ভব।

এইবার দক্ষিণেশ্বর ছাড়াইয়া নৌকা অনুকূল বায়ুবশে আরও উত্তরে অগ্রসর হইতেছে। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী দেখিয়া শিষ্য ও অপর সন্ন্যাসিদ্বয় প্রণাম করিল। স্বামিজী কিন্তু কি এক গভীর ভাবে আত্মহারা হইয়া এলোথেলো ভাবে বসিয়া রহিলেন। শিষ্য ও সন্ন্যাসীরা পরস্পরে দক্ষিণেশ্বরের কত কথা বলিতে লাগিল, সে সকল কথা যেন স্বামিজীর কর্ণে প্রবিষ্টই হইল না; দেখিতে দেখিতে নৌকা পেনেটীর দিকে অগ্রসর হইল। পেনেটীতে ৺গোবিন্দকুমার চৌধুরীর বাগানবাটীর ঘাটে নৌকা কিছুক্ষণের জন্য বাঁধা হইল। এই বাগানখানিই ইতিপূর্ব্বে একবার মঠের জন্য ভাড়া করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। স্বামিজী অবতরণ করিয়া

বাগান ও বাটী বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন—'বাগানটি বেশ, কিন্তু কল্‌কাতা থেকে অনেক দূর ; ঠাকুরের শিষ্যদের যেতে আস্‌তে কষ্ট হত ; এখানে মঠ যে হয় নি, তা ভালই হয়েছে।'

এইবার নৌকা আবার মঠের দিকে চলিল এবং প্রায় এক ঘণ্টাকাল নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া চলিতে চলিতে পুনরায় মঠে উপস্থিত হইল।

নবম বল্লী

স্থান—বেলুড় মঠ

বর্ষ—১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে

বিষয়

স্বামিজীর নাগ মহাশয়ের সহিত মিলন—পরস্পরের সম্বন্ধে উভয়ের উচ্চ ধারণা।

শিষ্য অদ্য নাগ মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া মঠে আসিয়াছে।

স্বামিজী। (নাগ মহাশয়কে প্রণাম করিয়া) ভাল আছেন ত?

নাগ মহাশয়। আপনাকে দর্শন করতে এলাম। জয় শঙ্কর! জয় শঙ্কর! সাক্ষাৎ শিব দর্শন হল।

কথাগুলি বলিয়া জোড় হস্ত করিয়া নাগ মহাশয় দণ্ডায়মান রহিলেন।

স্বামিজী। শরীর কেমন আছে?

নাগ মহাশয়। ছাই হাড় মাসের কথা কি জিজ্ঞাসা করছেন? আপনার দর্শনে আজ ধন্য হলাম, ধন্য হলাম।

ঐরূপ বলিয়া নাগ মহাশয় স্বামিজীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন।

স্বামিজী। (নাগ মহাশয়কে তুলিয়া) ও কি কচ্ছেন?

নাগ মঃ। আমি দিব্য চক্ষে দেখ্‌ছি—আজ সাক্ষাৎ শিবের দর্শন পেলাম। জয় ঠাকুর রামকৃষ্ণ!

স্বামিজী। (শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া) দেখ্‌ছিস্—ঠিক ভক্তিতে

মানুষ কেমন হয়! নাগ মহাশয় তন্ময় হয়ে গেছেন, দেহবুদ্ধি একেবারে গেছে। এমনটি আর দেখা যায় না। (প্রেমানন্দ স্বামিজীকে লক্ষ্য করিয়া) নাগ মহাশয়ের জন্য প্রসাদ নিয়ে আয়।

নাগ মঃ। প্রসাদ! প্রসাদ! (স্বামিজীর প্রতি করজোড়ে) আপনার দর্শনে আজ আমার ভবক্ষুধা দূর হয়ে গেছে।

মঠে বালব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসিগণ উপনিষদ্ পাঠ করিতেছিলেন। স্বামিজী তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"আজ ঠাকুরের একজন মহাভক্ত এসেছেন। নাগ মহাশয়ের শুভাগমনে আজ তোমাদের পাঠ বন্ধ থাকিল।" সকলেই বই বন্ধ করিয়া নাগ মহাশয়ের চারিদিকে ঘেরিয়া বসিল। স্বামিজীও নাগ মহাশয়ের সম্মুখে বসিলেন।

স্বামিজী। (সকলকে লক্ষ্য করিয়া) দেখছিস্! নাগ মহাশয়কে দেখ; ইনি গেরস্ত; কিন্তু জগৎ আছে কি নেই, এঁর সে জ্ঞান নেই; সর্ব্বদা তন্ময় হয়ে আছেন! (নাগ মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া) এই সব ব্রহ্মচারী ও আমাদিগকে ঠাকুরের কিছু কথা শুনান।

নাগ মঃ। ও কি বলেন! ও কি বলেন! আমি কি বল্‌ব? আমি আপনাকে দেখ্‌তে এসেছি; ঠাকুরের লীলার সহায় মহাবীরকে দর্শন করতে এসেছি। ঠাকুরের কথা এখন লোকে বুঝ্‌বে। জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ!

স্বামিজী। আপনিই যথার্থ রামকৃষ্ণদেবকে চিনেছেন। আমরা ঘুরে ঘুরেই মর্‌লুম্।

নাগ মঃ। ছিঃ! ওকথা কি বল্‌ছেন! আপনি ঠাকুরের ছায়া—
এপিঠ্ আর ওপিঠ্; যার চোখ আছে, সে দেখুক।

স্বামিজী। এ সব যে মঠ ফঠ হচ্ছে, একি ঠিক হচ্ছে?

নাগ মঃ। আমি ক্ষুদ্র, আমি কি বুঝি? আপনি যা করেন, নিশ্চয় জানি তাতে জগতের মঙ্গল হবে—মঙ্গল হবে।

অনেকে নাগ মহাশয়ের পদধূলি লইতে ব্যস্ত হওয়ায় নাগ মহাশয় উন্মাদের মত হইলেন, স্বামিজী সকলকে বলিলেন "যাতে এঁর কষ্ট হয়, তা করো না"; শুনিয়া সকলে নিরস্ত হইলেন।

স্বামিজী। আপনি এসে মঠে থাকুন না কেন? আপনাকে দেখে মঠের ছেলেরা সব শিখ্‌বে।

নাগ মঃ। ঠাকুরকে ঐ কথা একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বল্লেন, 'গৃহেই থেকো।' তাই গৃহেই আছি; মধ্যে মধ্যে আপনাদিগকে দেখে ধন্য হয়ে যাই।

স্বামিজী। আমি একবার আপনার দেশে যাব।

নাগ মহাশয় আনন্দে উন্মত্ত হইয়া বলিলেন—"এমন দিন কি হবে? দেশ কাশী হয়ে যাবে, কাশী হয়ে যাবে। সে অদৃষ্ট আমার হবে কি?"

স্বামিজী। আমার ত ইচ্ছা আছে। এখন মা নিয়ে গেলে হয়।

নাগ মঃ। আপনাকে কে বুঝবে—কে বুঝ্‌বে? দিব্য দৃষ্টি না খুল্‌লে চিন্‌বার যো নেই। একমাত্র ঠাকুরই চিনেছিলেন; আর সকলে তাঁর কথায় বিশ্বাস করে মাত্র, কেউ বুঝ্‌তে পারে নি।

স্বামিজী। আমার এখন একমাত্র ইচ্ছা, দেশটাকে জাগিয়ে তুলি—

মহাবীর যেন নিজের শক্তিমত্তায় অনাস্থাপর হয়ে ঘুমুচ্ছে —সাড়া নেই—শব্দ নেই। সনাতন ধর্ম্মভাবে একে কোনরূপে জাগাতে পাল্লে বুঝব, ঠাকুরের ও আমাদের আসা সার্থক হল। কেবল ঐ ইচ্ছেটা আছে—মুক্তি ফুক্তি তুচ্ছ বোধ হয়েছে। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, যেন কৃতকার্য্য হওয়া যায়।

নাগ মঃ। ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ। আপনার ইচ্ছার গতি ফেরায় এমন কাহাকেও দেখি না ; যা ইচ্ছা করবেন—তাই হবে।

স্বামিজী। কই কিছুই হয় না—তাঁর ইচ্ছা ভিন্ন কিছুই হয় না।

নাগ মঃ। তাঁর ইচ্ছা আর আপনার ইচ্ছা এক হয়ে গেছে ; আপনার যা ইচ্ছা, তা ঠাকুরেরই ইচ্ছা। জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ!

স্বামিজী। কাজ করতে মজবুত শরীর চাই ; এই দেখুন, এদেশে এসে অবধি শরীর ভাল নেই ; ওদেশে (ইউরোপে, আমেরিকায়) বেশ ছিলুম।

নাগ মঃ। শরীর ধারণ কল্লেই—ঠাকুর বলতেন—"ঘরের টেক্স দিতে হয়।" রোগ শোক সেই টেক্স। আপনি যে মোহরের বাক্স ; ঐ বাক্সের খুব যত্ন চাই ; কে করবে? কে বুঝবে? ঠাকুরই একমাত্র বুঝেছিলেন। জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ!

স্বামিজী। মঠের এরা আমায় খুব যত্নে রাখে।

নাগ মঃ। যাঁরা করছেন, তাঁদেরই কল্যাণ, বুঝুক আর নাই বুঝুক। সেবার কমতি হলে দেহ রাখা ভার হবে।

স্বামিজী। নাগ মহাশয়! কি যে কর্‌ছি, কি না কর্‌ছি—কিছু বুঝতে পাচ্ছিনে। এক এক সময়ে এক এক দিকে মহা ঝোঁক আসে, সেই মত কাজ করে যাচ্ছি, এতে ভাল হচ্ছে কি মন্দ হচ্ছে, কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।

নাগ মঃ। ঠাকুর যে বলেছিলেন—"চাবি দেওয়া রইল।" তাই এখন বুঝতে দিচ্ছেন না। বুঝামাত্রই লীলা ফুরিয়ে যাবে।

স্বামিজী একদৃষ্টে কি ভাবিতেছিলেন। এমন সময়ে স্বামী প্রেমানন্দ ঠাকুরের প্রসাদ লইয়া আসিলেন এবং নাগ মহাশয় ও অন্যান্য সকলকে দিলেন। নাগ মহাশয় দুই হাতে করিয়া প্রসাদ মাথায় তুলিয়া, 'জয় রামকৃষ্ণ' বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। সকলে দেখিয়া অবাক্। প্রসাদ পাইয়া সকলে বাগানে পাইচারী করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে স্বামিজী একখানি কোদাল লইয়া আস্তে আস্তে মঠের পুকুরের পূর্ব্বপারে মাটী কাটিতেছিলেন—নাগ মহাশয় দর্শনমাত্র তাঁহার হস্ত ধরিয়া বলিলেন,—"আমরা থাক্‌তে আপনি ও কি করেন? স্বামিজী কোদাল ছাড়িয়া মাঠে বেড়াইতে বেড়াইতে গল্প বলিতে লাগিলেন। স্বামিজী একজন শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন,—"ঠাকুরের দেহ যাবার পর একদিন শুন্‌লুম, নাগ মহাশয় চার পাঁচ দিন উপোস করে তাঁর কল্‌কাতার খোলার ঘরে পড়ে আছেন; আমি, হরি ভাই ও আর কে একজন মিলে ত নাগ মহাশয়ের কুটিরে গিয়ে হাজির; দেখেই লেপমুড়ি ছেড়ে উঠ্‌লেন। আমি বল্লুম, আপনার এখানে আজ ভিক্ষা পেতে হবে। অমনি নাগ মহাশয় বাজার থেকে চাল,

হাঁড়ী, কাঠ প্রভৃতি এনে রাঁধতে সুরু করলেন। আমরা মনে করেছিলুম— আমরাও খাব, নাগ মহাশয়কেও খাওয়াব। রান্না বান্না করে ত আমাদের দেওয়া হল; আমরা নাগ মহাশয়ের জন্য সব রেখে দিয়ে আহারে বস্‌লুম। আহারের পর, ওঁকে খেতে যাই অনুরোধ করা, আর তখনি ভাতের হাঁড়ী ভেঙ্গে ফেলে কপালে আঘাত করে বল্‌তে লাগলেন, 'যে দেহে ভগবান্ লাভ হল না, সে দেহকে আবার আহার দিব?' আমরা ত দেখেই অবাক্! অনেক করে, পরে কিছু খাইয়ে তবে আমরা ফিরে এলুম।"

স্বামিজী। নাগ মহাশয় আজ মঠে থাকবেন কি?

শিষ্য। না; ওঁর কি কাজ আছে; আজই যেতে হবে।

স্বামিজী। তবে নৌকা দেখ্। সন্ধ্যা হয়ে এল।

নৌকা আসিলে, শিষ্য ও নাগ মহাশয় স্বামিজীকে প্রণাম করিয়া নৌকারোহণে কলিকাতাভিমুখে রওনা হইলেন।

দশম বল্লী

স্থান—বেলুড় মঠ

বিষয়

ব্রহ্ম, ঈশ্বর, মায়া ও জীবের স্বরূপ—সর্ব্বশক্তিমান্ ব্যক্তিবিশেষ বলিয়া ঈশ্বরকে ধারণা করিয়া সাধনায় অগ্রসর হইয়া ক্রমে তাঁহার যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারে—"অহং ব্রহ্ম," এইরূপ বোধ না হইলে মুক্তি নাই—কামকাঞ্চনভোগস্পৃহা ত্যাগ না হইলে ও মহাপুরুষের কৃপালাভ না হইলে উহা হয় না। অন্তর্ব্বহিঃসন্ন্যাসে আত্মজ্ঞান লাভ—'মেদাটে ভাব' ত্যাগ করা—কিরূপ চিন্তায় আত্মজ্ঞান লাভ হয়—মনের স্বরূপ ও মনঃসংযম কিরূপে করিতে হয়—জ্ঞানপথের পথিক আপনার যথার্থ স্বরূপকেই ধ্যানের বিষয়রূপে অবলম্বন করিবে—অদ্বৈতাবস্থালাভে অনুভব—জ্ঞান, ভক্তি, যোগরূপ সকল পথের লক্ষ্যই জীবকে ব্রহ্মজ্ঞ করা—অবতার তত্ত্ব—আত্মজ্ঞানলাভে উৎসাহ প্রদান—আত্মজ্ঞ পুরুষের কর্ম্ম 'জগদ্ধিতায়' হয়।

এখন স্বামিজী বেশ সুস্থ আছেন। শিষ্য রবিবার প্রাতে মঠে আসিয়াছে। স্বামিজীর পাদ-পদ্ম দর্শনান্তে সে নীচে আসিয়া স্বামী নির্ম্মলানন্দের সহিত বেদান্তশাস্ত্রের আলোচনা করিতেছে। এমন সময়ে স্বামিজী নীচে নামিয়া আসিলেন এবং শিষ্যকে দেখিয়া বলিলেন, "কিরে, তুলসীর সঙ্গে তোর কি বিচার হচ্ছিল ?"

শিষ্য। মহাশয়, তুলসী মহারাজ বলিতেছিলেন, "বেদান্তের ব্রহ্মবাদ কেবল তোর স্বামিজী আর তুই বুঝিস্। আমরা কিন্তু জানি—'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'।"

স্বামিজী। তুই কি বল্‌লি ?

শিষ্য। আমি বলিলাম, এক আত্মাই সত্য। কৃষ্ণ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ছিলেন মাত্র। তুলসী মহারাজ ভিতরে বেদান্তবাদী; বাহিরে কিন্তু দ্বৈতবাদীর পক্ষ লইয়া তর্ক করেন। ঈশ্বরকে ব্যক্তিবিশেষ বলিয়া কথা অবতারণা করিয়া ক্রমে বেদান্তবাদের ভিত্তি সুদৃঢ় প্রমাণিত করাই তাঁহার অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু উনি আমায় "বৈষ্ণব" বলিলেই আমি ঐ কথা ভুলিয়া যাই এবং তাঁহার সহিত তর্কে লাগিয়া যাই।

স্বামিজী। তুলসী তোকে ভালবাসে কিনা, তাই ঐরূপ বলে তোকে খ্যাপায়। তুই চট্‌বি কেন? তুইও বল্‌বি, "আপনি শূন্যবাদী নাস্তিক।"

শিষ্য। মহাশয়, উপনিষৎ দর্শনাদিতে ঈশ্বর যে শক্তিমান্ ব্যক্তি-বিশেষ, এ কথা আছে কি? লোকে কিন্তু, ঐরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাসবান্।

স্বামিজী। সর্ব্বেশ্বর কথনও ব্যক্তিবিশেষ হতে পারেন না। জীব হচ্ছে ব্যষ্টি; আর সকল জীবের সমষ্টি হচ্ছেন ঈশ্বর। জীবের অবিদ্যা প্রবল; ঈশ্বর, বিদ্যা ও অবিদ্যার সমষ্টি মায়াকে বশীভূত করে রয়েছেন এবং স্বাধীনভাবে এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎটা নিজের ভিতর থেকে project (বাহির) করেছেন। ব্রহ্ম কিন্তু ঐ ব্যষ্টি-সমষ্টির অথবা জীব ও ঈশ্বরের পারে বর্ত্তমান। ব্রহ্মের অংশাংশ ভাগ হয় না। বোঝাবার জন্য তাঁর ত্রিপাদ, চতুষ্পাদ

ইত্যাদি কল্পনা করা হয়েছে মাত্র। যে পাদে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াধ্যাস হচ্ছে, সেই ভাগকেই শাস্ত্র "ঈশ্বর" বলে নির্দ্দেশ করেছে। অপর ত্রিপাদ, কূটস্থ, যাতে কোনরূপ দ্বৈত-কল্পনার ভান নেই, তাই ব্রহ্ম। তা বলে এরূপ যেন মনে করিস্নি ব্রহ্ম জীবজগৎ হতে একটা স্বতন্ত্র বস্তু। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা বলেন, ব্রহ্মই জীব-জগৎরূপে পরিণত হয়েছেন। অদ্বৈতবাদীরা বলেন, তাহা নহে; ব্রহ্মে এই জীবজগৎ অধ্যস্ত হয়েছে মাত্র। কিন্তু বস্তুতঃ উহাতে ব্রহ্মের কোনরূপ পরিণাম হয় নাই। অদ্বৈতবাদী বলেন, নামরূপ নিয়েই জগৎ। যতক্ষণ নামরূপ আছে, ততক্ষণই জগৎ আছে। ধ্যান-ধারণা বলে যখন নামরূপের বিলয় হয়ে যায়, তখন এক ব্রহ্মই থাকেন। তখন তোর, আমার বা জীব-জগতের স্বতন্ত্র সত্তার আর অনুভব হয় না। তখন বোধ হয়, আমিই নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ প্রত্যক্-চৈতন্য বা ব্রহ্ম। জীবের স্বরূপই হচ্ছেন ব্রহ্ম; ধ্যান-ধারণায় নামরূপের আবরণটা দূর হয়ে ঐ ভাবটা প্রত্যক্ষ হয় মাত্র। এই হচ্ছে শুদ্ধাদ্বৈত-বাদের সার মর্ম্ম। বেদ বেদান্ত শাস্ত্র মাত্র এই কথাই নানা রকমে বারংবার বুঝিয়ে দিচ্ছে।

শিষ্য। তাহা হইলে, ঈশ্বর যে সর্ব্বশক্তিমান্ ব্যক্তিবিশেষ—একথা আর সত্য হয় কিরূপে?

স্বামিজী। মনরূপ উপাধি নিয়েই মানুষ। মন দিয়েই মানুষকে সকল বিষয় ধর্‌তে বুঝ্‌তে হচ্ছে। কিন্তু মন যা ভাবে

তা limited (সীমাবদ্ধ) হবেই। এজন্য আপনার personality (ব্যক্তিত্ব) থেকে ঈশ্বরের personality (ব্যক্তিত্ব) কল্পনা করা জীবের স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব। মানুষ তার ideal (আদর্শ) টাকে মানুষরূপেই ভাব্‌তে সক্ষম। এই জরামরণসঙ্কুল জগতে এসে মানুষ দুঃখের ঠেলায় "হা হতোঽস্মি" করে ও এমন এক ব্যক্তির আশ্রয় চায়, যাঁর উপর নির্ভর করে সে চিন্তাশূন্য হতে পারে। কিন্তু আশ্রয় কোথায়? নিরাধার সর্ব্বজ্ঞ আত্মাই একমাত্র আশ্রয়স্থল। প্রথমে মানুষ তা টের পায় না। বিবেক বৈরাগ্য এলে, ধ্যান-ধারণা করতে করতে সেটা ক্রমে টের পায়। কিন্তু যে, যে ভাবেই সাধন করুক না কেন, সকলেই অজ্ঞাতসারে আপনার ভিতরে অবস্থিত ব্রহ্মভাবকে জাগিয়ে তুলছে। তবে, আলম্বন ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। যার Personal Godএ (ঈশ্বরের ব্যক্তিবিশেষত্বে) বিশ্বাস আছে, তাকে ঐ ভাব ধরেই সাধন ভজন করতে হয়। ঐকান্তিকতা এলে ঐ থেকেই কালে ব্রহ্ম-সিংহ তার ভেতরে জেগে ওঠেন। ব্রহ্মজ্ঞানই হচ্ছে জীবের Goal (একমাত্র গম্য বা লভ্য)। তবে নানা পথ—নানা মত। জীবের পারমার্থিক স্বরূপ ব্রহ্ম হলেও মনরূপ উপাধিতে অভিমান থাকায়; সে হরেক্ রকম সন্দেহ, সংশয়, সুখ, দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু নিজের স্বরূপ লাভে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেই গতিশীল। যতক্ষণ না "অহং ব্রহ্ম" এই তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হবে

ততক্ষণ এই জন্মমৃত্যুগতির হাত থেকে কারুরই নিস্তার নেই। মানুষজন্ম লাভ করে, মুক্তির ইচ্ছা প্রবল হলে ও মহাপুরুষের কৃপালাভ হলে, তবে মানুষের আত্মজ্ঞান-স্পৃহা বলবতী হয়। নতুবা কাম-কাঞ্চনজড়িত লোকের ওদিকে মনের গতিই হয় না। মাগ্, ছেলে, ধন মান লাভ করবে বলে মনে যার সঙ্কল্প রয়েছে, তার কি করে ব্রহ্ম-বিবিদিষা হবে? যে সব ত্যাগ করতে প্রস্তুত, যে সুখ দুঃখ ভালমন্দের চঞ্চল প্রবাহে ধীর, স্থির, শান্ত, সমনস্ক, সেই আত্মজ্ঞান লাভে যত্নপর হয়। সেই "নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী"—মহাবলে জগজ্জাল ছিন্ন করে মায়ার গণ্ডি ভেঙ্গে সিংহের মত বেরিয়ে পড়ে।

শিষ্য। তবে কি মহাশয়, সন্ন্যাস ভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই পারেনা?

স্বামিজী। তা একবার বল্‌তে? অন্তর্ব্বহিঃ উভয় প্রকারেই সন্ন্যাস অবলম্বন করা চাই। আচার্য্য শঙ্করও উপনিষদের "তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ" এই অংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলছেন—লিঙ্গহীন অর্থাৎ সন্ন্যাসের বাহ্য চিহ্নস্বরূপ গৈরিকবসন, দণ্ড, কমণ্ডলু প্রভৃতি ধারণ না করে তপস্যা করলে, দুরধিগম্য ব্রহ্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ হয় না।* বৈরাগ্য না এলে—ত্যাগ না এলে—ভোগস্পৃহা ত্যাগ না হলে কি কিছু হবার যো আছে?—"সে যে ছেলের হাতে মোয়া নয় যে, ভোগা দিয়ে কেড়ে খাবে।"

শিষ্য। কিন্তু সাধন করিতে করিতে ক্রমে ত ত্যাগ আসিতে পারে?

---

* ৩য় মুণ্ডকে, ২য় খণ্ড, ৪ মন্ত্রের ভাষ্য দেখুন।

স্বামিজী। যার ক্রমে আসে, তার আসুক্। তুই তা বলে বসে থাক্‌বি কেন ? এখনি খাল কেটে জল আনতে লেগে যা। ঠাকুর বল্‌তেন, "হচ্ছে—হবে ওসব মেদাটে ভাব।" পিপাসা পেলে কি কেউ বসে থাক্‌তে পারে ? —না জলের জন্য ছুটোছুটি করে বেড়ায় ? পিপাসা পায়নি তাই বসে আছিস। বিবিদিষা প্রবল হয় নি, তাই মাগ ছেলে নিয়ে সংসার কচ্ছিস্।

শিষ্য। বাস্তবিক কেন যে এখনও ঐরূপ সর্ব্বস্ব ত্যাগের বুদ্ধি হয় না, তাহা বুঝিতে পারি না। আপনি ইহার একটা উপায় করিয়া দিন্।

স্বামিজী। উদ্দেশ্য ও উপায় সবই তোর হাতে। আমি কেবল Stimulate (ঐ বিষয়ের বাসনা মনে প্রবল) করে দিতে পারি। এই সব সৎশাস্ত্র পড়ছিস্।—এমন ব্রহ্মজ্ঞ সাধুদের সেবা ও সঙ্গ কচ্ছিস্—এতেও যদি না ত্যাগের ভাব আসে, তবে জীবনই বৃথা। তবে একেবারে বৃথা হবে না—কালে এর ফল তেড়েফুঁড়ে বেরুবেই বেরুবে।

শিষ্য অধোমুখে বিষণ্ণভাবে নিজের পরিণাম কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া পুনরায় স্বামিজীকে বলিতে লাগিল, "মহাশয়, আমি আপনার শরণাগত, আমার মুক্তিলাভের পন্থা খুলিয়া দিন্—আমি যেন এই শরীরেই তত্ত্বজ্ঞ হইতে পারি।"

স্বামিজী শিষ্যের অবসন্নতা দর্শন করিয়া বলিলেন, "ভয় কি ? সর্ব্বদা বিচার কর্‌বি—এই দেহ, গেহ, জীবজগৎ সকলি নিঃশেষ

মিথ্যা—স্বপ্নের মত, সর্ব্বদা ভাব্‌বি এই দেহটা একটা জড় যন্ত্র মাত্র। এতে যে আত্মারাম পুরুষ রয়েছেন, তিনিই তোর যথার্থ স্বরূপ। মনরূপ উপাধিটাই তাঁর প্রথম ও সূক্ষ্ম আবরণ, তার পর দেহটা তাঁর স্থূল আবরণ হয়ে রয়েছে। নিষ্কল, নির্ব্বিকার, স্বয়ংজ্যোতিঃ সেই পুরুষ এই সব মায়িক আবরণে আচ্ছাদিত থাকায়, তুই তোর স্বস্বরূপকে জান্‌তে পাচ্ছিস্‌ না। এই রূপরসে ধাবিত মনের গতি অন্তর্দ্দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে। মনটাকে মার্‌তে হবে। দেহটা ত স্থূল—এটা মরে পঞ্চভূতে মিশে যায়। কিন্তু সংস্কারের পুঁটুলী—মনটা শীগ্‌গির মরে না। বীজের ন্যায় কিছুকাল থেকে আবার বৃক্ষে পরিণত হয়; আবার স্থূল শরীর ধারণ করে জন্মমৃত্যুপথে গমনাগমন করে! এইরূপ—যতক্ষণ না আত্মজ্ঞান হয়। সেজন্য বলি, ধ্যান-ধারণা ও বিচারবলে মনকে সচ্চিদানন্দ-সাগরে ডুবিয়ে দে। মনটা মরে গেলেই সব গেল—ব্রহ্মসংস্থ হলি!

শিষ্য। মহাশয়, এই উদ্দাম উন্মত্ত মনকে ব্রহ্মাবগাহী করা মহা কঠিন।

স্বামিজী। বীরের কাছে আবার কঠিন বলে কোনও জিনিষ আছে? কাপুরুষেরাই ওকথা বলে! "বীরাণামেব করতলগতা মুক্তিঃ, ন পুনঃ কাপুরুষাণাম্‌।" অভ্যাস ও বৈরাগ্য বলে মনকে সংযত কর্‌। গীতা বল্‌ছেন, "অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।" চিত্ত হচ্ছে যেন স্বচ্ছ হ্রদ। রূপরসাদির আঘাতে তাতে যে তরঙ্গ উঠ্‌ছে, তার নামই মন। এজন্যই মনের স্বরূপ সংকল্পবিকল্পাত্মক।

ঐ সঙ্কল্পবিকল্প থেকেই বাসনা ওঠে। তার পর, ঐ মনই ক্রিয়াশক্তিরূপে পরিণত হয়ে স্থূলদেহরূপ যন্ত্র দিয়ে কার্য্য করে। আবার কর্ম্মও যেমন অনন্ত, কর্ম্মের ফলও তেমনি অনন্ত। সুতরাং অনন্ত, অযুত কর্ম্মফলরূপ তরঙ্গে মন সর্ব্বদা দুল্‌ছে। সেই মনকে বৃত্তিশূন্য করে দিতে হবে —স্বচ্ছ হ্রদে পুনরায় পরিণত কর্‌তে হবে—যাতে বৃত্তি-রূপ তরঙ্গ আর একটীও না থাকে। তবে ব্রহ্ম প্রকাশ হবেন। শাস্ত্রকার ঐ অবস্থারই আভাস এই ভাবে দিচ্ছেন—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ" ইত্যাদি—বুঝ্‌লি ?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ, কিন্তু ধ্যানে ত বিষয়াবলম্বী হওয়া চাই ?

স্বামিজী। তুই নিজেই নিজের বিষয় হবি। তুই সর্ব্বগ আত্মা—এইটিই মনন ও ধ্যান করবি। আমি দেহ নই—মন নই —বুদ্ধি নই—স্থূল নই—সূক্ষ্ম নই—এইরূপে "নেতি" "নেতি" করে প্রত্যক্‌চৈতন্যরূপ স্বস্বরূপে মনকে ডুবিয়ে দিবি। এইরূপে মন শালাকে বারংবার ডুবিয়ে ডুবিয়ে মেরে ফেল্‌বি। তবেই বোধস্বরূপের বোধ বা স্বস্বরূপে স্থিতি হবে। ধ্যাতা-ধ্যেয়-ধ্যান তখন এক হয়ে যাবে। জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান এক হয়ে যাবে। নিখিল অধ্যাসের নিবৃত্তি হবে। একেই বলে শাস্ত্রে "ত্রিপুটিভেদ"। ঐরূপ অবস্থায় জানাজানি থাকে না। আত্মাই যখন একমাত্র বিজ্ঞাতা, তখন তাঁকে আবার জানবি কি করে ? আত্মাই জ্ঞান—আত্মাই চৈতন্য—আত্মাই সচ্চিদানন্দ। যাকে সৎ বা অসৎ কিছুই বলে নির্দ্দেশ করা যায় না, সেই

অনির্ব্বচনীয়া মায়াশক্তিপ্রভাবেই জীবরূপী ব্রহ্মের ভেতরে জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞানের ভাবটা এসেছে। এটাকেই সাধারণ মানুষ Conscious state (চৈতন্য বা জ্ঞানের অবস্থা) বলে। আর যেখানে এই দ্বৈত সংঘাত নিরাবিল ব্রহ্মতত্ত্বে এক হয়ে যায়, তাকেই শাস্ত্র Superconscious state (সমাধি বা সাধারণ জ্ঞানভূমি অপেক্ষা উচ্চাবস্থা) বলে এইরূপে বর্ণনা করেছেন—"স্তিমিতসলিলরাশিপ্রখ্যমাখ্যাবিহীনম্ !"

কথাগুলি, স্বামিজী যেন ব্রহ্মানুভবের অগাধ জলে ডুবিয়া যাইয়াই বলিতে লাগিলেন।

স্বামিজী। এই জ্ঞাতা জ্ঞেয় বা জানাজানি ভাব থেকেই দর্শন, শাস্ত্র, বিজ্ঞান সব বেরিয়েছে। কিন্তু মানবমনের কোনও ভাব বা ভাষা জানাজানির পারের বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারছে না! দর্শন-বিজ্ঞানাদি Partial truth (আংশিক ভাবে সত্য)। উহারা সেইজন্য পরমার্থতত্ত্বের সম্পূর্ণ expression (প্রকাশক) কখনই হতে পারে না। এইজন্য পরমার্থের দিক্ দিয়ে দেখ্তে সবই মিথ্যা বলে বোধ হয়—ধর্ম্ম মিথ্যা—কর্ম্ম মিথ্যা —আমি মিথ্যা—তুই মিথ্যা—জগৎ মিথ্যা। তখনই দেখে যে আমিই সব ; আমিই সর্ব্বগত আত্মা ; আমার প্রমাণ আমিই। আমার অস্তিত্বের প্রমাণের জন্য আবার প্রমাণান্তরের অপেক্ষা কোথায় ? আমি—শাস্ত্রে যেমন বলে—"নিত্যমস্মৎপ্রসিদ্ধম্।" আমি ঐ অবস্থা সত্যসত্যই দেখেছি—অনুভূতি করেছি। তোরাও ত্থাখ্—অনুভূতি

কর্—আর জীবকে এই ব্রহ্মতত্ত্ব শোনাগে। তবে ত শান্তি পাবি।

ঐ কথা বলিতে বলিতে স্বামিজীর বদন গম্ভীর ভাব ধারণ করিল এবং তাঁহার মন যেন কোন্ এক অজ্ঞাতরাজ্যে যাইয়া কিছুক্ষণের জন্য স্থির হইয়া গেল! কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার বলিতে লাগিলেন—"এই সর্ব্বমতগ্রাসিনী, সর্ব্বমতসমঞ্জসা ব্রহ্মবিদ্যা নিজে অনুভব কর্—আর জগতে প্রচার কর্। উহাতে নিজের মঙ্গল হবে, জীবেরও কল্যাণ হবে। তোকে আজ সার কথা বল্লুম; এর চাইতে বড় কথা আর কিছুই নেই!"

শিষ্য। মহাশয়, আপনি এখন জ্ঞানের কথা বলিতেছেন; আবার কখনও বা ভক্তির, কখনও কর্ম্মের ও কখনও যোগের প্রাধান্য কীর্ত্তন করেন। উহাতে আমাদের বুদ্ধি গুলাইয়া যায়।

স্বামিজী। কি জানিস্?—এই ব্রহ্মজ্ঞ হওয়াই চরম লক্ষ্য—পরম পুরুষার্থ। তবে মানুষ ত আর সর্ব্বদা ব্রহ্মসংস্থ হয়ে থাকতে পারে না? ব্যুত্থানকালে কিছু নিয়ে ত থাকতে হবে? তখন এমন কর্ম্ম করা উচিত, যাতে লোকের শ্রেয়োলাভ হয়। এইজন্য তোদের বলি, অভেদবুদ্ধিতে জীবসেবারূপ কর্ম্ম কর্। কিন্তু বাবা, কর্ম্মের এমন মার-প্যাঁচ যে, মহামহা সাধুরাও এতে বদ্ধ হয়ে পড়েন! সেই জন্য ফলাকাঙ্ক্ষাহীন হয়ে কর্ম্ম করতে হয়। গীতায় ঐ কথাই বলেছে। কিন্তু জান্‌বি, ব্রহ্মজ্ঞানে কর্ম্মের অনুপ্রবেশও নেই। সৎকর্ম্ম দ্বারা বড় জোর চিত্তশুদ্ধি

হয়। এইজন্যই ভাষ্যকার জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়ের প্রতি এত তীব্র কটাক্ষ—এত দোষারোপ করেছেন। নিষ্কাম কর্ম্ম থেকে কারও কারও ব্রহ্মজ্ঞান হতে পারে। এও একটা উপায় বটে; কিন্তু উদ্দেশ্য হচ্ছে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ। এ কথাটা বেশ করে জেনে রাখ্—বিচারমার্গ ও অন্য সকল প্রকার সাধনার ফল হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞতা লাভ করা।

শিষ্য। মহাশয়, একবার ভক্তি ও রাজযোগের উপযোগিত্ব বলিয়া আমার জানিবার আকাঙ্ক্ষা দূর করুন।

স্বামিজী। ঐ সব পথে সাধন করতে করতেও কারও কারও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়ে যায়। ভক্তিমার্গ—slow process, দেরীতে ফল হয়—কিন্তু সহজসাধ্য। যোগে নানা বিঘ্ন। হয় ত বিভূতিপথে মন চলে গেল; আর স্বরূপে পৌঁছুতে পারলে না। এক মাত্র জ্ঞানপথই আশুফলপ্রদ এবং সর্ব্বমত-সংস্থাপক বলিয়া সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে সমানাদৃত। তবে, বিচারপথে চল্‌তে চল্‌তেও মন দুস্তর তর্কজালে বদ্ধ হয়ে যেতে পারে। এইজন্য সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান করা চাই। বিচার ও ধ্যান বলে উদ্দেশ্যে বা ব্রহ্মতত্ত্বে পৌঁছুতে হবে। এইভাবে সাধন করলে goalএ (গম্যস্থানে) ঠিক পৌঁছান যায়। এই আমার মতে সহজ পন্থা ও আশুফলপ্রদ।

শিষ্য। এইবার আমায় অবতারবাদ বিষয়ে কিছু বলুন।

স্বামিজী। তুই যে এক দিনেই সব মেরে নিতে চাস!

শিষ্য। মহাশয়, মনের ধাঁধা একদিনে মিটে যায় ত বারবার আর আপনাকে বিরক্ত হইতে হইবে না।

স্বামিজী। যে আত্মার এত মহিমা শাস্ত্রমুখে অবগত হওয়া যায়, সেই আত্মজ্ঞান যাঁদের কৃপায় এক মুহূর্ত্তে লাভ হয়, তাঁরাই সচল তীর্থ—অবতারপুরুষ। তাঁরা আজন্ম ব্রহ্মজ্ঞ, এবং ব্রহ্ম ও ব্রহ্মজ্ঞে কিছুমাত্র তফাৎ নেই—"ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।" আত্মাকে ত আর জানা যায় না, কারণ, এই আত্মাই বিজ্ঞাতা ও মন্তা হয়ে রয়েছেন—এ কথা পূর্ব্বেই বলেছি। অতএব মানুষের জানাজানি ঐ অবতার পর্য্যন্ত—যাঁরা আত্মসংস্থ। মানববুদ্ধি ঈশ্বর-সম্বন্ধে Highest ideal (সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ভাব) যা গ্রহণ করতে পারে, তা ঐ পর্য্যন্ত। তারপর, আর জানাজানি থাকে না। ঐরূপ ব্রহ্মজ্ঞ কদাচিৎ জগতে জন্মায়। তাঁদের অল্প লোকেই বুঝ্‌তে পারে। তাঁরাই শাস্ত্রোক্তির প্রমাণস্থল—ভবসমুদ্রের আলোকস্তম্ভস্বরূপ। এই অবতারগণের সঙ্গ ও কৃপাদৃষ্টিতে মুহূর্ত্তমধ্যে হৃদয়ের অন্ধকার দূর হয়ে যায়—সহসা ব্রহ্মজ্ঞানের স্ফুরণ হয়। কেন বা কি processএ (উপায়ে) হয়, তার নির্ণয় করা যায় না। তবে হয়—হতে দেখেছি। শ্রীকৃষ্ণ আত্ম-সংস্থ হয়ে গীতা বলেছিলেন। গীতার যে যে স্থলে "অহং" শব্দের উল্লেখ রয়েছে, তা "আত্মপর" বলে জান্‌বি। "মামেকং শরণং ব্রজ" কিনা "আত্মসংস্থ হও।" এই আত্মজ্ঞানই গীতার চরম লক্ষ্য। যোগাদির উল্লেখ ঐ

আত্মতত্ত্বলাভের আনুষঙ্গিক অবতারণা। এই আত্মজ্ঞান যাদের হয় না, তারাই আত্মঘাতী। "বিনিহন্ত্যসদ্‌গ্রহাৎ" রূপরসাদির উদ্বন্ধনে তাদের প্রাণ যায়। তোরাও ত মানুষ—দুদিনের ছাই-ভস্ম ভোগকে উপেক্ষা কর্‌তে পার্‌বিনি? 'জায়স্ব—ম্রিয়স্বে'র দলে যাবি? 'শ্রেয়ঃ'কে গ্রহণ কর্—'প্রেয়ঃ'কে পরিত্যাগ কর্। এই আত্মতত্ত্ব আচণ্ডাল সব্বাইকে বল্‌বি। বল্‌তে বল্‌তে নিজের বুদ্ধিও পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর "তত্ত্বমসি" "সোঽহমস্মি" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" প্রভৃতি মহামন্ত্র সর্ব্বদা উচ্চারণ কর্‌বি ও হৃদয়ে সিংহের মত বল রাখ্‌বি। ভয় কি? ভয়ই মৃত্যু—ভয়ই মহাপাতক। নররূপী অর্জ্জুনের ভয় হয়েছিল—তাই আত্মসংস্থ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে গীতা উপদেশ দিলেন; তবু কি তাঁর ভয় যায়?—পরে, অর্জ্জুন যখন বিশ্বরূপ দর্শন করে আত্মসংস্থ হলেন, তখন জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ-কর্ম্মা হয়ে যুদ্ধ কর্‌লেন

শিষ্য। মহাশয়, আত্মজ্ঞান লাভ হইলেও কি কর্ম্ম থাকে?

স্বামিজী। জ্ঞানলাভের পর সাধারণে যাকে কর্ম্ম বলে, সেরূপ কর্ম্ম থাকে না। তখন কর্ম্ম "জগদ্ধিতায়" হয়ে দাঁড়ায়। আত্মজ্ঞানীর চলন্ বলন্ সবই জীবের কল্যাণ সাধন করে। ঠাকুরকে দেখেছি—"দেহস্থোঽপি ন দেহস্থঃ"—এই ভাব! ঐরূপ পুরুষদের কর্ম্মের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কেবল এই কথামাত্র বলা যায়—"লোকবত্তু লীলা-কৈবল্যম্।" *

* বেদান্ত সূত্র ২অ; ১পা, ৩৩সূ

একাদশ বল্লী

স্থান—বেলুড় মঠ

বর্ষ—১৯০১

বিষয়

স্বামিজীর কলিকাতা জুবিলি আর্ট একাডেমির অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রণদাপ্রসাদ দাস গুপ্তের সহিত শিল্প সম্বন্ধে কথোপকথন—কৃত্রিম পদার্থনিচয়ে মনোভাব প্রকাশ করাই শিল্পের লক্ষ্য হওয়া উচিত—ভারতের বৌদ্ধযুগের শিল্প ঐ বিষয়ে জগতে শীর্ষস্থানীয়—ফটোগ্রাফের সহায়তা লাভ করিয়া ইউরোপীশিল্পের ভাব-প্রকাশ সম্বন্ধে অবনতি—ভিন্ন ভিন্ন জাতির শিল্পে বিশেষত্ব আছে—জড়বাদী ইউরোপ ও অধ্যাত্মবাদী ভারতের শিল্পে কি বিশেষত্ব আছে—বর্ত্তমান ভারতে শিল্পাবনতি—দেশের সকল বিদ্যা ও ভাবের ভিতরে প্রাণসঞ্চার করিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আগমন।

কলিকাতা জুবিলি আর্ট একাডেমির অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাতা বাবু রণদাপ্রসাদ দাস গুপ্ত মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া শিষ্য আজ বেলুড় মঠে আসিয়াছে। রণদাবাবু শিল্পকলানিপুণ সুপণ্ডিত ও স্বামিজীর গুণগ্রাহী। আলাপ পরিচয়ের পর স্বামিজী রণদাবাবুর সঙ্গে শিল্প-বিজ্ঞান সম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। রণদা-বাবুকে উৎসাহিত করিবার জন্য জুবিলি আর্ট একাডেমিতে একদিন যাইতেও ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু নানা অসুবিধায় স্বামিজীর তথায় যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই।

স্বামিজী রণদাবাবুকে বলিতে লাগিলেন, "পৃথিবীর প্রায়

সকল সভ্য দেশের শিল্প-সৌন্দর্য্য দেখে এলুম, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকালে এদেশে শিল্পকলার যেমন বিকাশ দেখা যায়, তেমনটি আর কোথাও দেখলুম না। মোগল বাদ্‌সাদের সময়েও ঐ বিদ্যার বিশেষ বিকাশ হয়েছিল; সেই বিদ্যার কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে আজও তাজমহল, জুম্মা মসজিদ প্রভৃতি ভারতবর্ষের বুকে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

"মানুষ যে জিনিষটি তৈরী করে, তাতে কোন একটা idea express (মনোভাব প্রকাশ) করার নামই art (শিল্প)। যাতে ideaর (ঐরূপ ভাবের) expression (প্রকাশ) নেই, তাতে রং বেরঙ্গের চাক্‌চিক্য পরিপাটি থাক্‌লেও তাকে প্রকৃত art (শিল্প) বলা যায় না। ঘটি, বাটি, পেয়ালা প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষ-পত্রগুলিও ঐরূপে বিশেষ কোন ভাবপ্রকাশ করে তৈরী হওয়া উচিত। প্যারিস্ প্রদর্শনীতে পাথরের খোদাই এক অদ্ভুত মূর্ত্তি দেখেছিলাম। মূর্ত্তিটির পরিচায়ক এই কয়টি কথা নীচে লেখা— Art unveiling nature—অর্থাৎ শিল্প কেমন করে প্রকৃতির নিবিড়াবগুণ্ঠন স্বহস্তে মোচন করে ভেতরের রূপসৌন্দর্য্য দেখে। মূর্ত্তিটি এমন ভাবে তৈরী করেছে যেন প্রকৃতিদেবীর রূপচ্ছবি এখনও স্পষ্ট বেরোয়নি; যতটুকু বেরিয়েছে, ততটুকু সৌন্দর্য্য দেখেই শিল্পী যেন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে। যে ভাস্কর এই ভাবটি প্রকাশ কর্‌তে চেষ্টা করেছেন, তাঁর প্রশংসা না করে থাকা যায় না। ঐ রকমের original (মৌলিক) কিছু কর্‌তে চেষ্টা করবেন।"

রণদাবাবু। আমারও ইচ্ছা আছে সময় মত original modelling (নূতন ভাবের মূর্ত্তি) সব গড়্‌তে; কিন্তু এদেশে উৎসাহ

পাই না। অর্থাভাব, তার উপর আমাদের দেশে গুণগ্রাহী লোকের অভাব।

স্বামিজী। আপনি যদি প্রাণ দিয়ে যথার্থ একটি খাঁটি জিনিষ করতে পারেন, যদি artএ (শিল্পে) একটি ভাবও যথাযথ express (প্রকাশ) করতে পারেন, কালে নিশ্চয় তার appreciation (আদর) হবে। খাঁটি জিনিষের কখনও জগতে অনাদর হয় নি। এরূপও শোনা যায়, এক এক জন artist (শিল্পী) মরবার হাজার বছর পর, হয়ত তার appreciation (কার্য্যের আদর) হল!

রণদাবাবু। তা ঠিক। কিন্তু আমরা যেরূপ অপদার্থ হয়ে পড়েছি, তাতে 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে' সাহসে কুলোয় না। এই পাঁচ বৎসরের চেষ্টায় আমি যা হ'ক্ কিছু কৃতকার্য্য হয়েছি। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন উদ্যম বিফল না হয়।

স্বামিজী। যদি ঠিক্ ঠিক্ কাজে লেগে যান, তবে নিশ্চয় successful (সফলকাম) হবেন। যে, যে বিষয়ে মন প্রাণ ঢেলে খাটে, তাতে তার success (সফলতা) ত হয়ই—তার পর, চাই কি ঐ কাজের তন্ময়তা থেকে ব্রহ্মবিদ্যা পর্য্যন্ত লাভ হয়। যে কোন বিষয়ে প্রাণ দিয়ে খাটলে, ভগবান তার সহায় হন।

রণদাবাবু। ওদেশ এবং এদেশের শিল্পের ভেতর তফাৎ কি দেখ্‌লেন?

স্বামিজী। প্রায় সবই সমান, originality (নূতনত্ব) প্রায়ই দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। ঐ সব দেশে ফটো যন্ত্রের সাহায্যে এখন নানা চিত্র তুলে ছবি আঁক্‌ছে। কিন্তু যন্ত্রের সাহায্য নিলেই originality (নূতন নূতন ভাব প্রকাশের ক্ষমতা) লোপ হয়ে যায়; নিজের ideaর expression দিতে (মনোগত ভাব প্রকাশ কর্‌তে) পারা যায় না। আগেকার ভাস্করগণ আপনাদের মাথা থেকে নূতন নূতন ভাব বের কর্‌তে বা সেইগুলি ছবিতে বিকাশ করতে চেষ্টা করতেন। এখন ফটোর অনুরূপ ছবি হওয়ায়, মাথা খেলাবার শক্তি ও চেষ্টার লোপ হয়ে যাচ্ছে। তবে এক একটা জাতের এক একটা characteristic (বিশেষত্ব) আছে। আচারে ব্যবহারে, আহারে বিহারে, চিত্রে ভাস্কর্য্যে সেই বিশেষ ভাবের বিকাশ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এই ধরুন— ওদেশের গান বাজনা নাচের expression (বাহ্ বিকাশ) গুলি সবই pointed (সূচ্যগ্রের ন্যায় তীব্র); নাচছে যেন হাত পা ছুড়ছে; বাজনাগুলির আওয়াজে কানে যেন সঙ্গীনের খোঁচা দিচ্ছে; গানেরও ঐরূপ। এদেশের নাচ আবার যেন হেলে দুলে তরঙ্গের ন্যায় গড়িয়ে পড়্‌ছে, গানের গমক মূর্চ্ছনাতেও ঐরূপ rounded movement (চক্রাকারের অনুবর্ত্তন) দেখা যায়। বাজ্‌নাতেও তাই। অতএব art (শিল্প) সম্বন্ধে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্নরূপ বিকাশ হয়।

যে জাত্‌টা বড় materialistic (জড়বাদী ও ইহকাল-সর্ব্বস্ব) তারা nature (প্রকৃতিগত নামরূপ) টাকেই ideal (চরমোদ্দেশ্য) বলে ধরে ও তদনুরূপ ভাবের expressionই (বিকাশই) শিল্পে দিতে চেষ্টা করে। যে জাত্‌টা আবার প্রকৃতির অতীত একটা ভাব-প্রাপ্তিকেই ideal (জীবনের চরমোদ্দেশ্য) বলে ধরে, সেটা ঐ ভাবই natureএর (প্রকৃতিগত) শক্তিসহায়ে শিল্পে express (প্রকাশ) করতে চেষ্টা করে। প্রথম শ্রেণীর জাতদের natureই (প্রকৃতিগত সাংসারিক ভাব ও পদার্থনিচয় চিত্রণই) হচ্ছে primary basis of art (শিল্পের মূল ভিত্তি); আর দ্বিতীয় শ্রেণীর জাত্‌গুলোর ideality (প্রকৃতির অতীত কোনও একটা ভাব প্রকাশই) হচ্ছে শিল্পবিকাশের মূল কারণ। ঐরূপে দুই বিভিন্ন উদ্দেশ্য ধরে শিল্পচর্চ্চায় অগ্রসর হলেও, ফল উভয় শ্রেণীর প্রায় একই দাঁড়িয়েছে, উভয়েই আপন আপন ভাবে শিল্পোন্নতি করছে। ওসব দেশের এক একটা ছবি দেখে আপনার সত্যকার প্রাকৃতিক দৃশ্য বলে ভ্রম হবে। এদেশের সম্বন্ধেও তেমনি—পুরাকালে স্থাপত্য-বিদ্যার যখন খুব বিকাশ হয়েছিল, তখনকার এক একটি মূর্ত্তি দেখ্‌লে আপনাকে এই জড়প্রাকৃতিক রাজ্য ভুলিয়ে একটা নূতন ভাবরাজ্যে নিয়ে ফেল্‌বে। ওদেশে এখন যেমন আগেকার মত ছবি হয় না, এদেশেও তেমনি নূতন নূতন ভাববিকাশকল্পে ভাস্করগণের আর

চেষ্টা দেখা যায় না। এই দেখুন না, আপনাদের 'আর্ট-স্কুলের ছবিগুলিতে যেন কোন expression (ভাবের বিকাশ) নেই। আপনারা হিন্দুদের নিত্যধ্যেয় মূর্ত্তি-গুলিতে প্রাচীন ভাবের উদ্দীপক expression (বহিঃ-প্রকাশ) দিয়ে আঁক্‌বার চেষ্টা কর্‌লে ভাল হয়।

রণদাবাবু। আপনার কথায় হৃদয়ে মহা উৎসাহ হয়। চেষ্টা করে দেখ্‌ব—আপনার কথামত কার্য্য কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ব।

স্বামিজী আবার বলিতে লাগিলেন, "এই মনে করুন, মা কালীর ছবি। এতে যুগপৎ ক্ষেমঙ্করী ও ভয়ঙ্করী মূর্ত্তির সমাবেশ। ঐ ছবির কোনখানিতে কিন্তু ঐ উভয় ভাবের ঠিক্ ঠিক্ expression (প্রকাশ) দেখা যায় না। তা দূরে যাক্—ঐ উভয় ভাবের একটাও চিত্রে ঠিক্ ঠিক্ বিকাশ করতে কারুর চেষ্টা নেই! আমি মা কালীর ভীমামূর্ত্তির কিছু idea (ভাব) 'Kali the Mother' (জগন্মাতা কালী) নামক আমার ইংরাজী কবিতাটায় লিপিবদ্ধ কর্‌তে চেষ্টা করেছি। আপনি ঐ ভাবটা একখানা ছবিতে express (প্রকাশ) করতে পারেন কি?

রণদাবাবু। কি ভাব?

স্বামিজী শিষ্যের পানে তাকাইয়া, তাঁহার ঐ কবিতাটি উপর হইতে আনিতে বলিলেন। শিষ্য লইয়া আসিলে স্বামিজী উহা ("The stars are blotted out" &c.) রণদাবাবুকে পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন। স্বামিজীর ঐ কবিতাটি পাঠের সময় শিষ্যের মনে হইতে লাগিল, যেন মহাপ্রলয়ের সংহারমূর্ত্তি তাহার কল্পনা-সমক্ষে নৃত্য করিতেছে। রণদাবাবুও কবিতাটি শুনিয়া কিছুক্ষণ

স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ বাদে রণদাবাবু যেন কল্পনানয়নে ঐ চিত্রটি দেখিতে পাইয়া "বাপ্" বলিয়া ভীত-চকিত নয়নে স্বামিজীর মুখপানে তাকাইলেন।

স্বামিজী। কেমন, এই idea (ভাবটা) চিত্রে বিকাশ করতে পারবেন ত ?

রণদাবাবু। আজ্ঞে, চেষ্টা করব।* কিন্তু ঐ ভাবের কল্পনা কর্‌তেই যেন মাথা ঘুরে যাচ্ছে।

স্বামিজী। ছবিখানি এঁকে আমাকে দেখাবেন। তার পর আমি উহা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন কর্‌তে বা যা যা দরকার, তা আপনাকে বলে দেব।

অতঃপর স্বামিজী রামকৃষ্ণমিশনের শিলমোহরের জন্য কমলদল-বিকশিত হ্রদমধ্যে হংসরাজিত সর্প-পরিবেষ্টিত যে ক্ষুদ্র ছবিটি করিয়াছিলেন, তাহা আনাইয়া রণদাবাবুকে দেখাইয়া, তৎসম্বন্ধে নিজ মতামত প্রকাশ করিতে বলিলেন। রণদাবাবু প্রথমে উহার মর্ম্মপরিগ্রহণে অসমর্থ হইয়া, স্বামিজীকেই উহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামিজী বুঝাইয়া দিলেন, চিত্রস্থ তরঙ্গায়িত সলিলরাশি—কর্ম্মের, কমলগুলি—ভক্তির এবং উদীয়মান সূর্য্যটি জ্ঞানের প্রকাশক। চিত্রগত সর্পপরিবেষ্টনটি—যোগ এবং জাগ্রত কুণ্ডলিনীশক্তির পরিচায়ক। আর চিত্র মধ্যস্থ হংসপ্রতিকৃতিটির অর্থ পরমাত্মা। অতএব, কর্ম্ম, ভক্তি

* শিষ্য তখন রণদাবাবুর সঙ্গে একত্র থাকিত। তাহার জানা আছে, রণদাবাবু বাড়ী ফিরিয়া পরদিন হইতেই ঐ প্রলয়তাণ্ডবোন্মত্ত চণ্ডীমূর্ত্তি আঁকিতে আরম্ভ করেন। আজিও সেই অর্দ্ধ অঙ্কিত মূর্ত্তিখানি রণদাবাবুর আর্ট স্কুলে রহিয়াছে। কিন্তু স্বামিজীকে তাহা আর দেখান হয় নাই।

ও জ্ঞান, যোগের সহিত সম্মিলিত হইলেই, পরমাত্মার সন্দর্শন লাভ হয়—চিত্রের ইহাই অর্থ।

রণদাবাবু চিত্রটির ঐরূপ অর্থ শুনিয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "আপনার নিকটে কিছুকাল শিল্পকলা-বিদ্যা শিখিতে পারিলে আমার বাস্তবিক উন্নতি হইতে পারিত।"

অতঃপর স্বামিজী, ভবিষ্যতে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির যে ভাবে নির্ম্মাণ করিতে তাঁহার ইচ্ছা, তাহারই একখানি চিত্র (drawing) আনাইলেন। চিত্রখানি স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, স্বামিজীর পরামর্শমত অঙ্কিত করিয়াছিলেন। চিত্রখানি রণদা-বাবুকে দেখাইতে দেখাইতে বলিতে লাগিলেন—'এই ভাবী মঠমন্দিরটির নির্ম্মাণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় শিল্পকলার একত্র সমাবেশ করবার আমার ইচ্ছা আছে। আমি পৃথিবী ঘুরে গৃহশিল্পসম্বন্ধে যত সব idea (ভাব) নিয়ে এসেছি, তার সবগুলিই এই মন্দির নির্ম্মাণে বিকাশ করবার চেষ্টা করব। বহু-সংখ্যক জড়িত স্তম্ভের উপর একটি প্রকাণ্ড নাটমন্দির তৈরী হবে। উহার দেওয়ালে শত সহস্র প্রফুল্ল কমল ফুটে থাকবে। হাজার লোক যাতে একত্র বসে ধ্যান জপ করতে পারে, নাট-মন্দিরটি এমন বড় করে নির্ম্মাণ করতে হবে। আর শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির ও নাটমন্দিরটি এমন ভাবে একত্র গড়ে তুলতে হবে যে, দূর থেকে দেখ্‌লে ঠিক ওঁকার বলে ধারণা হবে। মন্দির মধ্যে একটি রাজহংসের উপর ঠাকুরের মূর্ত্তি থাকবে। দোরে দুদিকে দুটি ছবি এই ভাবে থাকবে—একটি সিংহ ও একটি মেষ বন্ধুভাবে উভয়ে উভয়ের গা চাটছে—অর্থাৎ মহাশক্তি ও

মহানম্রতা যেন প্রেমে একত্র সম্মিলিত হয়েছে। মনে এই সব idea (ভাব) রয়েছে ; এখন জীবনে কুলোয় ত কার্য্যে পরিণত করে যাব। নতুবা ভাবী generation (বংশীয়েরা) ঐগুলি ক্রমে কার্য্যে পরিণত করতে পারে ত করবে। আমার মনে হয়, ঠাকুর এসেছিলেন, দেশের সকল প্রকার বিদ্যা ও ভাবের ভেতরেই প্রাণসঞ্চার করতে। সেজন্য ধর্ম্ম, কর্ম্ম, বিদ্যা, জ্ঞান, ভক্তি সমস্তই যাতে এই মঠ-কেন্দ্র থেকে জগতে ছড়িয়ে পড়ে, এমন ভাবে ঠাকুরের এই মঠটি গড়ে তুলতে হবে। এ বিষয়ে আপনারা আমার সহায় হন।

রণদাবাবু ও উপস্থিত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ স্বামিজীর কথাগুলি শুনিয়া অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিলেন। যাঁহার মহৎ উদার মন, সকল বিষয়ের সকল প্রকার মহান্ ভাবরাশির অদৃষ্টপূর্ব্ব ক্রীড়াভূমি ছিল, সেই স্বামিজীর মহত্ত্বের কথা ভাবিয়া, সকলে একটা অব্যক্তভাবে পূর্ণ হইয়া স্তব্ধীভূত হইয়া রহিলেন।

অল্পক্ষণ পরে স্বামিজী আবার বলিলেন, "আপনি শিল্পবিদ্যার যথার্থ আলোচনা করেন বলেই, আজ ঐ সম্বন্ধে এত চর্চ্চা হচ্ছে। শিল্পসম্বন্ধে এতকাল আলোচনা করে আপনি ঐ বিষয়ের যা কিছু সার ও সর্ব্বোচ্চ ভাব পেয়েছেন, তাই এখন আমাকে বলুন।

রণদাবাবু। মহাশয়, আমি আপনাকে নূতন কথা কি শোনাব, আপনিই ঐ বিষয়ে আজ আমার চোক ফুটিয়ে দিলেন। শিল্পসম্বন্ধে এমন জ্ঞানগর্ভ কথা এ জীবনে আর কখনও শুনি নি। আশীর্ব্বাদ করুন, আপনার নিকট যে সকল ভাব পেলাম, তা যেন কার্য্যে পরিণত করতে পারি।

অতঃপর স্বামিজী আসন হইতে উঠিয়া ময়দানে ইতস্ততঃ বেড়াইতে বেড়াইতে শিষ্যকে বলিলেন, "ছেলেটি খুব তেজস্বী।"

শিষ্য। মহাশয়, আপনার কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছে।

স্বামিজী শিষ্যের ঐ কথার কোনও উত্তর না করিয়া, আপন মনে গুন গুন করিয়া ঠাকুরের একটি গান গাহিতে লাগিলেন—"পরম ধন সে পরশমণি" ইত্যাদি।

এইরূপে কিছুক্ষণ বেড়াইবার পর স্বামিজী মুখ ধুইয়া শিষ্য-সমভিব্যাহারে উপরে নিজের ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং Encyclopædia Britannica পুস্তকের শিল্পসম্বন্ধীয় অধ্যায়টি কিছুক্ষণ পাঠ করিলেন। পাঠ সাঙ্গ হইলে, পূর্ব্ববঙ্গের কথা এবং উচ্চারণের ঢং লইয়া শিষ্যের সঙ্গে সাধারণভাবে ঠাট্টা তামাসা করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ বল্লী

স্থান—বেলুড় মঠ

বর্ষ—১৯০১

বিষয়

স্বামিজীর শরীরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শক্তিসঞ্চার—পূর্ব্ববঙ্গের কথা—নাগ মহাশয়ের বাটীতে আতিথ্যস্বীকার—আচার ও নিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা—কামকাঞ্চনাসক্তি ত্যাগে আত্মদর্শন।

স্বামিজী কয়েকদিন হইল, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। শরীর অসুস্থ, পা ফুলিয়াছে। শিষ্য আসিয়া মঠের উপর তলায় স্বামিজীর কাছে গিয়া প্রণাম করিল। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও স্বামিজীর হাস্যবদন ও স্নেহমাখা দৃষ্টি, যাহাতে সকলকে সকল দুঃখ ভুলাইয়া আত্মহারা করিয়া দিত!

শিষ্য। স্বামিজী, কেমন আছেন?

স্বামিজী। আর বাবা, থাকাথাকি কি? দেহ ত দিন দিন অচল হচ্ছে। বাঙ্গালাদেশে এসে শরীর ধারণ করতে হয়েছে, শরীরে রোগ লেগেই আছে। এদেশের physique (শারীরিক গঠন) একেবারে ভাল নয়। বেশী কাজ করতে গেলেই শরীর বয় না। তবে যে কটা দিন দেহ আছে, তোদের জন্য খাট্‌ব। খাট্‌তে খাট্‌তে মর্‌ব।

শিষ্য। আপনি এখন কিছুদিন কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া স্থির হইয়া

থাকুন, তাহা হইলেই শরীর সারিবে। এ দেহের রক্ষায় জগতের মঙ্গল।

স্বামিজী। বসে থাক্‌বার যো আছে কি বাবা! ঐ যে ঠাকুর যাকে 'কালী' 'কালী' বলে ডাকতেন, ঠাকুরের দেহ রাখ্‌বার দু তিন দিন আগে সেইটে, এই শরীরে ঢুকে গেছে; সেইটেই আমাকে এদিক্ ওদিক্ কাজ করিয়ে নিয়ে বেড়ায়—স্থির হয়ে থাক্‌তে দেয় না! আপনার সুখের দিক দেখতে দেয় না।

শিষ্য। শক্তি প্রবেশের কথাটা কি রূপকচ্ছলে বলিতেছেন?

স্বামিজী। না রে; ঠাকুরের দেহ যাবার তিন চার দিন আগে, তিনি আমাকে একাকী একদিন কাছে ডাক্‌লেন। আর সাম্‌নে বসিয়ে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়্‌লেন। আমি তখন ঠিক অনুভব কর্‌তে লাগ্‌লুম, তাঁর শরীর থেকে একটা সূক্ষ্ম তেজ electric shockএর মত (তড়িৎ-কম্পনের মত) এসে আমার শরীরে ঢুক্‌ছে! ক্রমে আমিও বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলুম! কতক্ষণ এরূপ ভাবে ছিলুম, আমার কিছু মনে পড়ে না; যখন বাহ্য চেতনা হল, দেখি—ঠাকুর কাঁদ্‌ছেন। জিজ্ঞাসা করায়, ঠাকুর সস্নেহে বল্‌লেন,—"আজ যথাসর্ব্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির হলুম! তুই এই শক্তিতে জগতের অনেক কাজ করে তবে ফিরে যাবি।" আমার বোধ হয়, ঐ শক্তিই আমাকে এ কাজে সে কাজে কেবল ঘুরোয়। বসে থাক্‌বার জন্য আমার এদেহ হয় নি।

শিষ্য অবাক হইয়া শুনিতে শুনিতে ভাবিতে লাগিল,—এ সকল কথা সাধারণ লোকে কি ভাবে বুঝিবে, কে জানে! অনন্তর ভিন্ন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিল,—"মহাশয়, আমাদের বাঙাল দেশ (পূর্ব্ববঙ্গ) আপনার কেমন লাগিল?"

স্বামিজী। দেশ কিছু মন্দ নয়, মাঠে দেখ্‌লুম খুব শস্য ফলেছে। আবহাওয়াও মন্দ নয়; পাহাড়ের দিকের দৃশ্য অতি মনোরম। ব্রহ্মপুত্র valleyর (উপত্যকার) শোভা অতুলনীয়। আমাদের এদিকের চেয়ে লোকগুলো কিছু মজবুত ও কর্ম্মঠ। তার কারণ বোধ হয়, মাছ মাংসটা খুব খায়। যা করে, খুব গোঁয়ে করে। খাওয়া দাওয়াতে খুব তেল চর্ব্বি দেয়; ওটা ভাল নয়। তেল চর্ব্বি বেশী খেলে শরীরে মেদ জন্মে।

শিষ্য। ধর্ম্মভাব কেমন দেখিলেন?

স্বামিজী। ধর্ম্মভাব সম্বন্ধে দেখ্‌লুম—দেশের লোকগুলো বড় conservative (প্রাচীন প্রথার অনুগামী, অনুদার), উদারভাবে ধর্ম্ম করতে গিয়ে আবার অনেকে fanatic (কাণ্ডজ্ঞানরহিত আত্মমত-পোষণকারী) হয়ে পড়েছে। ঢাকার মোহিনীবাবুর বাড়ীতে একদিন একটি ছেলে, একখানা কার photo এনে আমায় দেখালে ও বল্লে, "মহাশয়, বলুন ইনি কে? অবতার কি না?" আমি তাকে অনেক বুঝিয়ে বল্‌লুম, "তা বাবা, আমি কি জানি।" তিন চার বার বল্লেও, সে ছেলেটি দেখ্‌লুম, কিছুতেই তার জেদ ছাড়ে না। অবশেষে আমাকে বাধ্য

হয়ে বল্‌তে হল,—"বাবা, এখন থেকে ভাল করে খেয়ো দেয়ো; তা হলে মস্তিষ্কের বিকাশ হবে—পুষ্টিকর খাদ্যাভাবে তোমার মাথা যে শুকিয়ে গেছে।" একথা শুনে বোধ হয় ছেলেটির অসন্তোষ হয়ে থাকবে। তা কি করব বাবা, ছেলেদের এরূপ না বল্‌লে তারা যে ক্রমে পাগল হয়ে দাঁড়াবে।

শিষ্য। আমাদের পূর্ব্ব বাঙ্গালায় আজকাল অনেক অবতারের অভ্যুদয় হইতেছে।

স্বামিজী। গুরুকে লোকে অবতার বল্‌তে পারে; যা ইচ্ছা, তাই বলে ধারণা করবার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু ভগবানের অবতার যখন তখন—যেখানে সেখানে হয় না। এক ঢাকাতেই শুন্‌লাম, তিন চারটি অবতার দাঁড়িয়েছে।

শিষ্য। ওদেশের মেয়েদের কেমন দেখিলেন?

স্বামিজী। মেয়েরা সর্ব্বত্রই প্রায় একরূপ। বৈষ্ণব-ভাবটা ঢাকায় বেশী দেখ্‌লুম। হ—র স্ত্রীকে খুব intelligent (বুদ্ধিমতী) বলে বোধ হল। সে খুব যত্ন করে আমায় রেঁধে খাবার পাঠিয়ে দিত।

শিষ্য। শুনিলাম, নাগ মহাশয়ের বাড়ী নাকি গিয়াছিলেন?

স্বামিজী। হাঁ, অমন মহাপুরুষ—এতদূর গিয়ে তাঁর জন্মস্থান দেখ্‌ব না? নাগ মহাশয়ের স্ত্রী আমায় কত রেঁধে খাওয়ালেন। বাড়ীখানি কি মনোরম! যেন শান্তি-আশ্রম। ওখানে গিয়ে এক পুকুরে সাঁতার কেটে নেয়েছিলুম। তারপর,

এসে এমন নিদ্রা দিলুম যে বেলা ২॥০টা। আমার জীবনে যে কয় দিন সুনিদ্রা হয়েছে, নাগ মহাশয়ের বাড়ীর নিদ্রা তার মধ্যে এক দিন। তারপর উঠে প্রচুর আহার। নাগ মহাশয়ের স্ত্রী একখানা কাপড় দিয়েছিলেন। সেইখানি মাথায় বেঁধে ঢাকায় রওনা হলুম। নাগ মহাশয়ের ফটো পূজা হয় দেখ্‌লুম। তাঁর সমাধি স্থানটি বেশ ভাল করে রাখা উচিত। এখনও, যেমন হওয়া উচিত, তেমন হয় নি।

শিষ্য। মহাশয়, নাগ মহাশয়কে ওদেশের লোকে তেমন চিনিতে পারে নাই।

স্বামিজী। ওসব মহাপুরুষকে সাধারণে কি বুঝ্‌বে? যারা তাঁর সঙ্গ পেয়েছে তারাই ধন্য।

শিষ্য। কামাখ্যা গিয়া কি দেখিলেন?

স্বামিজী। শিলং পাহাড়টি অতি সুন্দর। সেখানে Chief Commissioner, Cotton সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"স্বামিজী! ইউরোপ ও আমেরিকা বেড়িয়ে এই দূর পর্ব্বতপ্রান্তে আপনি কি দেখ্‌তে এসেছেন?" Cotton সাহেবের মত অমন সদাশয় লোক প্রায় দেখা যায় না। আমার অসুখ শুনে সরকারী ডাক্তার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দুবেলা আমার খবর নিতেন। সেখানে বেশী লেকচার ফেকচার করতে পারি নি; শরীর বড় অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। রাস্তায় নিতাই খুব সেবা করেছিল।

শিষ্য। সেখানকার ধর্ম্মভাব কেমন দেখিলেন ?

স্বামিজী। তন্ত্রপ্রধান দেশ; এক 'হঙ্কর' দেবের নাম শুন্‌লুম, যিনি ও অঞ্চলে অবতার বলে পূজিত হন। শুন্‌লুম, তাঁর সম্প্রদায় খুব বিস্তৃত; ঐ 'হঙ্কর' দেব শঙ্করাচার্য্যেরই নামান্তর কি না বুঝ্‌তে পারলাম না। ওরা ত্যাগী—বোধ হয়, তান্ত্রিক সন্ন্যাসী। কিংবা শঙ্করাচার্য্যেরই সম্প্রদায়-বিশেষ।

অতঃপর শিষ্য বলিল, "মহাশয়, ওদেশের লোকেরা বোধ হয় নাগ মহাশয়ের মত, আপনাকেও ঠিক্ বুঝিতে পারে নাই।"

স্বামিজী। আমায় বুঝুক্ আর নাই বুঝুক্—এ অঞ্চলের লোকের চেয়ে কিন্তু তাদের রজোগুণ প্রবল; কালে সেটা আরও বিকাশ হবে। যেরূপ চাল্ চলনকে ইদানীং সভ্যতা বা শিষ্টাচার বলা হয়, সেটা এখনও ও অঞ্চলে ভালরূপে প্রবেশ করেনি। সেটা ক্রমে হবে। সকল সময়ে Capital (রাজধানী) থেকে ক্রমে প্রদেশ সকলে চাল্ চলন আদব কায়দার বিস্তার হয়। ও দেশেও তাই হচ্ছে। যে দেশে নাগ মহাশয়ের মত মহাপুরুষ জন্মায়, সে দেশের আবার ভাবনা ? তাঁর আলোতেই পূর্ব্ব বঙ্গ উজ্জ্বল হয়ে আছে।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, সাধারণ লোক তাঁহাকে তত জানিত না; তিনি বড় গুপ্তভাবে ছিলেন।

স্বামিজী। ওদেশে আমার খাওয়া দাওয়া নিয়ে বড় গোল করত। বল্‌ত—ওটা কেন খাবেন; ওর হাতে কেন খাবেন,

ইত্যাদি। তাই বল্‌তে হত—আমি ত সন্ন্যাসী ফকির লোক—আমার আবার আচার কি? তোদের শাস্ত্রেই না বল্‌ছে,—“চরেন্মাধুকরীং বৃত্তিমপি ম্লেচ্ছকুলাদপি”—তবে অবশ্য বাইরের আচার ভেতরে ধর্ম্মের অনুভূতির জন্য প্রথম প্রথম চাই; শাস্ত্রজ্ঞানটা নিজের জীবনে practical (কার্য্যকরী) করে নেবার জন্য চাই। ঠাকুরের সেই পাঁজি নেঙ্‌ড়ান জলের কথা* শুনেছিস ত? আচার বিচার কেবল মানুষের ভেতরের মহাশক্তি স্ফুরণের উপায় মাত্র। যাতে ভেতরের সেই শক্তি জাগে, যাতে মানুষ তার স্বরূপ ঠিক্ ঠিক্ বুঝতে পারে, তাই হচ্ছে সর্ব্বশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। উপায়গুলি বিধি-নিষেধাত্মক। উদ্দেশ্য হারিয়ে, খালি উপায় নিয়ে ঝগড়া কর্‌লে কি হবে? যে দেশেই যাই, দেখি, উপায় নিয়েই লাঠালাঠি চলেছে। উদ্দেশ্যের দিকে লোকের নজর নেই, ঠাকুর ঐটি দেখাতেই এসেছিলেন। ‘অনুভূতি’ই হচ্ছে সার কথা। হাজার বৎসর গঙ্গাস্নান কর্, আর হাজার বৎসর নিরামিষ খা—ওতে যদি আত্মবিকাশের সহায়তা না হয়, তবে জান্‌বি সর্ব্বৈব বৃথা হল। আর, আচারবর্জ্জিত হয়ে যদি কেউ আত্মদর্শন করতে

* পাঁজিতে লেখা থাকে—‘এ বৎসর বিশ আড়া জল হবে’, কিন্তু পাঁজিখানা নেঙড়ালে, এক ফোঁটা জলও পড়ে না। সেইরূপ, শাস্ত্রে লেখা আছে, ‘এইরূপ এইরূপ কর্‌লে ঈশ্বর দর্শন হয়’; তা না করে কেবল শাস্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া কর্‌লে কিছুই ফল পাওয়া যায় না।

—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তি

পারে, তবে সেই অনাচারই শ্রেষ্ঠ আচার। তবে আত্মদর্শন হলেও, লোকসংস্থিতির জন্য আচার কিছু কিছু মানা ভাল। মোট কথা মনকে একনিষ্ঠ করা চাই। এক বিষয়ে নিষ্ঠা হলে—মনের একাগ্রতা হয় অর্থাৎ মনের অন্য বৃত্তিগুলি নিবে গিয়ে এক বিষয়ে একতানতা হয়। অনেকের বাহ্য আচার বা বিধিনিষেধের জালেই সব সময়টা কেটে যায়, আত্মচিন্তা আর করা হয় না। দিনরাত বিধিনিষেধের গণ্ডির মধ্যে থাক্‌লে, আত্মার প্রসার হবে কি করে? যে যতটা আত্মানুভূতি করতে পেরেছে, তার বিধিনিষেধ ততই কমে যায়। আচার্য্য শঙ্করও বলেছেন, "নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ, কো নিষেধঃ?" অতএব, মূলকথা হচ্ছে—অনুভূতি। উহাই জান্‌বি, goal (উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য); মত—পথ, রাস্তা মাত্র। কার কতটা ত্যাগ হয়েছে, এইটি জান্‌বি—উন্নতির test (পরীক্ষক কষ্টিপাথর)। কাম-কাঞ্চনের আসক্তি যেখানে দেখ্‌বি কম্‌তি—সে যে মতের, যে পথের লোক হোক্‌না কেন—তার জান্‌বি শক্তি জাগ্রত হচ্ছে। তার জান্‌বি, আত্মানুভূতির দোর খুলে গেছে। আর হাজার আচার মেনে চল্, হাজার শ্লোক আওড়া, তবু যদি ত্যাগের ভাব না এসে থাকে ত জান্‌বি, জীবন বৃথা। এই অনুভূতি লাভে তৎপর হ, লেগে যা। শাস্ত্র টাস্ত্র ত ঢের পড়্‌লি। বল্ দিকি, তাতে হল কি? কেউ টাকার চিন্তা করে

ধনকুবের হয়েছে, তুই না হয় শাস্ত্রচিন্তা করে পণ্ডিত হয়েছিস্। উভয়ই বন্ধন! পরাবিদ্যালাভে বিদ্যা অবিদ্যার পারে চলে যা।

শিষ্য। মহাশয়, আপনার কৃপায় সব বুঝি ; কিন্তু কর্ম্মের ফেরে ধারণা করিতে পারি না।

স্বামিজী। কর্ম্ম ফর্ম্ম ফেলে দে। তুই-ই পূর্ব্বজন্মে কর্ম্ম করে এই দেহ পেয়েছিস্, একথা যদি সত্য হয়—তবে কর্ম্ম-দ্বারা কর্ম্ম কেটে, তুই আবার কেন না এ দেহেই জীবন্মুক্ত হবি? জান্‌বি, মুক্তি বা আত্মজ্ঞান তোর নিজের হাতে রয়েছে। জ্ঞানে কর্ম্মের লেশ মাত্র নেই। তবে যারা জীবন্মুক্ত হয়েও কাজ করে, তারা জান্‌বি, "পরহিতায়" কর্ম্ম করে। তারা ভালমন্দ ফলের দিকে চায় না; কোন বাসনা-বীজ তাদের মনে স্থান পায় না। সংসারাশ্রমে থেকে ঐরূপ যথার্থ "পরহিতায়" কর্ম্ম করা একপ্রকার অসম্ভব জান্‌বি। সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রে ঐ বিষয়ে এক জনক রাজার নামই আছে। তোরা কিন্তু এখন বছর বছর ছেলে জন্ম দিয়ে ঘরে ঘরে বিদেহ "জনক" হতে চাস্।

শিষ্য। আপনি কৃপা করুন—যাহাতে আত্মানুভূতিলাভ এ শরীরেই হয়।

স্বামিজী। ভয় কি? মনের ঐকান্তিকতা থাক্‌লে, আমি নিশ্চয় বল্‌ছি, এ জন্মেই হবে। তবে পুরুষকার চাই। পুরুষকার কি জানিস্? আত্মজ্ঞান লাভ

পারে, তবে সেই অনাচারই শ্রেষ্ঠ আচার। তবে আত্মদর্শন হলেও, লোকসংস্থিতির জন্য আচার কিছু কিছু মানা ভাল। মোট কথা মনকে একনিষ্ঠ করা চাই। এক বিষয়ে নিষ্ঠা হলে—মনের একাগ্রতা হয় অর্থাৎ মনের অন্য বৃত্তিগুলি নিবে গিয়ে এক বিষয়ে একতানতা হয়। অনেকের বাহ্য আচার বা বিধিনিষেধের জালেই সব সময়টা কেটে যায়, আত্মচিন্তা আর করা হয় না। দিনরাত বিধিনিষেধের গণ্ডির মধ্যে থাক্‌লে, আত্মার প্রসার হবে কি করে? যে যতটা আত্মানুভূতি করতে পেরেছে, তার বিধিনিষেধ ততই কমে যায়। আচার্য্য শঙ্করও বলেছেন, "নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ, কো নিষেধঃ?" অতএব, মূলকথা হচ্ছে—অনুভূতি। উহাই জান্‌বি, goal (উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য); মত—পথ, রাস্তা মাত্র। কার কতটা ত্যাগ হয়েছে, এইটি জান্‌বি—উন্নতির test (পরীক্ষক কষ্টিপাথর)। কাম-কাঞ্চনের আসক্তি যেখানে দেখ্‌বি কম্‌তি—সে যে মতের, যে পথের লোক হোক্‌না কেন—তার জান্‌বি শক্তি জাগ্রত হচ্ছে। তার জান্‌বি, আত্মানুভূতির দোর খুলে গেছে। আর হাজার আচার মেনে চল্‌, হাজার শ্লোক আওড়া, তবু যদি ত্যাগের ভাব না এসে থাকে ত জান্‌বি, জীবন বৃথা। এই অনুভূতি লাভে তৎপর হ, লেগে যা। শাস্ত্র টাস্ত্র ত ঢের পড়্‌লি। বল্‌ দিকি, তাতে হল কি? কেউ টাকার চিন্তা করে

ধনকুবের হয়েছে, তুই না হয় শাস্ত্রচিন্তা করে পণ্ডিত হয়েছিস্। উভয়ই বন্ধন! পরাবিদ্যালাভে বিদ্যা অবিদ্যার পারে চলে যা।

শিষ্য। মহাশয়, আপনার কৃপায় সব বুঝি; কিন্তু কর্ম্মের ফেরে ধারণা করিতে পারি না।

স্বামিজী। কর্ম্ম ফর্ম্ম ফেলে দে। তুই-ই পূর্ব্বজন্মে কর্ম্ম করে এই দেহ পেয়েছিস্, একথা যদি সত্য হয়—তবে কর্ম্ম-দ্বারা কর্ম্ম কেটে, তুই আবার কেন না এ দেহেই জীবন্মুক্ত হবি? জান্‌বি, মুক্তি বা আত্মজ্ঞান তোর নিজের হাতে রয়েছে। জ্ঞানে কর্ম্মের লেশ মাত্র নেই। তবে যারা জীবন্মুক্ত হয়েও কাজ করে, তারা জান্‌বি, "পরহিতায়" কর্ম্ম করে। তারা ভালমন্দ ফলের দিকে চায় না; কোন বাসনা-বীজ তাদের মনে স্থান পায় না। সংসারাশ্রমে থেকে ঐরূপ যথার্থ "পরহিতায়" কর্ম্ম করা একপ্রকার অসম্ভব জান্‌বি। সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রে ঐ বিষয়ে এক জনক রাজার নামই আছে। তোরা কিন্তু এখন বছর বছর ছেলে জন্ম দিয়ে ঘরে ঘরে বিদেহ "জনক" হতে চাস্।

শিষ্য। আপনি কৃপা করুন—যাহাতে আত্মানুভূতিলাভ এ শরীরেই হয়।

স্বামিজী। ভয় কি? মনের ঐকান্তিকতা থাক্‌লে, আমি নিশ্চয় বল্‌ছি, এ জন্মেই হবে। তবে পুরুষকার চাই। পুরুষকার কি জানিস্? আত্মজ্ঞান লাভ

কর্‌বই কর্‌ব ; এতে যে বাধা বিপদ্ সাম্‌নে পড়ে, তা কাটাবই কাটাব—এইরূপ দৃঢ়সংকল্প। মা, বাপ, ভাই, বন্ধু, স্ত্রী, পুত্র মরে মরুক্, এ দেহ থাকে থাক্, যায় যাক্, আমি কিছুতেই ফিরে চাইব না, যতক্ষণ না আমার আত্মদর্শন ঘটে—এইরূপে সকল বিষয় উপেক্ষা করে এক মনে আপনার Goalএর (উদ্দেশ্যের) দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টার নামই পুরুষকার। নতুবা অন্য পুরুষকার ত পশু-পক্ষীরাও কর্‌ছে। মানুষ এ দেহ পেয়েছে—কেবল মাত্র সেই আত্মজ্ঞান লাভের জন্য। সংসারে সকলে যে পথে যাচ্ছে, তুইও কি সেই স্রোতে গা ঢেলে চলে যাবি ? তবে আর তোর পুরুষকার কি ? সকলে ত মর্‌তে বসেছে। তুই যে মৃত্যু জয় কর্‌তে এসেছিস্। মহাবীরের ন্যায় অগ্রসর হ। কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ কর্‌বিনি। কয়দিনের জন্যই বা শরীর ? কয়দিনের জন্যই বা সুখ-দুঃখ ? যদি মানবদেহই পেয়েছিস্, তবে ভিতরের আত্মাকে জাগা আর বল্—আমি অভয় পদ পেয়েছি। বল্—আমি সেই আত্মা, যাতে আমার কাঁচা আমিত্ব ডুবে গেছে। এই ভাবে সিদ্ধ হয়ে যা ; তার পর যতদিন দেহ থাকে, ততদিন অপরকে এই মহাবীর্য্যপ্রদ নির্ভয়বাণী শোনা—"তত্ত্বমসি," "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" এইটি হলে তবে জান্‌ব যে তুই যথার্থই একগুঁয়ে বাঙ্গাল।

ত্রয়োদশ বল্লী

স্থান—বেলুড় মঠ

বর্ষ—১৯০১

বিষয়

স্বামিজীর মনঃসংযম—তাঁহার স্ত্রী-মঠ স্থাপনের সংকল্প সম্বন্ধে শিষ্যকে বলা—এক চিৎসত্তা স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান—প্রাচীন যুগে স্ত্রীলোক-দিগের শাস্ত্রাধিকার কতদূর ছিল—স্ত্রীজাতির সম্মাননা ভিন্ন কোন দেশ বা জাতির উন্নতিলাভ অসম্ভব—তন্ত্রোক্ত বামাচারের দূষিত ভাবই বর্জ্জনীয়; নতুবা স্ত্রীজাতীর সম্মাননা ও পূজা প্রশস্ত ও অনুষ্ঠেয়—ভাবী স্ত্রীমঠের নিয়মাবলী—ঐ মঠে শিক্ষিতা ব্রহ্মচারিণীদিগের দ্বারা সমাজের কিরূপ প্রভূত কল্যাণ হইবে—পরব্রহ্মে লিঙ্গ-ভেদ নাই, কেবল 'আমি তুমি'র রাজ্যে বিদ্যমান—অতএব স্ত্রীজাতি ব্রহ্মজ্ঞা হওয়া অসম্ভব নহে—বর্তমান প্রচলিত স্ত্রীশিক্ষায় অনেক ত্রুটি থাকিলেও উহা নিন্দনীয় নহে—ধর্ম্মকে শিক্ষার ভিত্তি করিতে হইবে—মানবের ভিতর ব্রহ্ম-বিকাশের সহায়কারী কার্য্যই সৎকার্য্য—বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞানে কর্ম্মের অত্যন্ত অভাব থাকিলেও তল্লাভে কর্ম্ম গৌণভাবে সহায়ক হয়; কারণ, কর্ম্ম দ্বারাই মানবের চিত্তশুদ্ধি হয় এবং চিত্তশুদ্ধি না হইলে জ্ঞান হয় না।

শনিবার বৈকালে শিষ্য মঠে আসিয়াছে। স্বামিজীর শরীর তত সুস্থ নহে, শিলং পাহাড় হইতে অসুস্থ হইয়া অল্প দিন হইল প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার পা ফুলিয়াছে এবং সমস্ত শরীরেই যেন জলসঞ্চার হইয়াছে। স্বামিজীর গুরুভ্রাতৃগণ সেই জন্য বড়ই চিন্তিত হইয়াছেন। বউবাজারের শ্রীযুক্ত মহানন্দ কবিরাজ স্বামিজীকে দেখিতেছেন। স্বামী নিরঞ্জনানন্দের

অনুরোধে স্বামিজী কবিরাজী ঔষধ খাইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। আগামী মঙ্গলবার হইতে নুন, জল বন্ধ করিয়া "বাঁধা" ঔষধ খাইতে হইবে—আজ রবিবার।

শিষ্য বলিল, "মহাশয়, এই দারুণ গ্রীষ্মকাল! তাহাতে আবার আপনি ঘণ্টায় ৪।৫ বার করিয়া জল পান করেন, এ সময়ে আপনার জল বন্ধ করিয়া ঔষধ খাওয়া অসহ্য হইবে।"

স্বামিজী। তুই কি বল্‌ছিস্? ঔষধ খাওয়ার দিন প্রাতে আর জলপান কর্‌ব না বলে দৃঢ় সংকল্প কর্‌ব, তার পর সাধ্যি কি জল আর কণ্ঠের নীচে নাবেন। তখন একুশ দিন জল আর নীচে নাব্‌তে পার্‌ছেন না। শরীরটা ত মনেরই খোলস্; মন যা বল্‌বে সেইমত ত ওকে চল্‌তে হবে, তবে আর কি? নিরঞ্জনের অনুরোধে আমাকে এটা কর্‌তে হল, ওদের (গুরুভ্রাতাদের) অনুরোধ ত আর উপেক্ষা করতে পারিনে।

বেলা প্রায় ১০টা। স্বামিজী উপরেই বসিয়া আছেন। শিষ্যের সঙ্গে প্রসন্নবদনে মেয়েদের জন্য যে ভাবী মঠ করিবেন, তদ্বিষয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন; বলিতেছেন, "মাকে কেন্দ্রস্থানীয়া করে গঙ্গার পূর্ব্বতটে মেয়েদের জন্য একটি মঠ স্থাপন কর্‌তে হবে। এ মঠে যেমন ব্রহ্মচারী সাধু সব তৈরী হবে, ওপারের মেয়েদের মঠেও তেম্‌নি ব্রহ্মচারিণী সাধ্বী সব তৈরী হবে।"

শিষ্য। মহাশয়, ভারতবর্ষে বহু পূর্ব্বকালে মেয়েদের জন্য ত কোন মঠের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

বৌদ্ধযুগেই স্ত্রী-মঠের কথা শুনা যায়। কিন্তু উহা হইতে কালে নানা ব্যভিচার আসিয়া পড়িয়াছিল; ঘোর বামাচারে দেশ পর্য্যুদস্ত হইয়া গিয়াছিল।

স্বামিজী। এদেশে পুরুষ-মেয়েতে এতটা তফাৎ কেন যে করেছে, তা বোঝা কঠিন। বেদান্তশাস্ত্রে ত বলেছে, একই চিৎসত্তা সর্ব্বভূতে বিরাজ করছেন। তোরা মেয়েদের নিন্দাই করিস, কিন্তু তাদের উন্নতির জন্য কি করেছিস বল্ দেখি? স্মৃতি ফৃতি লিখে, নিয়ম নীতিতে বদ্ধ করে এদেশের পুরুষেরা মেয়েদের একেবারে manufacturing machine (পুত্র উৎপাদনের যন্ত্র) করে তুলেছে! মহামায়ার সাক্ষাৎ প্রতিমা এই সকল মেয়েদের এখন না তুল্‌লে বুঝি তোদের আর উপায়ান্তর আছে?

শিষ্য। মহাশয়, স্ত্রীজাতি সাক্ষাৎ মায়ার মূর্ত্তি। মানুষের অধঃপতনের জন্যই যেন উহাদের সৃষ্টি হইয়াছে। স্ত্রীজাতিই মায়া দ্বারা মানবের জ্ঞানবৈরাগ্য আবরিত করিয়া দেয়। সেই জন্যই বোধ হয় শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—উহাদের জ্ঞান-ভক্তি কখনও হইবে না।

স্বামিজী। কোন্ শাস্ত্রে এমন কথা আছে যে মেয়েরা জ্ঞান-ভক্তির অধিকারিণী হবে না? ভারতের অধঃপতন হল ভট্চায্ বামুনরা ব্রাহ্মণেতর জাতকে যখন বেদ পাঠের অনধিকারী বলে নির্দ্দেশ কর্‌লে, সেই সময়ে মেয়েদেরও সকল অধিকার কেড়ে নিলে। নতুবা বৈদিক যুগে, উপনিষদের যুগে, দেখ্‌তে পাবি মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া

স্ত্রীলোকেরা ব্রহ্মবিচারে ঋষিস্থানীয়া হয়ে রয়েছেন। হাজার বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সভায় গার্গী সগর্ব্বে যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্রহ্মবিচারে আহ্বান করেছিলেন। এই সব আদর্শ-স্থানীয়া মেয়েদের যখন অধ্যাত্মজ্ঞানে অধিকার ছিল, তখন এখনই বা মেয়েদের সে অধিকার থাক্‌বে না কেন? একবার যা ঘটেছে, তা আবার অবশ্য ঘটতে পারে। History repeats itself (ঘটনাসমূহের পুনরাবৃত্তি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ)। মেয়েদের পূজা করেই সব জাত বড় হয়েছে। যে দেশে—যে জাতে—মেয়েদের পূজা নেই, সে দেশ—সে জাত কখনও বড় হতে পারে নি, কস্মিন্‌কালে পার্‌বেও না। তোদের জাতের যে এত অধঃপতন ঘটেছে, তার প্রধান কারণ এই সব শক্তিমূর্ত্তির অবমাননা করা! মনু বলেছেন, "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥" (মনু—৩।৫৬) যেখানে স্ত্রীলোকের আদর নেই, স্ত্রীলোকেরা নিরানন্দে অবস্থান করে, সে সংসারের—সে দেশের কখন উন্নতির আশা নেই। এই জন্য এদের আগে তুল্‌তে হবে—এদের জন্য আদর্শ মঠ স্থাপন করতে হবে।

শিষ্য। মহাশয়, প্রথমবার বিলাত হইতে আসিয়া আপনি ষ্টার থিয়েটারে বক্তৃতা দিবার কালে তন্ত্রকে কত গালমন্দ করিয়াছিলেন। এখন আবার তন্ত্র-সমর্থিত স্ত্রী-পূজার সমর্থন করিয়া আপনার কথা আপনিই যে বদলাইতেছেন।

স্বামিজী। তন্ত্রের বামাচার মতটা পরিবর্ত্তিত হয়ে এখন যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, আমি তারই নিন্দা করেছিলুম। তন্ত্রোক্ত মাতৃভাবের অথবা ঠিক্ ঠিক্ বামাচারেরও নিন্দা করি নি। ভগবতী জ্ঞানে মেয়েদের পূজা করাই তন্ত্রের অভিপ্রায়। বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতনের সময় বামাচারটা ঘোর দূষিত হয়ে উঠেছিল, সেই দূষিত ভাবটা এখনকার বামাচারে এখনও রয়েছে; এখনও ভারতের তন্ত্রশাস্ত্র ঐ ভাবের দ্বারা influenced (ভাবিত) হয়ে রয়েছে। ঐ সকল বীভৎস প্রথারই আমি নিন্দা করেছিলুম—এখনও ত তা করি। যে মহামায়ার রূপরসাত্মক বাহ্যবিকাশ মানুষকে উন্মাদ করে রেখেছে, তাঁরই জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্যাদি আন্তর-বিকাশে আবার, মানুষকে সর্ব্বজ্ঞ, সিদ্ধসংকল্প, ব্রহ্মজ্ঞ করে দিচ্ছে—সেই মাতৃ-রূপিণীর স্ফুরদ্বিগ্রহস্বরূপিণী মেয়েদের পূজা করতে আমি কখনই নিষেধ করি নি। "সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে"—এই মহামায়াকে পূজা, প্রণতি দ্বারা প্রসন্না না কর্‌তে পার্‌লে সাধ্য কি ব্রহ্মা বিষ্ণু পর্য্যন্ত তাঁর হাত ছাড়িয়ে মুক্ত হয়ে যান? গৃহলক্ষ্মীগণের পূজাকল্পে—তাদের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যাবিকাশকল্পে এইজন্য মেয়েদের মঠ করে যাব।

শিষ্য। আপনার উহা উত্তম সংকল্প হইতে পারে, কিন্তু মেয়ে কোথায় পাইবেন? সমাজের কঠিন বন্ধনে কে কুলবধূদের স্ত্রী-মঠে যাইতে অনুমতি দিবে?

স্বামিজী। কেন রে? এখনও ঠাকুরের কত ভক্তিমতী মেয়েরা রয়েছেন। তাঁদের দিয়ে স্ত্রী-মঠ start (আরম্ভ) করে দিয়ে যাব। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী তাঁদের central figure (কেন্দ্রস্বরূপ) হয়ে বস্‌বেন। আর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তদিগের স্ত্রী-কন্যারা উহাতে প্রথমে বাস করবে। কারণ, তারা ঐরূপ স্ত্রী-মঠের উপকারিতা সহজেই বুঝতে পার্‌বে। তারপর, তাদের দেখাদেখি কত গেরস্ত এই মহাকার্য্যের সহায় হবে।

শিষ্য। ঠাকুরের ভক্তেরা এ কার্য্যে অবশ্যই যোগ দিবেন। কিন্তু সাধারণ লোকে এ কার্য্যের সহায় হইবে বলিয়া মনে হয় না।

স্বামিজী। জগতের কোন মহৎ কার্য্যই sacrifice (ত্যাগ) ভিন্ন হয় নি। বটগাছের অঙ্কুর দেখে কে মনে করতে পারে, কালে উহা প্রকাণ্ড বটগাছ হবে? এখন ত এইরূপে মঠ স্থাপন কর্‌ব। পরে দেখ্‌বি, এক আধ generation (পুরুষ) বাদে ঐ মঠের কদর দেশের লোক বুঝ্‌তে পার্‌বে। এই যে বিদেশী মেয়েরা আমার চেলী হয়েছে, এরাই এই কাজে জীবনপাত করে যাবে। তোরা ভয় কাপুরুষতা ছেড়ে এই মহৎ কাজে সহায় হ। আর এই উচ্চ ideal (আদর্শ) সকল লোকের সাম্‌নে ধর্। দেখ্‌বি, কালে এর প্রভায় দেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌বে।

শিষ্য। মহাশয়, মেয়েদের জন্য কিরূপ মঠ করিতে চাহেন,

তাহার সবিশেষ বিবরণ আমাকে বলুন। শুনিবার বড়ই উৎসাহ হইতেছে।

স্বামিজী। গঙ্গার ওপারে একটা প্রকাণ্ড জমি নেওয়া হবে। তাতে অবিবাহিতা কুমারীরা থাক্‌বে, আর বিধবা ব্রহ্মচারিণীরা থাক্‌বে। আর ভক্তিমতী গেরস্তের মেয়েরা মধ্যে মধ্যে এসে অবস্থান কর্‌তে পারে। এ মঠে পুরুষদের কোনরূপ সংস্রব থাকবে না। পুরুষ-মঠের বয়োবৃদ্ধ সাধুরা দূর থেকে স্ত্রী-মঠের কার্য্যভার চালাবে! স্ত্রী-মঠে মেয়েদের একটি স্কুল থাক্‌বে; তাতে ধর্ম্মশাস্ত্র, সাহিত্য, সংস্কৃত, ব্যাকরণ, চাই কি—অল্প বিস্তর ইংরেজীও শিক্ষা দেওয়া হবে। সেলাইয়ের কাজ, রান্না, গৃহকর্ম্মের যাবতীয় বিধান এবং শিশুপালনের স্থূল বিষয়গুলিও শেখান হবে। আর, জপ, ধ্যান, পূজা এসব ত শিক্ষার অঙ্গ থাক্‌বেই। যারা বাড়ী ছেড়ে একেবারে এখানে থাক্‌তে পার্‌বে, তাদের অন্নবস্ত্র এই মঠ থেকে দেওয়া হবে। যারা তা পার্‌বে না, তারা এই মঠে দৈনিক ছাত্রীস্বরূপে এসে পড়াশুনা কর্‌তে পার্‌বে। চাই কি, মঠাধ্যক্ষের অভিমতে মধ্যে মধ্যে এখানে থাক্‌তে ও যতদিন থাক্‌বে খেতেও পাবে। মেয়েদের ব্রহ্মচর্য্যকল্পে এই মঠে বয়োবৃদ্ধা ব্রহ্মচারিণীরা ছাত্রীদের শিক্ষার ভার নেবে। এই মঠে ৫।৭ বৎসর শিক্ষার পর মেয়েদের অভিভাবকেরা তাদের বিয়ে দিতে পার্‌বে। যোগ্যাধিকারিণী বলে বিবেচিত হলে অভিভাবক-দের মত নিয়ে ছাত্রীরা এখানে চিরকুমারীব্রতাবলম্বনে

অবস্থান করতে পারবে। যারা চিরকুমারী-ব্রত অবলম্বন করবে, তারাই কালে এই মঠের শিক্ষয়িত্রী ও প্রচারিকা হয়ে দাঁড়াবে এবং গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে centres (শিক্ষাকেন্দ্র) খুলে মেয়েদের শিক্ষাবিস্তারে যত্ন করবে। চরিত্রবতী, ধর্ম্মভাবাপন্না ঐরূপ প্রচারিকাদের দ্বারা দেশে যথার্থ স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার হবে। স্ত্রী-মঠের সংস্রবে যতদিন থাকবে, ততদিন ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করা এ মঠেরও ভিত্তিস্বরূপ হবে। ধর্ম্ম-পরতা, ত্যাগ ও সংযম এখানকার ছাত্রীদের অলঙ্কার হবে; আর সেবাধর্ম্ম তাদের জীবনব্রত হবে। এইরূপ আদর্শ জীবন দেখলে কে তাদের না সম্মান করবে—কেই বা তাদের অবিশ্বাস করবে? দেশের স্ত্রীলোকদের জীবন এইরূপে গঠিত হলে তবে ত তোদের দেশে সীতা, সাবিত্রী, গার্গীর আবার অভ্যুত্থান হবে। দেশাচারের ঘোর বন্ধনে প্রাণহীন, স্পন্দনহীন হয়ে তোদের মেয়েরা এখন কি যে হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা একবার পাশ্চাত্য দেশ দেখে এলে বুঝতে পারতিস্। মেয়েদের ঐ দুর্দ্দশার জন্য তোরাই দায়ী। আবার, দেশের মেয়েদের পুনরায় জাগিয়ে তোলাও তোদের হাতে রয়েছে। তাই বলছি, কাজে লেগে যা। কি হবে ছাই শুধু কতকগুলো বেদ বেদান্ত মুখস্থ করে?

শিষ্য। মহাশয়, এখানে শিক্ষালাভ করিয়াও যদি মেয়েরা বিবাহ করে, তবে আর তাহাদের ভিতর আদর্শ জীবন কেমন

করিয়া লোকে দেখিতে পাইবে? এমন নিয়ম হইলে ভাল হয় না কি যে, যাহারা এই মঠে শিক্ষালাভ করিবে তাহারা আর বিবাহ করিতে পারিবে না?

স্বামিজী। তা কি একেবারেই হয় রে? শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দিতে হবে। তার পর নিজেরাই ভেবে চিন্তে যা হয় কর্‌বে। বে করে সংসারী হলেও ঐরূপে শিক্ষিতা মেয়েরা নিজ নিজ পতিকে উচ্চ ভাবের প্রেরণা দিবে ও বীর পুত্রের জননী হবে। কিন্তু স্ত্রী-মঠের ছাত্রীদের অভিভাবকেরা ১৫ বৎসরের পূর্ব্বে তাদের বে দেবার নামগন্ধ কর্‌তে পার্‌বে না—এ নিয়ম রাখতে হবে।

শিষ্য। মহাশয়, তাহা হইলে সমাজে ঐ সকল মেয়েদের কলঙ্ক রটিবে। কেহই তাহাদের আর বিবাহ করিতে চাহিবে না।

স্বামিজী। কেন চাইবে না? তুই সমাজের গতি এখনও বুঝ্‌তে পারিস্ নি। এই সব বিদুষী ও কর্ম্মতৎপরা মেয়েদের বরের অভাব হবে না। "দশমে কন্যকাপ্রাপ্তিঃ" সে সব বচনে এখন সমাজ চল্‌ছে না—চল্‌বেও না। এখনি দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ নে?

শিষ্য। যাহাই বলুন, কিন্তু প্রথম প্রথম ইহার বিরুদ্ধে একটা ঘোরতর আন্দোলন হইবে।

স্বামিজী। তা হোক্ না, তাতে ভয় কি? সৎসাহসে অনুষ্ঠিত সৎকার্য্যে বাধা পেলে অনুষ্ঠাতাদের শক্তি আরও জেগে উঠ্‌বে। যাতে বাধা নেই—প্রতিকূলতা নেই, তাতে মানুষকে মৃত্যুপথে নিয়ে যায়। Struggle (বাধা

বিঘ্ন অতিক্রম করিবার চেষ্টাই) জীবনের চিহ্ন। বুঝেছিস ?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ।

স্বামিজী। পরমব্রহ্মতত্ত্বে লিঙ্গভেদ নেই। আমরা, "আমি তুমির" planeএ (ভূমিতে) লিঙ্গভেদটা দেখ্‌তে পাই; আবার মন যত অন্তর্ম্মুখ হতে থাকে, ততই ঐ ভেদজ্ঞানটা চলে যায়। শেষে, মন যখন সমরস ব্রহ্মতত্ত্বে ডুবে যায়, তখন আর এ স্ত্রী, ও পুরুষ—এই জ্ঞান একেবারেই থাকে না। আমরা ঠাকুরে ঐরূপ প্রত্যক্ষ দেখেছি। তাই বলি, মেয়ে পুরুষে বাহ্য ভেদ থাক্‌লেও স্বরূপতঃ কোন ভেদ নেই। অতএব পুরুষ যদি ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারে ত স্ত্রীলোক তা হতে পার্‌বে না কেন? তাই বল্‌ছিলুম মেয়েদের মধ্যে একজনও যদি কালে ব্রহ্মজ্ঞা হন, তবে তাঁর প্রতিভাতে হাজারো মেয়েমানুষ জেগে উঠ্‌বে এবং দেশের ও সমাজের কল্যাণ হবে। বুঝ্‌লি?

শিষ্য। মহাশয়, আপনার উপদেশে আজ আমার চক্ষু খুলিয়া গেল।

স্বামিজী। এখনি কি খুলেছে? যখন সর্ব্বাবভাসক আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করবি, তখন দেখ্‌বি, এই স্ত্রী-পুরুষ ভেদজ্ঞান একেবারে লুপ্ত হবে; তখনই মেয়েদের ব্রহ্মরূপিণী বলে বোধ হবে। ঠাকুরকে দেখেছি—স্ত্রী মাত্রেই মাতৃভাব—তা যে জাতির যেরূপ স্ত্রীলোকই হোক না কেন! দেখেছি কি না!—তাই এত করে তোদের ঐরূপ

তে বলি ও মেয়েদের জন্ম গ্রামে গ্রামে পাঠশালা খুলে তাদের মানুষ কর্‌তে বলি। মেয়েরা মানুষ হলে তবে ত কালে তাদের সন্তান সন্ততির দ্বারা দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে— বিদ্যা, জ্ঞান, শক্তি, ভক্তি দেশে জেগে উঠ্‌বে।

শিষ্য। আধুনিক শিক্ষায় কিন্তু মহাশয়, বিপরীত ফল ফলিতেছে বলিয়া বোধ হয়। মেয়েরা একটু আধটু পড়িতে ও সেমিজ্ গাউন্ পরিতেই শিখিতেছে, কিন্তু ত্যাগ, সংযম, তপস্যা ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রহ্মবিদ্যালাভের উপযোগী বিষয়ে কতটা উন্নত যে হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারা যাই-তেছে না।

স্বামিজী। প্রথম প্রথম অমনটা হয়ে থাকে। দেশে নূতন idea-র (ভাবের) প্রথম প্রচারকালে কতকগুলি লোক ঐ ভাব ঠিক্ ঠিক্ গ্রহণ করতে না পেরে অমন খারাপ হয়ে যায়। তাতে বিরাট সমাজের কি আসে যায়? কিন্তু যারা অধুনা প্রচলিত যৎসামান্য স্ত্রীশিক্ষার জন্যও প্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন, তাঁদের মহাপ্রাণতায় কি সন্দেহ আছে? তবে কি জানিস্, শিক্ষাই বলিস্ আর দীক্ষাই বলিস্—ধর্ম্মহীন হলে তাতে গলদ্ থাক্‌বেই থাক্‌বে। এখন ধর্ম্মকে centre (কেন্দ্র) করে রেখে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার কর্‌তে হবে। ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য শিক্ষাটা secondary (গৌণ) হবে। ধর্ম্মশিক্ষা, চরিত্রগঠন, ব্রহ্মচর্য্যব্রতোদ্‌যাপন এই জন্য শিক্ষার দরকার। বর্ত্তমানকালে এ পর্য্যন্ত ভারতে যে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার হয়েছে, তাতে ধর্ম্মটাকেই

secondary (গৌণ) করে রাখা হয়েছে। তাইতেই তুই যে সব দোষের কথা বল্‌লি, সেগুলি হয়েছে। কিন্তু তাতে স্ত্রীলোকদের কি দোষ বল্‌? সংস্কারকেরা নিজে ব্রহ্মজ্ঞ না হয়ে স্ত্রীশিক্ষা দিতে অগ্রসর হওয়াতেই তাদের ঐরূপ বে-চালে পা পড়েছে। সকল সৎকার্য্যের প্রবর্ত্তককেই অভীপ্সিত কার্য্যানুষ্ঠানের পূর্ব্বে কঠোর তপস্যাসহায়ে আত্মজ্ঞ হওয়া চাই। নতুবা তার কাজে গলদ বেরোবেই। বুঝ্‌লি?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ। দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক শিক্ষিতা মেয়েরা কেবল নভেল্‌ নাটক পড়িয়াই সময় কাটায়; পূর্ব্ববঙ্গে কিন্তু মেয়েরা শিক্ষিতা হইয়াও নানা ব্রতের অনুষ্ঠান করে। এদেশে ঐরূপ করে কি?

স্বামিজী। ভাল মন্দ সব দেশে সব জাতের ভেতর রয়েছে। আমাদের কাজ হচ্ছে—নিজের জীবনে ভাল কাজ করে লোকের সাম্‌নে example (দৃষ্টান্ত) ধরা। Condemn (নিন্দাবাদ) করে কোন কাজ সফল হয় না। কেবল লোক হটে যায়। যে যা বলে বলুক, কাকেও contradict (বিরুদ্ধ তর্ক করে পরাস্ত করতে চেষ্টা) কর্‌বি নি। এই মায়ার জগতে যা করতে যাবি, তাইতেই দোষ থাক্‌বে—"সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ"—আগুন থাক্‌লেই ধূম উঠ্‌বে। কিন্তু তাই বলে কি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাক্‌তে হবে? যতটা পারিস্‌, ভাল কাজ করে যেতে হবে।

শিষ্য। ভাল কাজটা কি?

স্বামিজী। যাতে ব্রহ্মবিকাশের সাহায্য করে, তাই ভাল কাজ। সব কাজই প্রত্যক্ষ না হোক, পরোক্ষভাবে—আত্মতত্ত্ব-বিকাশের সহায়কারী ভাবে করা যায়। তবে, ঋষি-প্রচলিত পথে চল্‌লে ঐ আত্মজ্ঞান শীগ্‌গির ফুটে বেরোয়। আর, যাকে শাস্ত্রকারগণ অন্যায় বলে নির্দ্দেশ করেছেন, সেগুলি করলে আত্মার বন্ধন ঘটে, কখন কখন জন্ম-জন্মান্তরেও সেই মোহবন্ধন ঘোচে না। কিন্তু সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই জীবের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। কারণ, আত্মাই জীবের প্রকৃত স্বরূপ। নিজের স্বরূপ নিজে কি ছাড়তে পারে? তোর ছায়ার সঙ্গে তুই হাজার বৎসর লড়াই করেও ছায়াকে কি তাড়াতে পারিস্?—সে তোর সঙ্গে থাক্‌বেই।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, আচার্য্য শঙ্করের মতে কর্ম্মও জ্ঞানের পরিপন্থী—জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়কে তিনি বহুধা খণ্ডন করিয়াছেন। অতএব কর্ম্ম কেমন করিয়া জ্ঞানের প্রকাশক হইবে?

স্বামিজী। আচার্য্য শঙ্কর ঐরূপ বলে, আবার জ্ঞানবিকাশকল্পে কর্ম্মকে আপেক্ষিক সহায়কারী, এবং সত্ত্বশুদ্ধির উপায় বলে নির্দ্দেশ করেছেন। তবে শুদ্ধ জ্ঞানে, কর্ম্মের অনুপ্রবেশও নেই—ভাষ্যকারের এ সিদ্ধান্তের আমি প্রতিবাদ করছিনে। ক্রিয়া, কর্ত্তা ও কর্ম্মবোধ যতকাল মানুষের থাক্‌বে, ততকাল সাধ্যি কি, সে কাজ না করে বসে থাকে? অতএব কর্ম্মই যখন জীবের স্বভাব

হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তখন যে সব কর্ম্ম এই আত্মজ্ঞানবিকাশ-কল্পে সহায়কারী হয়, সেগুলি কেন করে যা না? কর্ম্ম মাত্রই ভ্রমাত্মক—একথা পারমার্থিকরূপে যথার্থ হলেও ব্যবহারকল্পে কর্ম্মের বিশেষ উপযোগিত্ব আছে। তুই যখন আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ কর্‌বি, তখন কর্ম্ম করা বা না করা তোর ইচ্ছাধীন হয়ে দাঁড়াবে। সেই অবস্থায় তুই যা কর্‌বি, তাই সৎ কর্ম্ম হবে। তাতে জীবের—জগতের কল্যাণ হবে। ব্রহ্মবিকাশ হলে তোর শ্বাসপ্রশ্বাসের তরঙ্গ পর্য্যন্ত জীবের সহায়কারী হবে। তখন আর plan (মতলব) এঁটে কর্ম্ম কর্‌তে হবে না। বুঝলি?

শিষ্য। আহা, ইহা বেদান্তের কর্ম্ম ও জ্ঞানের সমন্বয়কারী অতি সুন্দর মীমাংসা।

অনন্তর নীচে প্রসাদ পাইবার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল এবং স্বামিজী শিষ্যকে প্রসাদ পাইতে যাইতে বলিলেন। শিষ্যও স্বামিজীর পাদপদ্মে প্রণত হইয়া যাইবার পূর্ব্বে করযোড়ে বলিল, "মহাশয়, আপনার স্নেহাশীর্ব্বাদে আমার যেন এ জন্মেই ব্রহ্মজ্ঞান অপরোক্ষ হয়।" স্বামিজী শিষ্যের মস্তকে হাত দিয়া বলিলেন "ভয় কি বাবা? তোরা কি আর এ জগতের লোক—না গেরস্ত, না সন্ন্যাসী—এই এক নূতন ঢং।"

চতুর্দ্দশ বল্লী

স্থান—বেলুড় মঠ

বর্ষ—১৯০১

বিষয়

স্বামিজীর ইন্দ্রিয়সংযম, শিষ্যপ্রেম, রন্ধনকুশলতা ও অসাধারণ মেধা—রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত সম্বন্ধে তাঁহার মতামত।

স্বামিজীর শরীর অসুস্থ। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ মহারাজের বিশেষ অনুরোধে স্বামিজী আজ ৫।৭ দিন যাবৎ কবিরাজী ঔষধ খাইতেছেন। এ ঔষধে জলপান একেবারে নিষিদ্ধ। দুগ্ধমাত্র পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিতে হইতেছে।

শিষ্য প্রাতেই মঠে আসিয়াছে। আসিবার কালে একটা রুই মাছ ঠাকুরের ভোগের জন্য আনিয়াছে। মাছ দেখিয়া স্বামী প্রেমানন্দ তাহাকে বলিলেন, "আজ ও মাছ আন্‌তে হয়? একে আজ রবিবার ; তার উপর স্বামিজী অসুস্থ—শুধু দুধ খেয়ে আজ ৫।৭ দিন আছেন।" শিষ্য অপ্রস্তুত হইয়া, নীচে মাছ ফেলিয়া, স্বামিজীর পাদপদ্ম-দর্শন মানসে উপরে গেল। স্বামিজী শিষ্যকে দেখিয়া সস্নেহে বলিলেন, "এসেছিস্? ভালই হয়েছে ; তোর কথাই ভাবছিলুম।"

শিষ্য। শুনিলাম, শুধু দুধ মাত্র পান করিয়া নাকি আজ পাঁচ সাত দিন আছেন?

স্বামিজী। হাঁ, নিরঞ্জনের একান্ত নির্ব্বন্ধাতিশয়ে কবিরাজী ঔষধ খেতে হল। ওদের কথা ত এড়াতে পারিনে।

শিষ্য। আপনি ত ঘণ্টায় পাঁচ ছয় বার জল পান করিতেন, কেমন করিয়া একেবারে উহা ত্যাগ করিলেন?

স্বামিজী। যখন শুন্‌লুম—এই ঔষধ খেলে জল খেতে পাব না, তখনি দৃঢ় সঙ্কল্প কর্‌লুম—জল খাব না। এখন আর জলের কথা মনেও আসে না।

শিষ্য। ঔষধে রোগের উপশম হইতেছে ত?

স্বামিজী। 'উপকার', 'অপকার' জানি নে। গুরুভাইদের আজ্ঞা পালন করে যাচ্ছি।

শিষ্য। দেশী কবিরাজী ঔষধ, বোধ হয়, আমাদের শরীরের পক্ষে সমধিক উপযোগী।

স্বামিজী। আমার মত কিন্তু একজন Scientific (বর্ত্তমান চিকিৎসা-বিজ্ঞান-বিশারদ) চিকিৎসকের হাতে মরাও ভাল; Lay man (হাতুড়ে), যারা বর্ত্তমান Science এর (শরীর বিজ্ঞানের) কিছুই জানে না, কেবল সেকেলে পাঁজি পুঁথির দোহাই দিয়ে অন্ধকারে ঢিল্ ছুড়ছে, তারা যদি দুচারটে রোগী আরাম করেও থাকে, তবু তাদের হাতে আরোগ্য লাভ আশা করা কিছু নয়।

এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিয়াছে, এমন সময় স্বামী প্রেমানন্দ স্বামিজীর কাছে আসিয়া বলিলেন যে, শিষ্য একটা বড় মাছ ঠাকুরের ভোগের জন্য আনিয়াছে, কিন্তু আজ রবিবার, কি করা যাইবে। স্বামিজী বলিলেন, "চল্, কেমন মাছ দেখ্‌ব।"

অনন্তর স্বামিজী একটা গরম জামা পরিলেন ও দীর্ঘ একগাছা যষ্টি হাতে লইয়া ধীরে ধীরে নীচের তলায় আসিলেন। মাছ দেখিয়া স্বামিজী আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আজই উত্তম করে মাছ রেঁধে ঠাকুরকে ভোগ দে।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান কালে ৺কালীমাতার প্রসাদী মাছ, মাংসও রবিবারে খাইতেন না, সেজন্য মঠে রবিবারে ঠাকুরকে মাছ ভোগ দেওয়া হইত না। স্বামী প্রেমানন্দ ঐ কথা স্মরণ করাইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "রবিবারে ঠাকুরকে মাছ দেওয়া হয় না যে।" তদুত্তরে স্বামিজী বলিলেন,—"ভক্তের আনীত দ্রব্যে শনিবার, রবিবার নেই। ভোগ দিগে যা।" স্বামী প্রেমানন্দ আর ওজর আপত্তি না করিয়া, স্বামিজীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন এবং সেদিন রবিবার সত্বেও ঠাকুরকে মৎস্য ভোগ দেওয়া স্থির হইল।

মাছ কাটা হইলে, ঠাকুরের ভোগের জন্য অগ্রভাগ রাখিয়া দিয়া, স্বামিজী ইংরাজী ধরণে রাঁধিবেন বলিয়া কতকটা মাছ নিজে চাহিয়া লইলেন এবং আগুনের তাতে পিপাসার বৃদ্ধি হইবে বলিয়া মঠের সকলে রাঁধিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেও কোন কথা না শুনিয়া দুধ, ভার্‌মিসেলি, দধি প্রভৃতি দিয়া চারি পাঁচ প্রকারে ঐ মাছ রাঁধিয়া ফেলিলেন। প্রসাদ পাইবার সময় স্বামিজী, ঐ সকল মাছের তরকারী আনিয়া শিষ্যকে বলিলেন, "বাঙ্গাল মৎস্যপ্রিয়। দেখ্ দেখি কেমন রান্না হয়েছে।" ঐ কথা বলিয়া তিনি ঐ সকল ব্যঞ্জনের বিন্দু বিন্দু মাত্র নিজে গ্রহণ করিয়া, শিষ্যকে স্বয়ং পরিবেশন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে স্বামিজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন হয়েছে? শিষ্য

বলিল, "এমন কখনও খাই নাই।" তাহার প্রতি স্বামিজীর অপার দয়ার কথা স্মরণ করিয়াই তখন তাহার প্রাণ পূর্ণ! ভার্‌মিসেলি—শিষ্য ইহজন্মে খায় নাই। উহা কি পদার্থ, জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করায় স্বামিজী বলিলেন, "ওগুলি বিলিতি কেঁচো। আমি লণ্ডন থেকে শুকিয়ে এনেছি।" মঠের সন্ন্যাসিগণ সকলে হাসিয়া উঠিলেন; শিষ্য রহস্য বুঝিতে না পারিয়া অপ্রতিভ হইয়া বসিয়া রহিল।

কবিরাজী ঔষধের কঠোর নিয়ম পালন করিতে যাইয়া স্বামিজীর এখন আহার নাই এবং নিদ্রাদেবী তাঁহাকে বহুকাল হইল একরূপ ত্যাগই করিয়াছেন, কিন্তু এই অনাহার অনিদ্রাতেও স্বামিজীর শ্রমের বিরাম নাই। কয়েক দিন হইল, মঠে নূতন Encyclopædia Britannica কেনা হইয়াছে। নূতন ঝক্‌ঝকে বইগুলি দেখিয়া শিষ্য স্বামিজীকে ব[illegible]লি, "এত বই এক জীবনে পড়া দুর্ঘট।" শিষ্য তখন জ[illegible] না যে, স্বামিজী ঐ বইগুলির দশ খণ্ড ইতিমধ্যে পড়িয়া শেষ করিয়া একাদশ খণ্ডখানি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন।

স্বামিজী। কি বল্‌ছিস্? এই দশখানি বই থেকে আমায় যা ইচ্ছা জিজ্ঞেস কর্—সব বলে দেব।

শিষ্য অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি এই বইগুলি সব পড়িয়াছেন?"

স্বামিজী। না পড়্‌লে কি বল্‌ছি?

অনন্তর স্বামিজীর আদেশ পাইয়া শিষ্য ঐ সকল পুস্তক হইতে বাছিয়া বাছিয়া কঠিন কঠিন বিষয় সকল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

আশ্চর্য্যের বিষয়,---স্বামিজী ঐ বিষয়গুলির পুস্তকে নিবদ্ধ মর্ম্ম ত বলিলেনই—তাহার উপর স্থানে স্থানে ঐ পুস্তকের ভাষা পর্য্যন্ত উদ্ধৃত করিয়া বলিতে লাগিলেন! শিষ্য ঐ বৃহৎ দশ খণ্ড পুস্তকের প্রত্যেকখানি হইতেই দুই একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিল এবং স্বামিজীর অসাধারণ ধী ও স্মৃতিশক্তি দেখিয়া অবাক্ হইয়া বইগুলি তুলিয়া রাখিয়া বলিল, "ইহা মানুষের শক্তি নয়!"

স্বামিজী। দেখ্‌লি, একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য পালন ঠিক ঠিক কর্‌তে পার্‌লে সমস্ত বিদ্যা মুহূর্ত্তে আয়ত্ত হয়ে যায়—শ্রুতিধর, স্মৃতিধর হয়। এই ব্রহ্মচর্য্যের অভাবেই আমাদের দেশের সব ধ্বংস হয়ে গেল।

শিষ্য। আপনি যাহাই বলুন মহাশয়, কেবল ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার ফলে এরূপ অমানুষিক শক্তির কথনই স্ফুরণ সম্ভবে না। আরও কিছু চাই।

উত্তরে স্বামিজী আর কিছু বলিলেন না।

অনন্তর স্বামিজী সর্ব্বদর্শনের কঠিন বিষয় সকলের বিচার ও সিদ্ধান্তগুলি শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন। অন্তরে অন্তরে ঐ সিদ্ধান্ত-গুলি প্রবেশ করাইয়া দিবার জন্যই যেন আজ তিনি ঐগুলি ঐরূপ বিশদভাবে তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন। এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিয়াছে, এমন সময় স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামিজীর ঘরে প্রবেশ করিয়া শিষ্যকে বলিলেন, "তুই ত বেশ! স্বামিজীর অসুস্থ শরীর—কোথায় গল্প সল্প করে স্বামিজীর মন প্রফুল্ল রাখ্‌বি, তা না—তুই কি না ঐ সব জটিল কথা তুলে স্বামিজীকে বকাচ্ছিস্!" শিষ্য অপ্রস্তুত হইয়া আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিল। কিন্তু স্বামিজী

ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে বলিলেন, "নে, রেখে দে, তোদের কবিরাজী নিয়ম ফিয়ম্—এরা আমার সন্তান, এদের সদুপদেশ দিতে দিতে আমার দেহটা যায় ত বয়ে গেল।" শিষ্য কিন্তু অতঃপর আর কোন দার্শনিক প্রশ্ন না করিয়া, বাঙ্গালদেশীয় কথা লইয়া হাসি তামাসা করিতে লাগিল। স্বামিজীও শিষ্যের সঙ্গে রঙ্গ-রহস্যে যোগ দিলেন। কিছুকাল এইরূপে কাটিবার পর, বঙ্গসাহিত্যে ভারতচন্দ্রের স্থান সম্বন্ধে প্রসঙ্গ উঠিল। ঐ বিষয়ের অল্প স্বল্প যাহা মনে আছে, তাহাই এখানে দিতেছি। প্রথম হইতে স্বামিজী ভারতচন্দ্রকে লইয়া নানা ঠাট্টা তামাসা আরম্ভ করিলেন; এবং তখনকার সামাজিক আচার-ব্যবহার বিবাহসংস্কারাদি লইয়াও নানারূপ ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন এবং সমাজে বাল্যবিবাহ-প্রচলন-সমর্থনকারী ভারতচন্দ্রের কুরুচি ও অশ্লীলতাপূর্ণ কাব্যাদি বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্য কোন দেশের সভ্য সমাজে প্রশ্রয় পায় নাই বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, "ছেলেদের হাতে ঐ সব বই যাতে না পড়ে, তাই করা উচিত।" পরে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথা তুলিয়া বলিলেন, "ঐ একটা অদ্ভুত genius (মনস্বী ব্যক্তি) তোদের দেশে জন্মেছিল। মেঘনাদবধের মত দ্বিতীয় কাব্য বাঙ্গালা ভাষাতে ত নাই-ই, সমগ্র ইউরোপেও অমন একখানা কাব্য ইদানীং পাওয়া দুর্লভ।"

শিষ্য বলিল, "কিন্তু মহাশয়, মাইকেল বড়ই শব্দাড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন বলিয়া বোধ হয়।"

স্বামিজী। তোদের দেশে কেউ একটা কিছু নূতন কর্‌লেই তোরা তাকে তাড়া করিস্। আগে ভাল করে দেখ্,

লোকটা কি বল্‌ছে, তা না—যাই কিছু আগেকার মত না হল অমনি দেশের লোকে তার পিছু লাগ্‌ল। এই মেঘনাদবধ কাব্য—যা তোদের বাঙ্গালা ভাষার মুকুটমণি—তাকে অপদস্থ কর্‌তে কিনা ছুঁচো বধ কাব্য লেখা হল! তা যত পারিস্ লেখ্‌না, তাতে কি? সেই মেঘনাদবধ কাব্য এখনও হিমাচলের ন্যায় অটলভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তার খুঁত ধর্‌তেই যাঁরা ব্যস্ত ছিলেন, সে সব criticদের (সমালোচকদিগের) মত ও লেখাগুলো কোথায় ভেসে গেছে! মাইকেল নূতন ছন্দে, ওজস্বিনী ভাষায় যে কাব্য লিখে গেছেন—তা সাধারণে কি বুঝ্‌বে? এই যে জি, সি, * কেমন নূতন ছন্দে কত চমৎকার চমৎকার বই আজকাল লিখ্‌ছে, তা নিয়েও তোদের অতিবুদ্ধি পণ্ডিতগণ কত criticise (সমালোচনা) কচ্ছে—দোষ ধর্‌ছে! জি, সি, কি তাতে ভ্রূক্ষেপ করে? পরে লোক ঐ সকল পুস্তক appreciate (আদর) কর্‌বে।

এইরূপে মাইকেলের কথা হইতে হইতে তিনি বলিলেন,—"যা, নীচে লাইব্রেরী থেকে মেঘনাদবধকাব্যখানা নিয়ে আয়।" শিষ্য মঠের লাইব্রেরী থেকে মেঘনাদবধকাব্য লইয়া আসিলে, বলিলেন, "পড়্ দিকি—কেমন পড়্‌তে জানিস্?"

শিষ্য বই খুলিয়া প্রথম সর্গের খানিকটা সাধ্যমত পড়িতে

---

* স্বামিজী মহাকবি ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে জি, সি, বলিয়া ডাকিতেন।

লাগিল। কিন্তু পড়া স্বামিজীর মনোমত না হওয়ায়, তিনি ঐ অংশটি পড়িয়া দেখাইয়া শিষ্যকে পুনরায় উহা পড়িতে বলিলেন। শিষ্য এবার অনেকটা কৃতকার্য্য হইল দেখিয়া প্রসন্নমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল্ দিকি—এই কাব্যের কোন অংশটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ?"

শিষ্য কিছুই না বলিতে পারিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া স্বামিজী বলিলেন, "যেখানে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে নিহত হয়েছে, মন্দোদরী শোকে মুহ্যমানা হয়ে রাবণকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ কর্ছে কিন্তু রাবণ পুত্রশোক মন থেকে জোর করে ঠেলে ফেলে, মহা-বীরের ন্যায় যুদ্ধে কৃতসঙ্কল্প—প্রতিহিংসা ও ক্রোধানলে স্ত্রী পুত্র সব ভুলে যুদ্ধের জন্য বহির্গমনোন্মুখ—সেই স্থান হচ্ছে কাব্যের শ্রেষ্ঠ কল্পনা! 'যা হবার হোক্ গে; আমার কর্ত্তব্য আমি ভুল্ব না এতে দুনিয়া থাক্, আর যাক্—এই হচ্ছে মহাবীরের বাক্য। মাইকেল সেইভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে কাব্যের ঐ অংশ লিখেছিলেন।"

এই বলিয়া স্বামিজী সে অংশ বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন। স্বামিজীর সেই বীরদর্পদ্যোতক পঠন-ভঙ্গী আজও শিষ্যের হৃদয়ে জ্বলন্ত জাগরূক রহিয়াছে।

পঞ্চদশ বল্লী

স্থান—বেলুড় মঠ

বর্ষ—১৯০১

বিষয়

আত্মা অতি নিকটে রহিয়াছেন, অথচ তাঁহার অনুভূতি সহজে হয় না কেন—অজ্ঞানাবস্থা দূর হইয়া জ্ঞানের প্রকাশ হইলে জীবের মনে নানা সন্দেহ প্রশ্নাদি আর উঠে না—স্বামিজীর ধ্যান-তন্ময়তা।

স্বামিজীর এখনও একটু অসুখ আছে। কবিরাজী ঔষধে অনেক উপকার হইয়াছে। মাসাধিক শুধু দুধ পান করিয়া থাকায় স্বামিজীর শরীরে আজকাল যেন চন্দ্রকান্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে এবং তাঁহার সুবিশাল নয়নের জ্যোতিঃ অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছে।

আজ দুইদিন হইল শিষ্য মঠেই আছে। যথাসাধ্য স্বামিজীর সেবা করিতেছে। আজ অমাবস্যা। শিষ্য, নির্ভয়ানন্দ স্বামীর সহিত ভাগাভাগি করিয়া স্বামিজীর রাত্রিসেবার ভার লইবে, স্থির হইয়াছে। এখন সন্ধ্যা হইয়াছে।

স্বামিজীর পদসেবা করিতে করিতে শিষ্য জিজ্ঞাসা করিল,—"মহাশয়, যে আত্মা সর্ব্বগ, সর্ব্বব্যাপী, অণুপরমাণুতে অনুস্যূত ও জীবের প্রাণের প্রাণ হইয়া তাহার এত নিকটে রহিয়াছেন, তাঁহার অনুভূতি হয় না কেন?"

স্বামিজী। তোর যে চোক আছে, তা কি তুই জানিস্? যখন

কেহ চোকের কথা বলে, তখন, 'আমার চোক আছে' বলে কতকটা ধারণা হয়; আবার চোকে বালি পড়ে যখন চোক কর্ কর্ করে, তখন চোক যে আছে, তা ঠিক ঠিক ধারণা হয়। সেইরূপ অন্তর হইতে অন্তরতম এই বিরাট আত্মার বিষয় সহজে বোধগম্য হয় না। শাস্ত্র বা গুরুমুখে শুনে খানিকটা ধারণা হয় বটে, কিন্তু যখন সংসারের তীব্র শোকদুঃখের কঠোর কশাঘাতে হৃদয় ব্যথিত হয়, যখন আত্মীয়স্বজনের বিয়োগে জীব আপনাকে অবলম্বনশূন্য জ্ঞান করে, যখন ভাবী জীবনের দুরতিক্রমণীয় দুর্ভেদ্য অন্ধকারে তার প্রাণ আকুল হয়, তখনি জীব এই আত্মার দর্শনে উন্মুখ হয়। দুঃখ—আত্মজ্ঞানের অনুকূল, এইজন্য। কিন্তু ধারণা থাকা চাই। দুঃখ পেতে পেতে কুকুর বেড়ালের মত যারা মরে, তারা কি আর মানুষ? মানুষ হচ্ছে সেই—যে এই সুখদুঃখের দ্বন্দ্ব প্রতিঘাতে অস্থির হয়েও বিচারবলে ঐ সকলকে নশ্বর ধারণা করে আত্মরতিপর হয়। মানুষে ও অন্যজীবজানোয়ারে এইটুকু প্রভেদ। যে জিনিষটা যত নিকটে হয় তার তত কম অনুভূতি হয়। আত্মা অন্তর হতে অন্তরতম, তাই অমনস্ক চঞ্চলচিত্ত জীব তাঁর সন্ধান পায় না। কিন্তু সমনস্ক শান্ত ও জিতেন্দ্রিয় বিচারশীল জীব, বহির্জগৎ উপেক্ষা করে অন্তর্জগতে প্রবেশ করতে করতে কালে এই আত্মার মহিমা উপলব্ধি করে গৌরবান্বিত হয়। তখনি সে আত্মজ্ঞান লাভ করে এবং "আমিই

সেই আত্মা"—"তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" প্রভৃতি বেদের মহাবাক্যসকল প্রত্যক্ষ অনুভব করে। বুঝ্‌লি ?

শিষ্য। আজ্ঞা, হাঁ। কিন্তু মহাশয়, এ দুঃখ কষ্ট তাড়নার মধ্য দিয়া আত্মজ্ঞান লাভের ব্যবস্থা কেন ? সৃষ্টি না হইলেই ত বেশ ছিল। আমরা সকলেই ত এককালে ব্রহ্মে বর্ত্তমান ছিলাম। ব্রহ্মের এইরূপ সিসৃক্ষাই বা কেন ? আর এই দ্বন্দ্ব-ঘাত-প্রতিঘাতে সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপ জীবের এই জন্ম-মরণ-সঙ্কুল পথে গতাগতিই বা কেন ?

স্বামিজী। লোকে মাতাল হলে কত খেয়াল দেখে। কিন্তু নেশা যখন ছুটে যায়, তখন সেগুলো মাথার ভুল বলে বুঝ্‌তে পারে। অনাদি অথচ সান্ত এই অজ্ঞান-বিলসিত সৃষ্টি ফৃষ্টি যা কিছু দেখ্‌ছিস্, সেটা তোর মাতাল অবস্থার কথা; নেশা ছুটে গেলে, তোর ঐ সব প্রশ্নই থাক্‌বে না।

শিষ্য। মহাশয়, তবে কি সৃষ্টি-স্থিত্যাদি কিছুই নাই ?

স্বামিজী। থাক্‌বে না কেন রে ? যতক্ষণ তুই এই দেহবুদ্ধি ধরে 'আমি আমি' কচ্ছিস্, ততক্ষণ এ সবই আছে। আর যখন তুই বিদেহ, আত্মরতি, আত্মক্রীড়—তখন তোর পক্ষে এ সব কিছু থাক্‌বে না; সৃষ্টি, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি আছে কি না—এ প্রশ্নেরও তখন আর অবসর থাক্‌বে না। তখন তোকে বল্‌তে হবে—

ক্ব গতং কেন বা নীতং কুত্র লীনমিদং জগৎ।
অধুনৈব ময়া দৃষ্টং নাস্তি কিং মহদদ্ভুতম্॥

শিষ্য। জগতের জ্ঞান একেবারে না থাকিলে, "কুত্র লীনমিদং জগৎ" কথাই বা কিরূপে বলা যেতে পারে ?

স্বামিজী। ভাষায় ঐ ভাবটা প্রকাশ করে বোঝাতে হচ্ছে, তাই ঐরূপ বলা হয়েছে। যেথানে ভাব ও ভাষার প্রবেশাধিকার নেই, সেই অবস্থাটা ভাব ও ভাষায় প্রকাশ করতে গ্রন্থকার চেষ্টা করছেন, তাই জগৎ কথাটা যে নিঃশেষে মিথ্যা, সেটা ব্যবহারিকরূপেই বলেছেন ; পারমার্থিক সত্তা জগতের নেই ; সে কেবল মাত্র "অবাঙ্‌মনসোগোচরম্‌" ব্রহ্মের আছে। বল্, তোর আর কি বল্‌বার আছে। আজ তোর তর্ক নিরস্ত করে দেবো।

ঠাকুরঘরে আরাত্রিকের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। মঠের সকলেই ঠাকুরঘরে চলিলেন। শিষ্য স্বামিজীর ঘরেই বসিয়া রহিল দেখিয়া স্বামিজী বলিলেন, "ঠাকুরঘরে গেলিনি ?"

শিষ্য। আমার এখানে থাকিতেই ভাল লাগিতেছে।

স্বামিজী। তবে থাক্।

কিছুকাল পরে শিষ্য ঘরের বাহিরে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল,—"আজ অমাবস্যা, আঁধারে চারিদিক যেন ছাইয়া ফেলিয়াছে। আজ কালীপূজার দিন।"

স্বামিজী শিষ্যের ঐ কথায় কিছু না বলিয়া, জানালা দিয়া পূর্ব্বাকাশের পানে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকাইয়া বলিলেন, "দেখ্‌ছিস্, অন্ধকারের কি এক অদ্ভুত গম্ভীর শোভা !'—বলিয়া সেই গভীর তিমিররাশির মধ্যে দেখিতে দেখিতে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। এখন সকলেই নিস্তব্ধ, কেবল দূরে ঠাকুরঘরে ভক্তগণ-পঠিত

শ্রীরামকৃষ্ণ স্তব মাত্র শিষ্যের কর্ণগোচর হইতেছে। স্বামিজীর এই অদৃষ্টপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য এবং গাঢ় তিমিরাবগুণ্ঠনে বহিঃ-প্রকৃতির নিস্তব্ধ স্থিরভাব দেখিয়া শিষ্যের মন এক প্রকার অপূর্ব্ব ভয়ে আকুল হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ এইরূপে গত হইবার পরে স্বামিজী আস্তে আস্তে গাহিতে লাগিলেন, "নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপ রাশি" ইত্যাদি।

গীত সাঙ্গ হইলে, স্বামিজী ঘরে প্রবেশ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন এবং মধ্যে মধ্যে 'মা' 'মা', 'কালী' 'কালী' বলিতে লাগিলেন। ঘরে তখন আর কেহই নাই। কেবল শিষ্য স্বামিজীর আজ্ঞা পালনের জন্য সমাহিত হইয়া অবস্থান করিতেছে।

স্বামিজীর সে সময়ের মুখ দেখিয়া শিষ্যের বোধ হইতে লাগিল, তিনি যেন কোন এক দূরদেশে এখনও অবস্থান করিতেছেন। চঞ্চল শিষ্য তাঁহার ঐ প্রকার ভাব দেখিয়া পীড়িত হইয়া বলিল,— "মহাশয়, এইবার কথাবার্ত্তা কহুন।"

স্বামিজী তাহার মনের ভাব বুঝিয়াই যেন মৃদু হাসিতে হাসিতে তাহাকে বলিলেন, "যাঁর লীলা এত মধুর, সেই আত্মার সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য কত দূর, বল্ দিকি?" শিষ্য তখনও তাঁহার সেই দূর দূর ভাব সম্যক অপগত হয় নাই দেখিয়া বলিল, "মহাশয়, ও সব কথায় এখন আর দরকার নাই; কেনই বা আজ আপনাকে অমাবস্যা ও কালীপূজার কথা বলিলাম—সেই অবধি আপনার যেন কেমন একটা পরিবর্ত্তন হইয়া গেল।"

স্বামিজী শিষ্যের ভাবগতিক দেখিয়া গান ধরিলেন,—

"কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা সুধা-তরঙ্গিণী" ইত্যাদি।

গান সমাপ্ত হইলে বলিতে লাগিলেন, "এই কালীই লীলারূপী ব্রহ্ম। ঠাকুরের কথা, 'সাপ চলা, আর সাপের স্থির ভাব'—শুনিস্ নি?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ।

স্বামিজী। এবার ভাল হয়ে মাকে রুধির দিয়ে পূজো করব! রঘুনন্দন বলেছেন, "নবম্যাং পূজয়েৎ দেবীং কৃত্বা রুধিরকর্দমম্"—এবার তাই করব। মাকে বুকের রক্ত দিয়ে পূজো করতে হয়, তবে যদি তিনি প্রসন্না হন। মার ছেলে বীর হবে—মহাবীর হবে। নিরানন্দে, দুঃখে, প্রলয়ে, মহালয়ে, মায়ের ছেলে নির্ভীক হয়ে থাকবে।

এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময় নীচে প্রসাদ পাইবার ঘণ্টা বাজিল। স্বামিজী শুনিয়া বলিলেন, "যা নীচে প্রসাদ পেয়ে শীগ্‌গীর আসিস্"। শিষ্য নীচে গেল।

ষোড়শ বল্লী

স্থান—বেলুড় মঠ

বর্ষ—১৯০১

বিষয়

অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য অগ্রসর হইতেছে না দেখিয়া স্বামিজীর চিত্তে অব-
।—বর্ত্তমান কালে দেশে কিরূপ আদর্শের আদর হওয়া কল্যাণকর—মহা-
ীরের আদর্শ—দেশে বীরের কঠোরপ্রাণতার উপযোগী সকল বিষয়ের আদর
চলন করিতে হইবে—সকল প্রকার দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করিতে হইবে—
মিজীর বাক্যের অদ্ভুত শক্তির দৃষ্টান্ত—লোককে শিক্ষা দিবার জন্য শিষ্যকে
ৎসাহিত করা—সকলের মুক্তি না হইলে ব্যষ্টির মুক্তি নাই এই মতের
ালোচনা ও প্রতিবাদ—ধারাবাহিক কল্যাণ-চিন্তা দ্বারা জগতের কল্যাণ
রা।

স্বামিজী আজকাল মঠেই অবস্থান করিতেছেন। শরীর তত সুস্থ
াহে; তবে সকালে সন্ধ্যায় বেড়াইতে বাহির হন। শিষ্য আজ,
শনিবার, মঠে আসিয়াছে। স্বামিজীর পাদপদ্মে প্রণত হইয়া, তাঁহার
শারীরিক কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছে।

স্বামিজী। এ শরীরের ত এই অবস্থা। তোরা ত কেহই আমার কাজে সহায়তা কর্‌তে অগ্রসর হচ্ছিস্ না। আমি একা কি কর্‌ব বল? বাঙ্গালা দেশের মাটিতে এবার এই শরীরটা হয়েছে, এ শরীর দিয়ে কি আর বেশী কাজ কর্ম্ম চল্‌তে পারে? তোরা সব এখানে আসিস্—

শুদ্ধাধার, তোরা যদি আমার এই সব কাজে সহায় না হস ত আমি একা কি করব বল ?

শিষ্য। মহাশয়, এই সকল ব্রহ্মচারী ত্যাগী, পুরুষেরা আপনার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন—আমার মনে হয়, আপনার কার্য্যে ইঁহারা প্রত্যেকে জীবন দিতে পারেন—তথাচ আপনি ঐ কথা বলিতেছেন কেন ?

স্বামিজী। কি জানিস্? আমি চাই—A band of young Bengal (একদল জোয়ান বাঙ্গালীর ছেলে), এরাই দেশের আশা-ভরসাস্থল। চরিত্রবান্, বুদ্ধিমান, পরার্থে সর্ব্বত্যাগী এবং আজ্ঞানুবর্ত্তী যুবকগণের উপরেই আমার ভবিষ্যৎ ভরসা। আমার idea (ভাব) সকল যারা work out (জীবনে পরিণত) করে আপনাদের ও দেশের কল্যাণ সাধনে জীবনপাত করতে পারবে। নতুবা দলে দলে কত ছেলে আসছে ও আসবে। তাদের মুখের ভাব তমোপূর্ণ—হৃদয় উদ্যমশূন্য—শরীর অপটু—মন সাহস শূন্য। এদের দিয়ে কি কাজ হয়? নচিকেতার মত শ্রদ্ধাবান দশবারটি ছেলে পেলে, আমি দেশের চিন্তা ও চেষ্টা নূতন পথে চালনা করে দিতে পারি।

শিষ্য। মহাশয়, এত যুবক আপনার নিকট আসিতেছে, ইহাদের ভিতর ঐরূপ স্বভাববিশিষ্ট কাহাকেও কি দেখিতে পাইতেছেন না ?

স্বামিজী। যাদের ভাল আধার বলে মনে হয়, তাদের মধ্যে কেউ বা বে করে ফেলেছে, কেউ বা সংসারের মান, যশ,

ধন উপার্জ্জনের চেষ্টাতে বিকিয়ে গিয়েছে; কারও বা শরীর অপটু। তার পর, বাকী অধিকাংশই উচ্চ ভাব নিতে অক্ষম। তোরা আমার ভাব নিতে সক্ষম বটে, কিন্তু তোরাও ত কার্য্যক্ষেত্রে সে সকল এখনও বিকাশ করতে পাচ্ছিস্ না। এই সব কারণে মনে সময় সময় বড়ই আক্ষেপ হয়; মনে হয়, দৈব-বিড়ম্বনে শরীর ধারণ করে কোন কাজই করে যেতে পাল্লুম না। অবশ্য এখনও একেবারে হতাশ হই নি, কারণ ঠাকুরের ইচ্ছা হলে এই সব ছেলেদের ভেতর থেকেই কালে মহা মহা ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর বেরুতে পারে —যারা ভবিষ্যতে আমার idea (ভাব) নিয়ে কাজ কর্‌বে।

শিষ্য। আমার মনে হয়, আপনার উদার ভাবসকল সকলকেই একদিন না একদিন লইতে হইবে। ঐটি আমার দৃঢ় ধারণা। কারণ, স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি—সকল দিকে সকল বিষয়কে আশ্রয় করিয়াই আপনার চিন্তা প্রবাহ ছুটিয়াছে!—কি জীবসেবা, কি দেশকল্যাণব্রত, কি ব্রহ্মবিদ্যা-চর্চ্চা, কি ব্রহ্মচর্য্য—সর্ব্বত্রই আপনার ভাব প্রবেশ করিয়া, উহাদের ভিতর একটা অভিনবত্ব আনিয়া দিয়াছে! আর, দেশের লোকে, কেহ বা আপনার নাম প্রকাশ্যে করিয়া, আবার কেহ বা আপনার নামটি গোপন করিয়া নিজেদের নামে আপনার ঐ ভাব ও মতই সকল বিষয়ে গ্রহণ ও সাধারণে উপদেশ করিতেছে।

স্বামিজী। আমার নাম না কর্‌লে, তাতে কি আর আসে যায়? আমার idea (ভাব) নিলেই হল। কামকাঞ্চনত্যাগী হয়েও শতকরা নিরেনব্বই জন সাধু নাম-যশে বদ্ধ হয়ে পড়ে। Fame—that last infirmity of noble mind (যশাকাঙ্ক্ষাই উচ্চান্তঃকরণের শেষ দুর্ব্বলতা) পড়েছিস্ না? একেবারে ফলকামনাশূন্য হয়ে কাজ করে যেতে হবে। ভাল, মন্দ—লোকে দুই ত বল্‌বেই। কিন্তু ideal (উচ্চাদর্শ) সাম্‌নে রেখে আমাদের সিঙ্গির মত কাজ করে যেতে হবে; তাতে, "নিন্দন্তু নীতিনিপুণাঃ যদি বা স্তুবন্তু" (পণ্ডিত ব্যক্তিরা নিন্দা বা স্তুতি যাহাই করুক।)

শিষ্য। আমাদের পক্ষে এখন কিরূপ আদর্শ গ্রহণ করা উচিত?

স্বামিজী। মহাবীরের চরিত্রকেই তোদের এখন আদর্শ কর্‌তে হবে। দেখ্‌না, রামের আজ্ঞায় সাগর ডিঙ্গিয়ে চলে গেল! জীবন-মরণে দৃক্‌পাত নেই—মহাজিতেন্দ্রিয়, মহাবুদ্ধিমান্! দাস্যভাবের ঐ মহা আদর্শে তোদের জীবন গঠিত কর্‌তে হবে। ঐরূপ হলেই অন্যান্য ভাবের স্ফুরণ কালে আপনা আপনি হয়ে যাবে। দ্বিধাশূন্য হয়ে গুরুর আজ্ঞা পালন, আর ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা—এই হচ্ছে secret of success (কৃতী হবার একমাত্র গূঢ়োপায়); "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" (অবলম্বন কর্‌বার আর দ্বিতীয় পথ নেই)। হনুমানের একদিকে যেমন সেবাভাব অন্যদিকে তেমনি ত্রিলোকসংত্রাসী সিংহবিক্রম।

রামের হিতার্থে জীবনপাত কর্‌তে কিছুমাত্র দ্বিধা রাখে না! রামসেবা ভিন্ন অন্য সকল বিষয়ে উপেক্ষা—ব্রহ্মত্ব শিবত্ব লাভে পর্য্যন্ত উপেক্ষা! শুধু রঘুনাথের আদেশ-পালনই জীবনের একমাত্র ব্রত। এরূপ একাগ্রনিষ্ঠ হওয়া চাই। খোল করতাল বাজিয়ে, লম্ফ ঝম্প করে দেশটা উচ্ছন্ন গেল। একেত এই dyspeptic (পেটরোগা) রোগীর দল—তাতে অত লাফালে ঝাঁপালে সইবে কেন? কামগন্ধহীন উচ্চ সাধনার অনুকরণ করতে গিয়ে দেশটা ঘোর তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। দেশে দেশে—গাঁয়ে গাঁয়ে—যেখানে যাবি, দেখ্‌বি, খোল্ করতালই বাজ্‌ছে! ঢাক ঢোল কি দেশে তৈরী হয় না? তুরী ভেরী কি ভারতে মেলে না? ঐ সব গুরুগম্ভীর আওয়াজ ছেলেদের শোনা। ছেলেবেলা থেকে মেয়েমানুষি বাজনা শুনে শুনে, কীর্ত্তন শুনে শুনে, দেশটা যে মেয়েদের দেশ হয়ে গেল! এর চেয়ে আর কি অধঃপাতে যাবে? কবিকল্পনাও এ ছবি আঁকতে হার মেনে যায়! ডমরু শিঙ্গা বাজাতে হবে, ঢাকে ব্রহ্মরুদ্রতালের দুন্দুভিনাদ তুল্‌তে হবে, 'মহাবীর' 'মহাবীর' ধ্বনিতে এবং 'হর হর ব্যোম ব্যোম' শব্দে দিগ্‌দেশ কম্পিত কর্‌তে হবে। যে সব musicএ (গীত-বাদ্যে) মানুষের soft feelings (হৃদয়ের কোমল ভাব-সমূহ) উদ্দীপিত করে, সে সকল কিছুদিনের জন্য এখন বন্ধ রাখ্‌তে হবে। খেয়াল টপ্পা বন্ধ করে, ধ্রুপদ গান

শুন্‌তে লোককে অভ্যাস করাতে হবে। বৈদিক ছন্দের মেঘমন্দ্রে দেশটার প্রাণসঞ্চার কর্‌তে হবে। সকল বিষয়ে বীরত্বের কঠোর মহাপ্রাণতা আন্‌তে হবে। এইরূপ ideal follow (আদর্শের অনুসরণ) কর্‌লে, তবে এখন জীবের কল্যাণ, দেশের কল্যাণ। তুই যদি একা এ ভাবে চরিত্র গঠন কর্‌তে পারিস, তা হলে তোর দেখা-দেখি হাজার লোক ঐরূপ কর্‌তে শিখ্‌বে। কিন্তু দেখিস, ideal (ঐ আদর্শ) থেকে কখন যেন এক পাও হটিস নি! কখন হীন সাহস হবি নি। খেতে শুতে পর্‌তে, গাইতে বাজাতে, ভোগে রোগে, কেবলই সৎসাহসের পরিচয় দিবি। তবে ত মহাশক্তির কৃপা হবে।

শিষ্য। মহাশয়, এক এক সময়ে কেমন হীন সাহস হইয়া পড়ি।

স্বামিজী। তখন এরূপ ভাব্‌বি—"আমি কার সন্তান?—তাঁর কাছে গিয়ে আমার এমন হীনবুদ্ধি—হীনসাহস!" হীন বুদ্ধি, হীনসাহসের মাথায় লাথি মেরে, "আমি বীর্য্যবান্—আমি মেধাবান্—আমি ব্রহ্মবিৎ—আমি প্রজ্ঞাবান্" বল্‌তে বল্‌তে দাঁড়িয়ে উঠ্‌বি। 'আমি অমুকের চেলা—কামকাঞ্চনজিৎ ঠাকুরের সঙ্গীর সঙ্গী' এইরূপ অভিমান খুব রাখ্‌বি। এতে কল্যাণ হবে। ঐ অভিমান যার নেই, তার ভিতর ব্রহ্ম জাগেন না। রামপ্রসাদের গান শুনিস নি? তিনি বল্‌তেন, "এ সংসারে ডরি কারে, রাজা যার মা মহেশ্বরী।" এইরূপ অভিমান সর্ব্বদা মনে জাগিয়ে রাখ্‌তে হবে। তা হলে

আর হীনবুদ্ধি—হীনসাহস নিকটে আস্‌বে না। কখনও মনে দুর্ব্বলতা আস্‌তে দিবিনি। মহাবীরকে স্মরণ করবি—মহামায়াকে স্মরণ করবি। দেখ্‌বি সব দুর্ব্বলতা—সব কাপুরুষতা তখনি চলে যাবে।

ঐরূপ বলিতে বলিতে স্বামিজী নীচে আসিলেন। মঠের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে যে আমগাছ আছে, তাহারই তলায় একখানা ক্যাম্পখাটে তিনি অনেক সময় বসিতেন; অগুও সেখানে আসিয়া পশ্চিমাস্যে উপবেশন করিলেন। তাঁহার নয়নে মহাবীরের ভাব যেন তখনও ফুটিয়া বাহির হইতেছে! উপবিষ্ট হইয়াই তিনি শিষ্যকে উপস্থিত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণকে দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন—

"এই যে প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম! একে উপেক্ষা করে যারা অন্য বিষয়ে মন দেয়—ধিক্ তাদের। করামলকবৎ এই যে ব্রহ্ম! দেখ্‌তে পাচ্ছিস নে?—এই—এই!"

এমন হৃদয়স্পর্শী-ভাবে স্বামিজী কথাগুলি বলিলেন যে, শুনিয়াই উপস্থিত সকলে "চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে"!—সহসা গভীরধ্যানে মগ্ন। কাহারও মুখে কথাটি নাই! স্বামী প্রেমানন্দ তখন গঙ্গা হইতে কমণ্ডলু করিয়া জল লইয়া ঠাকুরঘরে উঠিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াও স্বামিজী "এই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম—এই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম" বলিতে লাগিলেন। ঐ কথা শুনিয়া তাঁহারও তখন হাতের কমণ্ডলু হাতে বদ্ধ হইয়া রহিল; একটা মহা নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া তিনিও তখনি ধ্যানস্থ হইয়া পড়িলেন! এইরূপে প্রায় ১৫ মিনিট গত হইলে, স্বামিজী স্বামী প্রেমানন্দকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "যা, এখন ঠাকুরপূজায় যা।" স্বামী প্রেমানন্দের তবে

চেতনা হয়! ক্রমে সকলের মনই আবার "আমি আমার" রাজ্যে নামিয়া আসিল এবং সকলে যে যাহার কার্য্যে গমন করিল।

সেদিনের সেই দৃশ্য শিষ্য ইহজীবনে কখনও ভুলিতে পারিবে না। স্বামিজীর কৃপা ও শক্তিবলে তাহার চঞ্চল মনও সেদিন অনুভূতি রাজ্যের অতি সন্নিকটে গমন করিয়াছিল! এই ঘটনার সাক্ষিরূপে বেলুড়মঠের সন্ন্যাসিগণ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছেন। স্বামিজীর সেদিনকার সেই অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শন করিয়া, উপস্থিত সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে তিনি সকলের মন যেন সমাধির অতল জলে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন।

সেই শুভদিনের অনুধ্যান করিয়া শিষ্য এখনও আবিষ্ট হইয়া পড়ে এবং তাহার মনে হয়—পূজ্যপাদ আচার্য্যের কৃপায় ব্রহ্মভাব প্রত্যক্ষ করা তাহার ভাগ্যেও এক দিন ঘটিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে শিষ্য-সমভিব্যাহারে স্বামিজী বেড়াইতে গমন করিলেন। যাইতে যাইতে শিষ্যকে বলিলেন, "দেখ্‌লি, আজ কেমন হল? সবাইকে ধ্যানস্থ হতে হল। এরা ঠাকুরের সন্তান কিনা, বলবামাত্র এদের তখনি তখনি অনুভূতি হয়ে গেল।"

শিষ্য। মহাশয়, আমাদের মত লোকের মনও যখন নির্ব্বিষয় হইয়া গিয়াছিল, তখন ওঁদের কা কথা। আনন্দে আমার হৃদয় যেন ফাটিয়া যাইতেছিল! এখন কিন্তু ঐ ভাবের আর কিছুই মনে নাই—যেন স্বপ্নবৎ হইয়া গিয়াছে।

স্বামিজী। সব কালে হয়ে যাবে। এখন কাজ কর। এই মহামোহগ্রস্ত জীবসমূহের কল্যাণের জন্য কোন কাজে

লেগে যা। দেখ্‌বি ওসব আপ্‌নি আপ্‌নি হয়ে যাবে।

শিষ্য। মহাশয়, অত কর্ম্মের মধ্যে যাইতে ভয় হয়—সে সামর্থ্যও নাই। শাস্ত্রেও বলে, "গহনা কর্ম্মণো গতিঃ।"

স্বামিজী। তোর কি ভাল লাগে ?

শিষ্য। আপনার মত সর্ব্বশাস্ত্রার্থদর্শীর সঙ্গে বাস ও তত্ত্ববিচার করিব; আর শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা এ শরীরেই ব্রহ্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিব। এ ছাড়া কোন বিষয়েই আমার উৎসাহ হয় না। বোধ হয়, যেন অন্য কিছু করিবার সামর্থ্যও আমাতে নাই।

স্বামিজী। ভাল লাগে ত তাই করে যা। আর, তোর সব শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত লোকদেরও জানিয়ে দে, তা হলেই অনেকের উপকার হবে। শরীর যতদিন আছে, ততদিন কাজ না করে ত কেউ থাক্‌তে পারে না। সুতরাং যে কাজে পরের উপকার হয়, তাই করা উচিত। তোর নিজের অনুভূতি এবং শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তবাক্যে অনেক বিবিদিষুর উপকার হতে পারে। ঐ সব লিপিবদ্ধ করে যা। এতে অনেকের উপকার হতে পারে।

শিষ্য। অগ্রে আমারই অনুভূতি হউক, তখন লিখিব। ঠাকুর বলিতেন যে, "চাপ্‌রাস্‌ না পেলে, কেহ কাহারও কথা লয় না।"

স্বামিজী। তুই যে সব সাধনা ও বিচারের stage (অবস্থা) দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিস্‌, জগতে এমন লোক অনেক থাক্‌তে পারে, যারা ঐ stageএ (অবস্থায়) পড়ে

আছে ; ঐ অবস্থা পার হয়ে অগ্রসর হতে পারছে না। তোর experience (অনুভূতি) ও বিচার-প্রণালী লিপিবদ্ধ হলে, তাদেরও ত উপকার হবে। মঠে সাধুদের সঙ্গে যে সব "চর্চ্চা" করিস্, সেই বিষয়গুলি সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ করে রাখ্‌লে, অনেকের উপকার হতে পারে।

শিষ্য। আপনি যখন আজ্ঞা করিতেছেন, তখন ঐ বিষয়ে চেষ্টা করিব।

স্বামিজী। যে সাধন ভজন বা অনুভূতি দ্বারা পরের উপকার হয় না—মহামোহগ্রস্ত জীবকুলের কল্যাণ সাধিত হয় না—কামকাঞ্চনের গণ্ডি থেকে মানুষকে বের হতে সহায়তা করে না, এমন সাধন-ভজনে ফল কি? তুই বুঝি মনে করিস্, একটি জীবের বন্ধন থাক্‌তে তোর মুক্তি আছে? যত কালে—যত জন্মে তার উদ্ধার না হচ্ছে, তত কাল তোকেও জন্ম নিতে হবে—তাকে সাহায্য কর্‌তে, তাকে ব্রহ্মানুভূতি করাতে। প্রতি জীব তোরই অঙ্গ। এইজন্যই পরার্থে কর্ম্ম। তোর স্ত্রী-পুত্রকে আপনার জেনে তুই যেমন তাদের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলকামনা করিস্, প্রতি জীবে যখন তোর ঐরূপ টান্ হবে, তখন বুঝ্‌ব—তোর ভেতর ব্রহ্ম জাগরিত হচ্ছেন—not a moment before (এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও নহে), জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে এই সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলকামনা জাগরিত হলে, তবে বুঝ্‌ব—তুই ideal এর (আদর্শের) দিকে অগ্রসর হচ্ছিস্।

শিষ্য। এটি ত মহাশয় ভয়ানক কথা—সকলের মুক্তি না হইলে

ব্যক্তিগত মুক্তি হইবে না! কোথাও ত এমন অদ্ভুত সিদ্ধান্ত শুনি নাই!

স্বামিজী। এক class (শ্রেণীর) বেদান্তবাদীদের ঐরূপ মত আছে—তাঁরা বলেন, "ব্যষ্টিগত মুক্তি—মুক্তির যথার্থ স্বরূপ নহে। সমষ্টিগত মুক্তিই মুক্তি।" অবশ্য, ঐ মতের দোষগুণ যথেষ্ট দেখান যেতে পারে।

শিষ্য। বেদান্ত মতে ব্যষ্টিভাবই ত বন্ধনের কারণ। সেই উপাধিগত চিৎসত্তাই কাম্যকর্ম্মাদিবশে বদ্ধ বলিয়া প্রতীত হন। বিচারবলে উপাধিশূন্য হইলে—নির্ব্বিষয় হইলে—প্রত্যক্ষ চিন্ময় আত্মার বন্ধন থাকিবে কিরূপে? যাহার জীবজগতাদি বোধ থাকে, তাহার মনে হইতে পারে—সকলের মুক্তি না হইলে, তাহার মুক্তি নাই। কিন্তু শ্রবণাদি-বলে মন নিরুপাধিক হইয়া যখন প্রত্যগ্‌ব্রহ্মময় হয়, তখন তাহার নিকট জীবই বা কোথায়, আর জগতই বা কোথায়?—কিছুই থাকে না। তাহার মুক্তিতত্ত্বের অবরোধক কিছুই হইতে পারে না।

স্বামিজী। হাঁ, তুই যা বলছিস্, তাই অধিকাংশ বেদান্তবাদীর সিদ্ধান্ত। উহা নির্দ্দোষও বটে। ওতে ব্যক্তিগত মুক্তি অবরুদ্ধ হয় না। কিন্তু যে মনে করে, আমি আব্রহ্ম জগৎটাকে আমার সঙ্গে নিয়ে একসঙ্গে মুক্ত হব, তার মহাপ্রাণতাটা একবার ভেবে দেখ্‌ দেখি।

শিষ্য। মহাশয়, উহা উদারভাবের পরিচায়ক বটে, কিন্তু শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়।

স্বামিজী শিষ্যের কথাগুলি শুনিতে পাইলেন না, অন্য মনে কোন বিষয় ইতিপূর্ব্বে ভাবিতেছিলেন বলিয়া বোধ হইল। কিছুক্ষণ পরে বলিয়া উঠিলেন, "ওরে, আমাদের কি কথা হচ্ছিল ?" যেন পূর্ব্বের সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছেন ! শিষ্য ঐ বিষয়ের স্মরণ করাইয়া দেওয়ায় স্বামিজী বলিলেন, "দিনরাত ব্রহ্ম বিষয়ের অনুধ্যান করবি। একান্তমনে ধ্যান করবি। আর ব্যুত্থানকালে হয় কোন লোক-হিতকর বিষয়ের অনুষ্ঠান করবি—না হয় মনে মনে ভাববি,—'জীবের—জগতের উপকার হোক্'—'সকলের দৃষ্টি ব্রহ্মাবগাহী হোক্'. ঐরূপ ধারাবাহিক চিন্তা তরঙ্গের দ্বারাই জগতের উপকার হবে। জগতের কোন সদনুষ্ঠানই নিরর্থক হয় না, তা উহা কার্য্যই হোক—আর চিন্তাই হোক্। তোর চিন্তাতরঙ্গের প্রভাবে হয় ত আমেরিকার কোন লোকের চৈতন্য হবে।"

শিষ্য। মহাশয়, আমার মন যাহাতে যথার্থ নির্ব্বিষয় হয়, তদ্বিষয়ে আমাকে আশীর্ব্বাদ করুণ—এই জন্মে যেন তাহা হয়।

স্বামিজী। তা হবে বই কি। ঐকান্তিক থাক্‌লে নিশ্চয় হবে।

শিষ্য। আপনি মনকে ঐকান্তিক করিয়া দিতে পারেন ; আপনার সে শক্তি আছে, আমি জানি। আমাকে ঐরূপ করিয়া দিন্, ইহাই প্রার্থনা।

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতে হইতে শিষ্যসহ স্বামিজী মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন দশমীর চন্দ্রে মঠের উদ্যান যেন রজতধারায় প্লাবিত হইতেছিল। শিষ্য উল্লসিত-প্রাণে স্বামিজীর পশ্চাতে পশ্চাতে মঠ-প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া আনন্দে বিচরণ করিতে লাগিল। স্বামিজী উপরে বিশ্রাম করিতে গেলেন।

সপ্তদশ বল্লী

স্থান—বেলুড় মঠ

বর্ষ—১৯০১

বিষয়

মঠ সম্বন্ধে নৈষ্ঠিক হিন্দুদিগের পূর্ব্বধারণা—মঠে ৺দুর্গোৎসব ও ঐ ধারণার নিবৃত্তি—নিজ জননীর সহিত স্বামিজীর ৺কালীঘাট দর্শন ও ঐ স্থানের উদার ভাব সম্বন্ধে মত প্রকাশ—স্বামিজীর ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের দেবদেবীর পূজা করাটা ভাবিবার বিষয়—মহাপুরুষ ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্তই জন্ম পরিগ্রহ করেন—দেবদেবীর পূজা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিলে স্বামিজী কখনই ঐরূপ করিতেন না—স্বামিজীর ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ এ যুগে আর দ্বিতীয় জন্মগ্রহণ করেন নাই—তাঁহার প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইলেই দেশের ও জীবের ধ্রুবকল্যাণ।

বেলুড় মঠ স্থাপিত হইবার সময় নৈষ্ঠিক হিন্দুগণের মধ্যে অনেকে মঠের আচার-ব্যবহারের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিতেন। বিলাত-প্রত্যাগত স্বামিজী কর্তৃক স্থাপিত মঠে হিন্দুর আচার নিষ্ঠা সর্ব্বথা প্রতিপালিত হয় না এবং ভক্ষ্যাভোজ্যাদির বাচ-বিচার নাই—প্রধানতঃ এই বিষয় লইয়া নানা স্থানে আলোচনা চলিত এবং ঐ কথায় বিশ্বাসী হইয়া শাস্ত্রানভিজ্ঞ হিন্দুনামধারী ইতর ভদ্র অনেকে তখন সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসিগণের কার্য্যকলাপের অযথা নিন্দাবাদ করিত। চল্‌তি নৌকার আরোহিগণ বেলুড় মঠ দেখিয়াই নানারূপ ঠাট্টা তামাসা করিতে এবং এমন কি, সময় সময় অলীক অশ্লীল কুৎসা অবতারণা করিয়া নিষ্কলঙ্ক স্বামিজীর অমলধবল

চরিত্র আলোচনাতেও কুণ্ঠিত হইত না। নৌকায় করিয়া মঠে আসিবার কালে শিষ্য সময়ে সময়ে ঐরূপ সমালোচনা স্বকর্ণে শুনিয়াছে। তাহার মুখে স্বামিজী কখন কখন ঐ সকল সমালোচনা শুনিয়া বলিতেন, "হাতী চলে বাজারমে, কুত্তা ভুকে হাজার। সাধুন্‌কো দুর্ভাব নহি, যব নিন্দে সংসার।" কখনও বলিতেন, "দেশে কোন নূতন ভাব প্রচার হওয়ার কালে তাহার বিরুদ্ধে প্রাচীনপন্থাবলম্বিগণের অভ্যুত্থান প্রকৃতির নিয়ম। জগতের ধর্ম্ম-সংস্থাপকমাত্রকেই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে।" আবার কখনও বলিতেন, "Persecution (অন্যায় অত্যাচার) না হলে জগতের হিতকর ভাবগুলি সমাজের অন্তস্তলে সহজে প্রবেশ করতে পারে না।" সুতরাং সমাজের তীব্র কটাক্ষ ও সমালোচনাকে স্বামিজী তাঁহার নবভাব প্রচারের সহায় বলিয়া মনে করিতেন—কখনও উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতেন না—বা তাঁহার পদাশ্রিত গৃহী ও সন্ন্যাসিগণকে প্রতিবাদ করিতে দি তেন না। সকলকে বলিতেন, "ফলাভিসন্ধিহীন হয়ে কাজ কা ।, একদিন উহার ফল নিশ্চয়ই ফল্‌বে।" স্বামিজীর শ্রীমুখে একথাও সর্ব্বদাই শুনা যাইত, "ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।"

হিন্দুসমাজের এই তীব্র সমালোচনা স্বামিজীর লীলাবসানের পূর্ব্বে কিরূপে অন্তর্হিত হয়, আজ সেই বিষয়ে কিছু লিপিবদ্ধ হইতেছে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের মে কি জুন মাসে শিষ্য একদিন মঠে আসিয়াছে। স্বামিজী শিষ্যকে দেখিয়াই বলিলেন, "ওরে, একখানা রঘুনন্দনের 'অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব' শীগ্‌গীর আমার জন্য নিয়ে আস্‌বি।"

শিষ্য। আচ্ছা মহাশয়। কিন্তু রঘুনন্দনের স্মৃতি—যাহাকে কুসংস্কারের ঝুড়ি বলিয়া বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায় নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, তাহা লইয়া আপনি কি করিবেন?

স্বামিজী। কেন? রঘুনন্দন তদানীন্তন কালের একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত ছিলেন—প্রাচীন স্মৃতিসকল সংগ্রহ করে হিন্দুর দেশকালোপযোগী নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। সমস্ত বাঙ্গালা দেশ ত তাঁর অনুশাসনেই আজকাল চল্‌ছে। তবে তৎকৃত হিন্দুজীবনের গর্ভাধান হতে শ্মশানান্ত আচার-প্রণালীর কঠোর বন্ধনে সমাজ উৎপীড়িত হয়েছিল। শৌচ-প্রস্রাবে—খেতে-শুতে—অন্য সকল বিষয়ের ত কথাই নেই, সব্বাইকে তিনি নিয়মে বদ্ধ কর্‌তে প্রয়াস পেয়েছিলেন। সময়ের পরিবর্ত্তনে সে বন্ধন বহুকালস্থায়ী হতে পার্‌লে না। সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, ক্রিয়াকাণ্ড—সমাজের আচার-প্রণালী সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়। একমাত্র জ্ঞানকাণ্ডই পরিবর্ত্তিত হয় না। বৈদিক যুগেও দেখ্‌তে পাবি ক্রিয়াকাণ্ড ক্রমেই পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছে। কিন্তু উপনিষদের জ্ঞানপ্রকরণ আজ পর্য্যন্তও একভাবে রয়েছে। তবে তার interpreters (ব্যাখ্যাতা) অনেক হয়েছে—এইমাত্র।

শিষ্য। আপনি রঘুনন্দনের স্মৃতি লইয়া কি করিবেন?

স্বামিজী। এবার মঠে দুর্গোৎসব কর্‌বার ইচ্ছে হচ্ছে। যদি খরচার সঙ্কুলন হয়, ত মহামায়ার পূজো করব। তাই দুর্গোৎসববিধি পড়্‌বার ইচ্ছে হয়েছে। তুই আগামী রবিবারে

যখন আস্‌বি, তখন ঐ পুঁথিখানি সংগ্রহ করে নিয়ে আস্‌বি।

শিষ্য। যে আজ্ঞা।

পর রবিবারে শিষ্য রঘুনন্দনকৃত অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব ক্রয় করিয়া স্বামিজীর জন্য মঠে লইয়া আসিল, গ্রন্থখানি আজিও মঠের লাইব্রেরীতে রহিয়াছে? স্বামিজী পুস্তকখানি পাইয়া বড়ই খুসী হইলেন এবং ঐ দিন হইতে উহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া ৪।৫ দিনেই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া ফেলিলেন। শিষ্যের সঙ্গে সপ্তাহান্তে দেখা হইবার পর বলিলেন, "তোর দেওয়া রঘুনন্দনের স্মৃতিখানি সব পড়ে ফেলেছি। যদি পারি ত এবার মার পূজো করব। রঘুনন্দন বলেছেন, 'নবম্যাং পূজয়েৎ দেবীং কৃত্বা রুধির-কর্দ্দমম্'—মার ইচ্ছা হয় ত তাও করব।"

শিষ্যের সহিত স্বামিজীর উপরোক্ত কথাগুলি ৺পূজার তিন চারি মাস পূর্ব্বে হয়। পরে ঐ সম্বন্ধে আর কোন কথাই মঠের কাহারও সহিত কহেন নাই। কিন্তু তাঁহার ঐ সময়ের চালচলন দেখিয়া শিষ্যের মনে হইত যে, তিনি ঐ সম্বন্ধে আর কিছুই ভাবেন নাই। পূজার ১০।১২ দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও মঠে যে প্রতিমা আনয়ন করিয়া এ বৎসর পূজা হইবে, একথার কোন আলোচনা বা পূজা সম্বন্ধে কোন আয়োজন শিষ্য মঠে দেখিতে পায় নাই। স্বামিজীর জনৈক গুরুভ্রাতা ইতিমধ্যে একদিন স্বপ্নে দেখেন যে মা দশভূজা গঙ্গার উপর দিয়া দক্ষিণেশ্বর দিক হইতে মঠের দিকে আসিতেছেন! পরদিন প্রাতে স্বামিজী মঠের সকলের নিকট পূজা করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিলে, তিনিও তাঁহার

নিকট স্বীয় স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। স্বামিজীও তাহাতে আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "যেরূপে হোক, এবারে মঠে পূজো করতেই হবে।" তখন পূজা করা স্থির হইল এবং ঐ দিনই একখানা নৌকা ভাড়া করিয়া স্বামিজী, স্বামী প্রেমানন্দ ও ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল বাগ্‌বাজারে চলিয়া আসিলেন; অভিপ্রায়—বাগবাজারে অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণভক্তজননী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকট কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারীকে পাঠাইয়া ঐ বিষয়ে তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করা এবং তাঁহারই নামে সঙ্কল্প করিয়া ঐ পূজা সম্পন্ন হইবে, ইহা জ্ঞাপন করা। কারণ, সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীদিগের কোনরূপ পূজা বা ক্রিয়া "সঙ্কল্প" করিয়া, করিবার অধিকার নাই।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী স্বীকৃতা হইলেন এবং মঠের পূজা তাঁহারই নামে "সঙ্কল্পিত" হইবে, স্থির হইল। স্বামিজীও ঐজন্য বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং ঐ দিনেই কুমারটুলীতে প্রতিমার বায়না দিয়া মঠে প্রত্যাগমন করিলেন। স্বামিজীর পূজা করিবার কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল এবং ঠাকুরের গৃহী ভক্তগণ ঐ কথা শুনিয়া উহার আয়োজনে আনন্দে যোগদান করিলেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপরে পূজোপকরণ সংগ্রহের ভার পড়িল। কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী পূজক হইবেন স্থির হইল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পিতৃদেব সাধকাগ্রণী শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় তন্ত্রধারক পদে ব্রতী হইলেন। মঠে আনন্দ ধরে না! যে জমিতে এখন ঠাকুরের জন্ম-মহোৎসব হয়, সেই জমির উত্তর ধারে মণ্ডপ নির্ম্মিত হইল। ষষ্ঠীর বোধনের দুই এক দিন পূর্ব্বে কৃষ্ণলাল, নির্ভয়ানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ নৌকা করিয়া মায়ের

প্রতিমা মঠে লইয়া আসিলেন। ঠাকুরঘরে নীচের তলায় মায়ের মূর্ত্তিখানি আনিয়া রাখিবামাত্র, যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল—অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণ হইতে লাগিল। মায়ের প্রতিমা নির্ব্বিঘ্নে মঠে পৌছিয়াছে, এখন জল হইলেও কোন ক্ষতি নাই—ভাবিয়া, স্বামিজী নিশ্চিন্ত হইলেন।

এদিকে স্বামী ব্রহ্মানন্দের যত্নে মঠ দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ—পূজোপকরণেরও কিছুমাত্র ত্রুটি নাই—দেখিয়া, স্বামিজী স্বামী-ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মঠের দক্ষিণের বাগানবাটীখানি—যাহা পূর্ব্বে নীলাম্বরবাবুর ছিল, একমাসের জন্য ভাড়া করিয়া পূজার পূর্ব্বদিন হইতে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে আনিয়া রাখা হইল। অধিবাসের সান্ধ্যপূজা স্বামিজীর সমাধি-মন্দির এখন যেখানে অবস্থিত তাহার সম্মুখস্থ বিল্বমূলে সম্পন্ন হইল। তিনি ঐ বিল্ববৃক্ষমূলে বসিয়া পূর্ব্বে একদিন যে গান গাহিয়াছিলেন, "বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়ে বোধন, গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন" ইত্যাদি, তাহা এতদিনে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইল।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর অনুমতি লইয়া ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল মহারাজ সপ্তমীর দিনে পূজকের আসনে উপবেশন করিলেন। কৌলাগ্রণী তন্ত্রমন্ত্রকোবিদ ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণীর আদেশে সুরগুরু বৃহস্পতির ন্যায় তন্ত্রধারকের আসন গ্রহণ করিলেন। যথাশাস্ত্র মায়ের পূজা নির্ব্বাহিত হইল। কেবল শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর অনভিমত বলিয়া মঠে পশুবলিদান হইল না। বলির অনুকল্পে চিনির নৈবেদ্য ও স্তূপীকৃত মিষ্টান্নের রাশি প্রতিমার উভয়পার্শ্বে শোভা পাইতে লাগিল।

গরীব দুঃখী কাঙ্গাল দরিদ্রদিগকে দেহধারী ঈশ্বরজ্ঞানে পরিতোষ করিয়া ভোজন করান এই পূজার প্রধান অঙ্গরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বেলুড়, বালি ও উত্তরপাড়ার পরিচিত অপরিচিত অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিতকেও নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল এবং তাঁহারাও সকলে আনন্দে যোগদান করিয়াছিলেন। তদবধি মঠের প্রতি তাঁহাদের পূর্ব্ববিদ্বেষ বিদূরিত হইয়া ধারণা জন্মে যে, মঠের সন্ন্যাসীরা যথার্থ হিন্দুসন্ন্যাসী।

সে যাহাই হউক, মহাসমারোহে দিনত্রয়ব্যাপী মহোৎসবকল্লোলে মঠ মুখরিত হইল। নহবতের সুললিত তানতরঙ্গ গঙ্গার পরপারে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ঢাক-ঢোলের রুদ্রতালে কলনাদিনী ভাগীরথী নৃত্য করিতে লাগিল। "দীয়তাং নীয়তাং ভুজ্যতাম্"—কথা ব্যতীত মঠস্থ সন্ন্যাসিগণের মুখে ঐ তিন দিন আর কোন কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই। যে পূজায় সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী স্বয়ং উপস্থিত, যাহা স্বামিজীর সঙ্কল্পিত, দেহধারী দেবসদৃশ মহাপুরুষগণ যাহার কার্য্যসম্পাদক, সে পূজা যে অচ্ছিদ্র হইবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি! দিনত্রয়ব্যাপী পূজা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। গরীব দুঃখীর ভোজনতৃপ্তিসূচক কলরবে মঠ তিন দিন পরিপূর্ণ হইল।

মহাষ্টমীর পূর্ব্বরাত্রে স্বামিজীর জ্বর হইয়াছিল। সে জন্য তিনি পর দিন পূজায় যোগদান করিতে পারেন নাই; কিন্তু সন্ধিক্ষণে উঠিয়া জবাবিল্বদলে মহামায়ার শ্রীচরণে বারত্রয় পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া স্বীয় কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। নবমীর দিন তিনি সুস্থ হইয়াছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব নবমীরাত্রে যে সকল গান

গাহিতেন, তাহার দুই একটি স্বয়ং গাহিয়াও ছিলেন। মঠে সে রাত্রে আনন্দের তুফান বহিয়াছিল।

নবমীর দিন পূজাশেষে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর দ্বারা যজ্ঞ দক্ষিণান্ত করা হইল। যজ্ঞের ফোঁটা ধারণ এবং সঙ্কল্পিত পূজা সমাধা করিয়া স্বামিজীর মুখমণ্ডল দিব্যভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। দশমীর দিন সন্ধ্যান্তে মায়ের প্রতিমা গঙ্গাতে বিসর্জ্জন করা হইল এবং তৎপরদিন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীও স্বামিজীপ্রমুখ সন্ন্যাসিগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বাগবাজারে পূর্ব্বাবাসে প্রত্যাগমন করিলেন।

দুর্গোৎসবের পর স্বামিজী মঠে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী ও শ্যামা-পূজাও প্রতিমা আনাইয়া ঐ বৎসর যথাশাস্ত্র নির্ব্বাহিত করেন। ঐ পূজাতেও শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় তন্ত্রধারক এবং কৃষ্ণলাল মহারাজ পূজক ছিলেন।

শ্যামাপূজান্তে স্বামিজীর জননী মঠে একদিন বলিয়া পাঠান যে, বহুপূর্ব্বে স্বামিজীর বাল্যকালে তিনি এক সময়ে "মানত" করিয়াছিলেন যে, একদিন স্বামিজীকে সঙ্গে লইয়া কালীঘাটে গিয়া মহামায়ার পূজা দিবেন, উহা পূর্ণ করা নিতান্ত প্রয়োজন। জননীর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে স্বামিজী অগ্রহায়ন মাসের শেষভাগে শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িলেও, একদিন কালীঘাটে গিয়াছিলেন। ঐদিনে কালীঘাটে পূজা দিয়া মঠে ফিরিয়া আসিবার সময়ে শিষ্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং কি ভাবে তথায় পূজাদি দেন, তাহা শিষ্যকে বলিতে বলিতে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাহাই এক্ষনে এস্থলে লিপিবদ্ধ হইল।

ছেলেবেলায় স্বামিজীর একবার বড় অসুখ করে। তখন তাঁহার জননী "মানত" করেন যে, পুত্র আরোগ্যলাভ করিলে কালীঘাটে তাহাকে লইয়া যাইয়া মায়ের বিশেষ পূজা দিবেন ও শ্রীমন্দিরে তাহাকে গড়াগড়ি দেওয়াইয়া লইয়া আসিবেন। ঐ "মানতের" কথা এতকাল কাহারও মনে ছিল না। ইদানীং স্বামিজীর শরীর অসুস্থ হওয়ায়, তাঁহার গর্ভধারিণীর ঐ কথা স্মরণ হয় এবং তাঁহাকে ঐ কথা বলিয়া কালীঘাটে লইয়া যান। কালীঘাটে যাইয়া স্বামিজী কালী-গঙ্গায় স্নান করিয়া জননীর আদেশে আর্দ্র-বস্ত্রে মায়ের মন্দিরে প্রবেশ করেন এবং মন্দিরের মধ্যে শ্রীশ্রীকালী-মাতার পাদপদ্মের সম্মুখে তিনবার গড়াগড়ি দেন। তৎপরে মন্দির হইতে বাহির হইয়া সাতবার মন্দির প্রদক্ষিণ করেন। পরে নাটমন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বে অনাবৃত চত্বরে বসিয়া নিজেই হোম করেন। অমিত-বলবান তেজস্বী সন্ন্যাসীর সেই যজ্ঞসম্পাদন দর্শন করিতে মায়ের মন্দিরে সেদিন খুব ভিড় হইয়াছিল। শিষ্যের বন্ধু, কালীঘাটনিবাসী শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যিনি শিষ্যের সঙ্গে বহুবার স্বামিজীর নিকট যাতায়াত করিয়াছিলেন, ঐ যজ্ঞ স্বয়ং দর্শন করিয়াছিলেন। জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পুনঃপুনঃ ঘৃতাহুতি প্রদান করিয়া সে দিন স্বামিজী দ্বিতীয় ব্রহ্মার ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিলেন বলিয়া গিরীন্দ্রবাবু ঐ ঘটনা আজও বর্ণন করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক, ঘটনাটি শিষ্যকে পূর্ব্বোক্তভাবে শুনাইয়া স্বামিজী পরিশেষে বলিলেন, "কালীঘাটে এখনও কেমন উদার ভাব দেখ্‌লুম; আমাকে বিলাত-প্রত্যাগত 'বিবেকানন্দ' বলে জেনেও মন্দিরাধ্যক্ষগণ মন্দিরে প্রবেশ কর্‌তে কোন বাধাই

দেন নি, বরং পরম সমাদরে মন্দির মধ্যে নিয়ে গিয়ে যথেচ্ছা পূজো করতে সাহায্য করেছিলেন।”

এইরূপে জীবনের শেষভাগেও স্বামিজী হিন্দুর অনুষ্ঠেয় পূজা-পদ্ধতির প্রতি আন্তরিক ও বাহ্য বহু সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহাকে কেবলমাত্র বেদান্তবাদী বা ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, এই পূজানুষ্ঠান প্রভৃতি তাঁহাদিগের বিশেষরূপে ভাবিবার বিষয়। “আমি শাস্ত্রমর্যাদা নষ্ট করিতে আসি নাই—পূর্ণ করিতেই আসিয়াছি”—“I have come to fulfil and not to destroy”—উক্তিটির সফলতা স্বামিজী ঐরূপে নিজ জীবনে বহুধা প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। বেদান্তকেশরী শ্রীশঙ্করাচার্য্য বেদান্ত নির্ঘোষে ভূলোক কম্পিত করিয়াও যেমন হিন্দুর দেব দেবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই—ভক্তি প্রণোদিত হইয়া নানা স্তব স্তুতি রচনা করিয়াছিলেন, স্বামিজীও তদ্রূপ সত্য ও কর্ত্তব্য বুঝিয়াই পূর্ব্বোক্ত অনুষ্ঠানসকলের [illegible]। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বহু সম্মান প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বাগ্মিতায়, শাস্ত্রব্যাখ্যায়, লোক-কল্যাণ-কামনায়, সাধনায় ও জিতেন্দ্রিয়তায় স্বামিজীর তুল্য সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী মহাপুরুষ বর্ত্তমান শতাব্দীতে আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। ভারতের ভবিষ্যৎ বংশাবলী ইহা ক্রমে বুঝিতে পারিবে। তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া আমরা ধন্য ও মুগ্ধ হইয়াছি বলিয়াই, এই শঙ্করোপম মহাপুরুষকে বুঝিবার ও তদাদর্শে জীবন গঠন করিবার জন্য জাতিনির্ব্বিশেষে ভারতের যাবতীয় নরনারীকে আহ্বান করিতেছি। জ্ঞানে শঙ্কর, সহৃদয়তায় বুদ্ধ, ভক্তিতে নারদ, ব্রহ্মজ্ঞতায় শুকদেব, তর্কে বৃহস্পতি, রূপে

কামদেব, সাহসে অর্জ্জুন এবং শাস্ত্রজ্ঞানে ব্যাসতুল্য স্বামিজীর সম্পূর্ণতা বুঝিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা-সম্পন্ন শ্রীস্বামিজীর জীবনই যে বর্ত্তমান যুগে আদর্শরূপে একমাত্র অবলম্বনীয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই মহাসমন্বয়াচার্য্যের সর্ব্বমতসমঞ্জসা ব্রহ্মবিদ্যার তমোনাশী কিরণজালে সসাগরা ধরা আলোকিত হইয়াছে। হে ভ্রাতঃ, পূর্ব্বাকাশে এই তরুণারুণচ্ছটা দর্শন করিয়া জাগরিত হও, নবজীবনের প্রাণস্পন্দন অনুভব কর।

অষ্টাদশ বল্লী

স্থান—বেলুড় মঠ

বর্ষ—১৯০২

বিষয়

ঠাকুরের জন্মোৎসব ভবিষ্যতে কি ভাবে হইলে ভাল হয়—শিষ্যকে আশীর্ব্বাদ, 'যখন এখানে এসেছিস্, তখন নিশ্চয় জ্ঞানলাভ হবে'—গুরু শিষ্যকে কতকটা সাহায্য করিতে পারেন—অবতার পুরুষেরা এক দণ্ডে জীবের সমস্ত বন্ধন ঘুচাইয়া দিতে সক্ষম—কৃপা—শরীর-রক্ষার পরে ঠাকুরকে দেখা—পওহারী বাবা ও স্বামিজী-সংবাদ।

আজ ঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের) মহামহোৎসব—যে উৎসব স্বামিজী (স্বামী বিবেকানন্দ)শেষ দেখিয়া গিয়াছেন। এই উৎসবের পরের আষাঢ় মাসের ২০শে তারিখে রাত্রি ৯টা আন্দাজ, তিনি স্বরূপ সম্বরণ করিয়াছিলেন। উৎসবের কিছু পূর্ব্ব হইতে স্বামিজীর শরীর অসুস্থ। উপর হইতে নামেন না, চলিতে পারেন না, পা ফুলিয়াছে। ডাক্তারেরা বেশী কথাবার্ত্তা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন।

শিষ্য শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দেশে সংস্কৃত ভাষায় একটি স্তব রচনা করিয়া উহা ছাপাইয়া আনিয়াছে। আসিয়াই, স্বামি-পাদ-পদ্ম দর্শন করিতে উপরে গিয়াছে। স্বামিজী মেজেতে অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় বসিয়াছিলেন। শিষ্য আসিয়াই, স্বামিজীর শ্রীপাদপদ্ম হৃদয়ে ও মস্তকে স্পর্শ করিল এবং আস্তে আস্তে পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। স্বামিজী শিষ্য-রচিত স্তবটি পড়িতে আরম্ভ করিবার

পূর্ব্বে তাহাকে বলিলেন, "খুব আস্তে আস্তে পায়ে হাত বুলিয়ে দে, পা ভারী টাটিয়েছে।" শিষ্য তদনুরূপ করিতে লাগিল।

স্তব-পাঠান্তে স্বামিজী হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, "বেশ হয়েছে।"

হায়! শিষ্য সে সময় জানে না যে, তার রচনার প্রশংসা স্বামিজী আর এ শরীরে করিবেন না।

স্বামিজীর শারীরিক অসুস্থাবস্থা এতদূর বাড়িয়াছে দেখিয়া, শিষ্যের মুখ ম্লান হইল এবং বুক ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল।

স্বামিজী শিষ্যের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "কি ভাবছিস্? শরীরটা জন্মেছে, আবার মরে যাবে। তোদের ভেতরে আমার ভাবগুলির কিছু কিছুও যদি ঢুকুতে (প্রবিষ্ট করাতে) পেরে থাকি, তা হলেই জান্‌ব দেহটা ধরা সার্থক হয়েছে।"

শিষ্য। আমরা কি আপনার দয়ার উপযুক্ত আধার? নিজগুণে দয়া করিয়া যাহা করিয়া দিয়াছেন, তাহাতেই আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে হয়।

স্বামিজী। সর্ব্বদা মনে রাখিস্, ত্যাগই হচ্ছে—মূল মন্ত্র। এ মন্ত্রে দীক্ষিত না হলে, ব্রহ্মাদিরও মুক্তির উপায় নেই।

শিষ্য। মহাশয়, আপনার শ্রীমুখ হইতে ঐ কথা নিত্য শুনিয়া এত দিনেও উহা ধারণা হইল না, সংসারাসক্তি গেল না, ইহা কি কম পরিতাপের কথা! আশ্রিত দীন সন্তানকে আশীর্ব্বাদ করুন, যাহাতে শীঘ্র উহা প্রাণে প্রাণে ধারণা হয়।

স্বামিজী। ত্যাগ নিশ্চয় আস্‌বে, তবে কি জানিস্?—"কালেনাত্মনি

বিন্দতি"—সময় না এলে হয় না। কতকগুলি প্রাগ্‌-জন্ম-সংস্কার কেটে গেলেই, ত্যাগ ফুটে বেরোবে।

কথাগুলি শুনিয়া শিষ্য অতি কাতরভাবে স্বামিজীর পাদপদ্ম ধারণ করিয়া বলিতে লাগিল, "মহাশয়, এ দীন দাসকে জন্মে জন্মে পাদপদ্মে আশ্রয় দেন—ইহাই একান্ত প্রার্থনা। আপনার সঙ্গে থাকিলে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভেও আমার ইচ্ছা হয় না।"

স্বামিজী উত্তরে কিছুই না বলিয়া, অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। শিষ্যের মনে হইল, তিনি যেন দূর-দৃষ্টি-চক্রবালে তাঁহার ভাবী জীবনের ছবি দেখিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "লোকের গুলতোন্ (উৎসবের লোক-সমাগম) দেখে কি আর হবে? আজ আমার কাছে থাক্। আর, নিরঞ্জনকে ডেকে দোরে বসিয়ে দে—কেউ যেন আমার কাছে এসে বিরক্ত না করে।" শিষ্য দৌড়িয়া গিয়া স্বামী নিরঞ্জনানন্দকে স্বামিজীর আদেশ জানাইল। স্বামী নিরঞ্জনানন্দও সকল কার্য্য উপেক্ষা করিয়া, মাথায় পাগ্‌ড়ি বাঁধিয়া ও হাতে লাঠি লইয়া, স্বামিজীর ঘরের দরজার সম্মুখে আসিয়া বসিলেন।

অনন্তর ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া শিষ্য পুনরায় স্বামিজীর কাছে আসিল। মনের সাধে আজ স্বামিজীর সেবা করিতে পারিবে ভাবিয়া তাহার মন আজ আনন্দে উৎফুল্ল! স্বামিজীর পদসেবা করিতে করিতে সে বালকের ন্যায় যত মনের কথা স্বামিজীকে খুলিয়া বলিতে লাগিল, স্বামিজীও হাস্যমুখে তৎকৃত প্রশ্নাদির উত্তর ধীরে ধীরে দিতে লাগিলেন। এইরূপে সেদিন কাটিতে লাগিল।

স্বামিজী। আমার মনে হয়, এরূপ ভাবে এখন আর ঠাকুরের উৎসব না হয়ে অন্যভাবে হয় ত বেশ হয়। একদিন নয়, চার পাঁচ দিন ধরে উৎসব হবে। ১ম দিন—হয়ত শাস্ত্রাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা হল। ২য় দিন—হয়ত বেদবেদান্তাদির বিচার ও মীমাংসা হল। ৩য় দিন—হয়ত Question Class (প্রশ্নোত্তর) হল। তার পর দিন—চাই কি Lecture (বক্তৃতা) হল। শেষ দিনে এখন যেমন মহোৎসব হয় তেমনি হল। দুর্গাপূজা যেমন চার দিন ধরে হয়—তেম্‌নি। ঐরূপে উৎসব কর্‌লে শেষ দিন ছাড়া অপর কয়দিন অবশ্য ঠাকুরের ভক্তমণ্ডলী ভিন্ন আর কেউ বোধ হয় বড় একটা আস্‌তে পার্‌বে না। তা নাই বা এল। বহু লোকের গুল্‌তোন হলেই যে ঠাকুরের মত খুব প্রচার হল, তা ত নয়।

শিষ্য। মহাশয়, আপনার উহা সুন্দর কল্পনা; আগামী বারে তাহাই করা যাইবে। আপনার ইচ্ছা হইলে সব হইবে।

স্বামিজী। আর বাবা, ওসব কর্‌তে মন যায় না। এখন থেকে তোরা ওসব করিস্।

শিষ্য। মহাশয়, এবার অনেক দল কীর্ত্তন আসিয়াছে।

ঐ কথা শুনিয়া স্বামিজী উহা দেখিবার জন্য ঘরের দক্ষিণ-দিকের মধ্যের জানালার রেলিং ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সমাগত অগণ্য ভক্ত-মণ্ডলীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। অল্পক্ষণ দেখিয়াই আবার বসিলেন। দাঁড়াইয়া কষ্ট হইয়াছে বুঝিয়া শিষ্য তাঁহার মস্তকে আস্তে আস্তে ব্যজন করিতে লাগিল।

স্বামিজী। তোরা হচ্ছিস্ ঠাকুরের লীলার Actors (অভিনেতা)। এর পরে—আমাদের কথা ত ছেড়েই দে—তোদেরও লোকে নাম কর্‌বে। এই যে সব স্তব লিখছিস্, এর পর লোকে ভক্তি মুক্তি লাভের জন্য এই সব স্তব পাঠ কর্‌বে। জান্‌বি, আত্মজ্ঞান লাভই পরম সাধন। অবতার-পুরুষরূপী জগদ্‌গুরুর প্রতি ভক্তি হলে ঐ জ্ঞান কালে আপনিই ফুটে বেরোবে।

শিষ্য অবাক্ হইয়া শুনিতে লাগিল।

শিষ্য। মহাশয়, আমার ঐ জ্ঞানলাভ হইবে ত?

স্বামিজী। ঠাকুরের আশীর্ব্বাদে তোর জ্ঞান-ভক্তি হবে। কিন্তু সংসারাশ্রমে তোর বিশেষ কোন সুখ হবে না।

শিষ্য স্বামিজীর ঐ কথায় বিষণ্ণ হইল এবং স্ত্রীপুত্রের কি দশা হইবে, ভাবিতে লাগিল।

শিষ্য। আপনি যদি দয়া করিয়া মনের বন্ধনগুলা কাটিয়া দেন তবেই উপায়; নতুবা এ দশার উপায়ান্তর নাই! আপনি শ্রীমুখের বাণী দিন—যেন এই জন্মেই মুক্ত হয়ে যাই।

স্বামিজী। ভয় কি? যখন এখানে এসে পড়েছিস্, তখন নিশ্চয় হয়ে যাবে।

শিষ্য স্বামিজীর পাদপদ্ম ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "এবার আমায় উদ্ধার করিতে হইবেই হইবে।"

স্বামিজী। কে কার উদ্ধার কর্‌তে পারে বল্? গুরু কেবল কতকগুলি আবরণ দূর করে দিতে পারে। ঐ আবরণগুলো

গেলেই, আত্মা আপনার গৌরবে আপনি জ্যোতিষ্মান্ হয়ে সূর্য্যের মত প্রকাশ পান।

শিষ্য। তবে শাস্ত্রে কৃপার কথা শুনতে পাই কেন?

স্বামিজী। কৃপা মানে কি জানিস্? যিনি আত্ম-সাক্ষাৎকার করেছেন, তাঁর ভেতরে একটা মহাশক্তি খেলে। তাঁকে centre (কেন্দ্র) করে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত radius (ব্যাসার্দ্ধ) লয়ে যে একটা circle (বৃত্ত) হয়, সেই circle এর (বৃত্তের) ভেতর যারা এসে পড়ে, তারা ঐ আত্মবিৎ সাধুর ভাবে অনুপ্রাণিত হয়, অর্থাৎ ঐ সাধুর ভাবে তারা অভিভূত হয়ে পড়ে। সুতরাং সাধন-ভজন না করেও তারা অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক ফলের অধিকারী হয়। একে যদি কৃপা বলিস্ ত বল।

শিষ্য। এ ছাড়া আর কোনরূপ কৃপা নাই কি মহাশয়?

স্বামিজী। তাও আছে। যখন অবতার আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত, মুমুক্ষু-পুরুষেরা সব তাঁর লীলার সহায়তা করতে শরীর ধারণ করে আসেন। কোটি জন্মের অন্ধকার কেটে এক জন্মে মুক্ত করে দেওয়া কেবল মাত্র অবতারেরাই পারেন। এরই মানে কৃপা। বুঝ্লি?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার দর্শন পাইল না, তাহাদের উপায় কি?

স্বামিজী। তাদের উপায় হচ্ছে—তাঁকে ডাকা। ডেকে ডেকে অনেকে তাঁর দেখা পায়—ঠিক এমনি আমাদের মত শরীর দেখতে পায় ও তাঁর কৃপা পায়।

শিষ্য। মহাশয়, ঠাকুরের শরীর যাইবার পর আপনি তাঁহার দর্শন পাইয়াছেন কি?

স্বামিজী। ঠাকুরের শরীর যাবার পর, আমি কিছুদিন গাজীপুরে পওহারী বাবার সঙ্গ করি। পওহারী বাবার আশ্রমের অনতিদূরে একটা বাগানে ঐ সময় আমি থাকতুম। লোকে সেটাকে ভূতের বাগান বল্‌ত। কিন্তু আমার তাতে ভয় হত না; জানিস্ ত আমি ব্রহ্মদৈত্য, ভূত-ফুতের ভয় বড় রাখিনি। ঐ বাগানে অনেক নেবু-গাছ, বিস্তর ফল্‌ত। আমার তখন অত্যন্ত পেটের অসুখ, আবার তার ওপর সেখানে রুটী ভিন্ন অন্য কিছু ভিক্ষা মিল্‌ত না। কাজেই হজমের জন্য খুব নেবু খেতুম। পওহারী বাবার কাছে যাতায়াত করে, তাঁকে খুব ভাল লাগল। তিনিও আমায় খুব ভালবাস্‌তে লাগলেন। একদিন মনে হল, শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কাছে এত কাল থেকেও এই রুগ্ন শরীরটাকে দৃঢ় কর্‌বার কোন উপায়ই ত পাই নি। পওহারী বাবা শুনেছি, হঠযোগ জানেন। এঁর কাছে হঠযোগের ক্রিয়া জেনে নিয়ে, শরীরটাকে দৃঢ় করে নেবার জন্য এখন কিছুদিন সাধন কর্‌ব। জানিস্ ত, আমার বাঙ্গালের মত রোক্। যা মনে কর্‌ব তা কর্‌বই। যে দিন দীক্ষা নেবো মনে করেছি, তার আগের রাত্রে একটা খাটিয়ায় শুয়ে পড়ে ভাব্‌ছি, এমন সময় দেখি, ঠাকুর আমার দক্ষিণ পাশে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে আছেন,

যেন বিশেষ দুঃখিত হয়েছেন। তাঁর কাছে মাথা বিকিয়েছি, আবার অপর একজনকে গুরু কর্‌ব—এই কথা মনে হওয়ায়, লজ্জিত হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলুম। এইরূপে বোধ হয় ২।৩ ঘণ্টা গত হল; তখন কিন্তু আমার মুখ থেকে কোন কথা বেরোল না। তারপর হঠাৎ তিনি অন্তর্দ্ধান হলেন। ঠাকুরকে দেখে মন একরকম হয়ে গেল, কাজেই সে দিনের মত দীক্ষা নেবার সঙ্কল্প স্থগিত রাখ্‌তে হল। দুই এক দিন বাদে, আবার পওহারী বাবার নিকট মন্ত্র নেবার সঙ্কল্প উঠল। সে দিন রাত্রেও আবার ঠাকুরের আবির্ভাব হল—ঠিক আগেকার দিনের মত। এইরূপ উপর্য্যুপরি একুশ দিন ঠাকুরের দর্শন পাবার পর, দীক্ষা নেবার সঙ্কল্প একেবারে ত্যাগ কর্‌লুম। মনে হল, যখনই মন্ত্র নেব মনে কর্‌ছি, তখনই যখন এইরূপ দর্শন হচ্ছে, তখন মন্ত্র নিলে অনিষ্ট বৈ ইষ্ট হবে না।

শিষ্য। মহাশয়, ঠাকুরের শরীর-রক্ষার পর কখনও তাঁহার সঙ্গে আপনার কোন কথা হইয়াছিল কি?

স্বামিজী সে কথার কোন উত্তর না দিয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। খানিক বাদে শিষ্যকে বলিলেন, "ঠাকুরের যারা দর্শন পেয়েছে, তারা ধন্য! 'কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা'। তোরাও তাঁর দর্শন পাবি। যখন এখানে এসে পড়েছিস্, তখন তোরা এখানকার লোক। 'রামকৃষ্ণ' নাম ধরে কে যে এসেছিল কেউ চিন্‌লে না। এই যে তাঁর অন্তরঙ্গ, সাঙ্গোপাঙ্গ—এরাও তাঁর

ঠাওর পায়নি। কেহ কেহ কিছু কিছু পেয়েছে মাত্র। পরে সকলে বুঝবে। এই যে রাখাল টাখাল, যারা তাঁর সঙ্গে এসেছে—এদেরও ভুল হয়ে যায়। অন্যের কথা আর কি বল্‌ব?"

এইরূপ কথা হইতেছে এমন সময় স্বামী নিরঞ্জনানন্দ দ্বারে আঘাত করায় শিষ্য উঠিয়া নিরঞ্জনানন্দ স্বামিপাদকে জিজ্ঞাসা করিল, "কে এসেছে?" স্বামী নিরঞ্জনানন্দ বলিলেন, "ভগ্নী নিবেদিতা ও অপর দু চারজন ইংরেজ মহিলা।" শিষ্য স্বামিজীকে ঐ কথা বলায়, স্বামিজী বলিলেন, "ঐ আল্‌খাল্লাটা দে ত।" শিষ্য উহা তাঁহাকে আনিয়া দিলে তিনি সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া সভ্য ভব্য হইয়া বসিলেন ও শিষ্য দ্বার খুলিয়া দিল। ভগ্নী নিবেদিতা ও অপর ইংরেজ মহিলারা প্রবেশ করিয়া মেজেতেই বসিলেন এবং স্বামিজীর শারীরিক কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া সামান্য কথাবার্ত্তার পরেই চলিয়া গেলেন। স্বামিজী শিষ্যকে বলিলেন, "দেখ্‌ছিস্‌, এরা কেমন সভ্য? বাঙ্গালী হলে, আমার অসুখ দেখেও অন্ততঃ আধ ঘণ্টা বকাত।" শিষ্য আবার দরজা বন্ধ করিয়া স্বামিজীকে তামাক সাজিয়া দিল।

বেলা প্রায় ২॥০টা। লোকের মহা ভিড় হইয়াছে। মঠের জমিতে তিল-পরিমাণ স্থান নাই। কত কীর্ত্তন, কত প্রসাদ-বিতরণ হইতেছে—তাহার সীমা নাই! স্বামিজী শিষ্যের মন বুঝিয়া বলিলেন, "একবার নয় দেখে আয়—খুব শীগগীর আস্‌বি কিন্তু।" শিষ্যও আনন্দে বাহির হইয়া উৎসব দেখিতে গেল। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ দ্বারে পূর্ব্ববৎ বসিয়া রহিলেন।

দশ মিনিট আন্দাজ বাদে শিষ্য ফিরিয়া আসিয়া স্বামিজীকে উৎসবের ভিড়ের কথা বলিতে লাগিল।

স্বামিজী। কত লোক হবে?

শিষ্য। পঞ্চাশ হাজার।

শিষ্যের কথা শুনিয়া স্বামিজী উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সেই জনসঙ্ঘ দেখিয়া বলিলেন, "বড় জোর ৩০ হাজার।"

উৎসবের ভিড় ক্রমে কমিয়া আসিল। বেলা ৪॥০ টার সময় স্বামিজীর ঘরের দরজা জানালা সব খুলিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু তাঁহার শরীর অসুস্থ থাকায় কাহাকেও তাঁহার নিকটে যাইতে দেওয়া হইল না।

ঊনবিংশ বল্লী

স্থান—বেলুড় মঠ

বর্ষ—১৯০২

বিষয়

স্বামিজী শেষ জীবনে কি ভাবে মঠে থাকিতেন—তাঁহার দরিদ্রনারায়ণ-সেবা—দেশের গরীব দুঃখীর প্রতি তাঁহার জ্বলন্ত সহানুভূতি।

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে প্রত্যাগমনের পর স্বামিজী মঠেই অবস্থান করিতেন এবং মঠের গৃহস্থালী কার্য্যের তত্ত্বাবধান ও কখন কখন কোন কোন কর্ম্ম স্বহস্তে সম্পন্ন করিয়া অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। কখন নিজ হস্তে মঠের জমি কোপাইতেন, কখন গাছপালা ফল-ফুলের বীজ রোপণ করিতে[ন]। আবার কখন বা চাকর-বাকরের ব্যারাম হওয়ায়, ঘর দ্বারে [ঝাঁট] পড়ে নাই দেখিয়া নিজ হস্তে ঝাঁটা ধরিয়া ঐ সকল পরিষ্কার করিতেন। যদি কেহ তাহা দেখিয়া, 'আপনি কেন!'– বলিতেন, তাহা হইলে তদুত্তরে বলিতেন, "তা হলই বা—অপরিষ্কার থাক্‌লে মঠের সকলের যে অসুখ করবে!" ঐ কালে তিনি মঠে কতকগুলি গাভী, হাঁস, কুকুর ও ছাগল পুষিয়াছিলেন। বড় একটা মাদী ছাগলকে "হংসী" বলিয়া ডাকিতেন ও তারই দুধে প্রাতে চা খাইতেন। ছোট একটি ছাগলছানাকে "মট্রু" বলিয়া ডাকিতেন ও আদর করিয়া তাহার গলায় ঘুঙ্গুর পরাইয়া দিয়াছিলেন। ছাগলছানাটা আদর

পাইয়া স্বামিজীর পায়ে পায়ে বেড়াইত এবং স্বামিজী তাহার সঙ্গে পাঁচ বছরের বালকের ন্যায় দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলা করিতেন। মঠ দর্শনে নবাগত ব্যক্তিরা তাঁহার পরিচয় পাইয়া ও তাঁহাকে ঐরূপ চেষ্টায় ব্যাপৃত দেখিয়া অবাক্ হইয়া বলিত, "ইনিই বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ!" কিছুদিন পরে "মট্রু" মরিয়া যাওয়ায়, স্বামিজী বিষণ্ণচিত্তে শিষ্যকে বলিয়াছিলেন,—"দ্যাখ, আমি যেটাকেই একটু আদর কর্‌তে যাই, সেটাই মরে যায়।"

মঠের জমির জঙ্গল সাফ্ করিতে ও মাটি কাটিতে প্রতি বর্ষেই কতকগুলি স্ত্রী-পুরুষ সাঁওতাল আসিত। স্বামিজী তাহাদের লইয়া কত রঙ্গ করিতেন এবং তাহাদের সুখ-দুঃখের কথা শুনিতে কত ভালবাসিতেন। একদিন কলিকাতা হইতে কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক মঠে স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। স্বামিজী তামাক খাইতে খাইতে সেদিন সাঁওতালদের সঙ্গে এমন গল্প জুড়িয়াছেন যে, স্বামী সুবোধানন্দ আসিয়া তাঁহাকে ঐ সকল ব্যক্তির আগমন-সংবাদ দিলে, তিনি বলিলেন, "আমি এখন দেখা কর্‌তে পার্‌ব না, এদের নিয়ে বেশ আছি।" বাস্তবিকই সেদিন স্বামিজী ঐ সকল দীন দুঃখী সাঁওতালদের ছাড়িয়া আগন্তুক ভদ্রলোকদের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন না।

সাঁওতালদের মধ্যে একজনের নাম ছিল 'কেষ্টা'। স্বামিজী কেষ্টাকে বড় ভালবাসিতেন। কথা কহিতে আসিলে কেষ্টা কখন কখন স্বামিজীকে বলিত, "ওরে স্বামী বাপ্—তুই আমাদের কাজের বেলা এখানকে আসিস্ না—তোর সঙ্গে

কথা বল্‌লে আমাদের কাজ বন্ধ হয়ে যায় ; আর বুড়ো বাবা এসে বকে।" কথা শুনিয়া, স্বামিজীর চোখ ছল্‌ ছল্‌ করিত এবং বলিতেন, "না না, বুড়ো বাবা (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) বক্‌বে না ; তুই তোদের দেশের দুটো কথা বল"—বলিয়া, তাহাদের সাংসারিক সুখ-দুঃখের কথা পাড়িতেন।

একদিন স্বামিজী কেষ্টাকে বলিলেন, "ওরে, তোরা আমাদের এখানে খাবি?" কেষ্টা বলিল, "আমরা যে তোদের ছোঁয়া এখন আর খাই না, এখন যে বিয়ে হয়েছে, তোদের ছোঁয়া নুন খেলে জাত যাবেরে বাপ্‌।" স্বামিজী বলিলেন, "নুন কেন খাবি? নুন না দিয়ে তরকারী রেঁধে দেবে। তা হলে ত খাবি?" কেষ্টা ঐ কথায় স্বীকৃত হইল। অনন্তর স্বামিজীর আদেশে মঠে সেই সকল সাঁওতালদের জন্য লুচি, তরকারী, মেঠাই, মণ্ডা, দধি ইত্যাদি যোগাড় করা হইল এবং তিনি তাহাদের বসাইয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। খাইতে খাইতে কেষ্টা বলিল, 'হাঁরে স্বামী বাপ্‌—তোরা এমন জিনিষটা কোথায় পেলি—হামরা এমনটা কখনো খাইনি।' স্বামিজী তাহাদের পরিতোষ করিয়া খাওয়াইয়া বলিলেন, "তোরা যে নারায়ণ—আজ আমার নারায়ণের ভোগ দেওয়া হল।" স্বামিজী যে দরিদ্র-নারায়ণসেবার কথা বলিতেন, তাহা তিনি নিজে এইরূপে অনুষ্ঠান করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন।

আহারান্তে সাঁওতালরা বিশ্রাম করিতে গেলে স্বামিজী শিষ্যকে বলিলেন, "এদের দেখলুম, যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ—এমন সরলচিত্ত—এমন অকপট অকৃত্রিম ভালবাসা, এমন আর দেখিনি।"

ঊনবিংশ বল্লী

অনন্তর মঠের সন্ন্যাসিবর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ্, এরা কেমন সরল! এদের কিছু দুঃখ দূর কর্‌তে পার্‌বি? নতুবা গেরুয়া পরে আর কি হল? 'পরহিতায়' সর্ব্বস্ব অর্পণ—এরই নাম যথার্থ সন্ন্যাস। এদের ভাল জিনিষ কখন কিছু ভোগ হয়নি। ইচ্ছা হয়—মঠ ফঠ সব বিক্রি করে দিই, এই সব গরীব দুঃখী দরিদ্র-নারায়ণদের বিলিয়ে দিই, আমরা ত গাছতলা সার করেইছি। আহা! দেশের লোক খেতে পর্‌তে পাচ্ছে না—আমরা কোন্ প্রাণে মুখে অন্ন তুল্‌ছি? ওদেশে যখন গিয়েছিলুম—মাকে কত বল্লুম, 'মা! এখানে লোক ফুলের বিছানায় শুচ্ছে, চর্ব্ব্য চূষ্য খাচ্ছে, কি না ভোগ কর্‌ছে!—আর আমাদের দেশের লোকগুলো না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে—মা! তাদের কোন উপায় হবে না'? ওদেশে ধর্ম্ম প্রচার কর্‌তে যাওয়ার আমার এই আর একটা উদ্দেশ্য ছিল যে এদেশের লোকের জন্য যদি অন্নসংস্থান কর্‌তে পারি।

"দেশের লোকে দুবেলা দুমুঠো খেতে পায় না দেখে এক এক সময় মনে হয়—ফেলে দিই তোর শাঁখ বাজান, ঘণ্টা নাড়া—ফেলে দিই তোর লেখা পড়া ও নিজে মুক্ত হবার চেষ্টা—সকলে মিলে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে চরিত্র ও সাধনা-বলে বড়লোকদের বুঝিয়ে কড়ি পাতি যোগাড় করে নিয়ে আসি ও দরিদ্র-নারায়ণদের সেবা করে জীবনটা কাটিয়ে দিই।

"আহা, দেশে গরীব দুঃখীর জন্য কেউ ভাবেনা রে! যারা জাতির মেরুদণ্ড—যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে—যে মেথর মুদ্দফরাস্ একদিন কাজ বন্ধ কর্‌লে সহরে হাহাকার রব ওঠে—

হায়! তাদের সহানুভূতি করে, তাদের সুখে দুঃখে সান্ত্বনা দেয়, দেশে এমন কেউ নাইরে! এই দেখ্‌না—হিন্দুদের সহানুভূতি না পেয়ে—মাদ্রাজ অঞ্চলে হাজার হাজার পেরিয়া কৃশ্চিয়ান্ হয়ে যাচ্ছে। মনে করিস্‌নি কেবল পেটের দায়ে কৃশ্চিয়ান হয়। আমাদের সহানুভূতি পায় না বলে। আমরা দিনরাত কেবল তাদের বল্‌ছি—'ছুঁস্‌নে' 'ছুঁস্‌নে'। দেশে কি আর দয়া ধর্ম্ম আছেরে বাপ! কেবল ছুঁৎমার্গীর দল! অমন আচারের মুখে মার্ ঝাঁটা—মার্ লাথি! ইচ্ছা হয়—তোর ছুঁৎমার্গের গণ্ডি ভেঙ্গে ফেলে এখনি যাই—'কে কোথায় পতিত কাঙ্গাল দীন দরিদ্র আছিস্'—বলে, তাদের সকলকে ঠাকুরের নামে ডেকে নিয়ে আসি। এরা না উঠ্‌লে মা জাগ্‌বেন না। আমরা এদের অন্নবস্ত্রের সুবিধা যদি না কর্‌তে পার্‌লুম, তবে আর কি হল? হায়! এরা দুনিয়াদারী কিছু জানে না, তাই দিনরাত খেটেও অশন-বসনের সংস্থান কর্‌তে পার্‌ছে না। তোরা সকলে মিলে এদের চোখ খুলে দে—আমি দিব্য চোখে দেখ্‌ছি, এদের ও আমার ভিতর একই ব্রহ্ম—একই শক্তি রয়েছেন, কেবল বিকাশের তারতম্য মাত্র। সর্ব্বাঙ্গে, রক্তসঞ্চার না হলে, কোনও দেশ কোনও কালে কোথায় উঠেছে, দেখেছিস্? একটা অঙ্গ পড়ে গেলে, অন্য অঙ্গ সবল থাক্‌লেও, ঐ দেহ নিয়ে কোন বড় কাজ আর হবে না—ইহা নিশ্চিত জান্‌বি।"

শিষ্য। মহাশয়, এদেশের লোকের ভিতর এত বিভিন্ন ধর্ম্ম—বিভিন্ন ভাব—ইহাদের ভিতর সকলের মিল হওয়া যে বড় কঠিন ব্যাপার।

স্বামিজী। (সক্রোধে) কঠিন বলে কোন কাজটাকে মনে কর্‌লে হেথায় আর আসিস্ নি। ঠাকুরের ইচ্ছায় সব দিক্ সোজা হয়ে যায়। তোর কার্য্য হচ্ছে—দীন-দুঃখীর সেবা করা, জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে—তার ফল কি হবে না হবে, ভেবে তোর দরকার কি? তোর কাজ হচ্ছে, কার্য্য করে যাওয়া—পরে সব আপনি আপনি হয়ে যাবে। আমার কাজের ধারা হচ্ছে—গড়ে তোলা, যা আছে সেটাকে ভাঙ্গা নয়। জগতের ইতিহাস পড়ে ছাখ্, এক একজন মহাপুরুষ এক একটা সময়ে এক একটা দেশে যেন কেন্দ্রস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের ভাবে অভিভূত হয়ে শত সহস্র লোক জগতের হিত সাধন করে গেছে। তোরা সব বুদ্ধিমান্ ছেলে—হেথায় এতদিন আস্‌ছিস্—কি কর্‌লি বল্ দিকি? পরার্থে একটা জন্ম দিতে পার্‌লিনি? আবার জন্মে এসে তখন বেদান্ত ফেদান্ত পড়্‌বি। এবার পরসেবায় দেহটা দিয়ে যা—তবে জান্‌ব—আমার কাছে আসা সার্থক হয়েছে।

কথাগুলি বলিয়া, স্বামিজী এলো থেলো ভাবে বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকিলেন। কিছুক্ষণ বাদে বলিলেন, "আমি এত তপস্যা করে এই সার বুঝেছি যে, জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন; তা ছাড়া ঈশ্বর ফিশ্বর কিছুই আর নেই। 'জীবে দয়া করে যেই জন—সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'।"

বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। স্বামিজী দোতলায় উঠিলেন এবং বিছানায় শুইয়া শিষ্যকে বলিলেন, "পা দুটো একটু টিপে দে।" শিষ্য অদ্যকার কথাবার্ত্তায় ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া স্বয়ং অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না, এখন সাহস পাইয়া প্রফুল্লমনে স্বামিজীর পদসেবা করিতে বসিল। কিছুক্ষণ পরে স্বামিজী তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আজ যা বলেছি, সে সব কথা মনে গেঁথে রাখ্‌বি। ভুলিস্‌নি যেন।"

বিংশ বল্লী

স্থান—বেলুড় মঠ

বর্ষ—১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ (প্রারম্ভ)

বিষয়

বরাহনগর-মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যদিগের সাধন ভজন—মঠের প্রথমাবস্থা—স্বামিজীর জীবনের কয়েকটি দুঃখের দিন—সন্ন্যাসের কঠোর শাসন।

আজ শনিবার। শিষ্য সন্ধ্যার প্রাক্কালে মঠে আসিয়াছে। মঠে এখন সাধন, ভজন, জপ, তপস্যার খুব ঘটা। স্বামিজী আদেশ করিয়াছেন, কি ব্রহ্মচারী, কি সন্ন্যাসী, সকলকেই অতি প্রত্যূষে উঠিয়া ঠাকুরঘরে জপ ধ্যান করিতে হইবে। স্বামিজীর ত নিদ্রা এক প্রকার নাই বলিলেই চলে, রাত্রি তিনটা হইতে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিয়া থাকেন। একটা ঘণ্টা কেনা হইয়াছে—শেষ রাত্রে সকলের ঘুম ভাঙ্গাইতে ঐ ঘণ্টা মঠের প্রতি ঘরের নিকট সজোরে বাজান হয়।

শিষ্য মঠে আসিয়া স্বামিজীকে প্রণাম করিবামাত্র তিনি বলিলেন, "ওরে, মঠে এখন কেমন সাধন ভজন হচ্ছে ; সকলেই শেষ রাত্রে ও সন্ধ্যার সময় অনেকক্ষণ ধরে জপ ধ্যান করে। ঐ দেখ, ঘণ্টা আনা হয়েছে ;—ঐ দিয়ে সবার ঘুম ভাঙ্গান হয়। সকলকেই অরুণোদয়ের পূর্ব্বে ঘুম থেকে উঠ্‌তে হয়। ঠাকুর

বল্‌তেন, 'সকাল সন্ধ্যায় মন খুব সত্ত্বভাবাপন্ন থাকে, তখনই একমনে ধ্যান করতে হয়'।

"ঠাকুরের দেহ যাবার পর আমরা বরাহনগরের মঠে কত জপ ধ্যান করতুম তিনটার সময় সব সজাগ হতুম। শৌচান্তে কেহ চান্ করে, কেহ না করে, ঠাকুরঘরে গিয়ে বসে জপ-ধ্যানে ডুবে যেতুম। তখন আমাদের ভেতর কি বৈরাগ্যের ভাব! দুনিয়াটা আছে কি নেই, তার হুঁশই ছিল না। শশী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) চব্বিশ ঘণ্টা ঠাকুরের সেবা নিয়েই থাক্‌ত, ও বাড়ীর গিন্নীর মত ছিল। ভিক্ষাশিক্ষা করে ঠাকুরের ভোগ-রাগের ও আমাদের খাওয়ান দাওয়ানর যোগাড় ওই সব কর্‌ত। এমন দিনও গেছে, যখন সকাল থেকে বেলা ৪।৫টা পর্য্যন্ত জপ-ধ্যান চলেছে। শশী খাবার নিয়ে অনেকক্ষণ বসে থেকে শেষে কোনরূপে টেনে হিঁচড়ে আমাদের জপ-ধ্যান থেকে তুলে দিত। আহা! শশীর কি নিষ্ঠাই দেখেছি

শিষ্য। মহাশয়, মঠের খরচ তখন কি করিয়া চলিত?

স্বামিজী। কি করে চল্‌বে কিরে? আমরা ত সাধু সন্ন্যাসী লোক। ভিক্ষাশিক্ষা করে যা আস্‌ত, তাইতেই সব চলে যেত। আজ সুরেশবাবু, বলরামবাবু নেই; তারা দুজন থাক্‌লে এই মঠ দেখে কত আনন্দ কর্‌ত! সুরেশ বাবুর নাম শুনেছিস্ ত? তিনি এই মঠের এক রকম প্রতিষ্ঠাতা। তিনিই বরাহনগরের মঠের সব খরচ-পত্র বহন করতেন। ঐ সুরেশ মিত্তিরই আমাদের জন্য তখন বেশী ভাবত। তার ভক্তিবিশ্বাসের তুলনা হয় না।

শিষ্য। মহাশয়, শুনিয়াছি মৃত্যুকালে আপনারা তাঁহার সহিত বড় একটা দেখা করিতে যাইতেন না?

স্বামিজী। যেতে দিলে ত যাব? যাক্, সে অনেক কথা। তবে এইটে জেনে রাখ্‌বি, সংসারে তুই বাঁচিস্ কি মরিস্, তাতে তোর আত্মীয় পরিজনদের বড় একটা কিছু আসে যায় না। তুই যদি কিছু বিষয় আশয় রেখে যেতে পারিস্ ত তোর মরবার আগেই দেখ্‌তে পাবি, তা নিয়ে ঘরে লাঠালাঠি সুরু হয়েছে। তোর মৃত্যুশয্যায় সান্ত্বনা দেবার কেহ নেই—স্ত্রী-পুত্র পর্য্যন্ত নয়। এর নামই সংসার!

মঠের পূর্ব্বাবস্থা সম্বন্ধে স্বামিজী আবার বলিতে লাগিলেন,—"খরচ পত্রের অনটনের জন্য কখন কখন মঠ তুলে দিতে লাঠালাঠি কর্‌তুম্। শশীকে কিন্তু কিছুতেই ঐ বিষয়ে রাজী করাতে পারতুম্ না। শশীকে আমাদের মঠের central figure (কেন্দ্র-স্বরূপ) বলে জান্‌বি। এক একদিন মঠে এমন অভাব হয়েছে যে, কিছুই নেই। ভিক্ষা করে চাল আনা হল ত নুন নেই। এক একদিন শুধু নুন ভাত চলছে, তবু কারও ভ্রূক্ষেপ নেই; জপ-ধ্যানের প্রবল তোড়ে আমরা তখন সব ভাস্‌ছি। তেলাকুচো-পাতা সেদ্ধ, নুন ভাত, এই মাসাবধি চলেছে—আহা, সে সব কি দিনই গেছে! সে কঠোরতা দেখ্‌লে ভূত পালিয়ে যেত—মানুষের কথা কি? এ কথাটা কিন্তু ধ্রুব সত্য যে, তোর ভেতরে যদি বস্তু থাকে ত যত circumstances against (অবস্থা প্রতিকূল,) হবে, তত ভেতরের শক্তির উন্মেষ হবে। তবে এখন যে

মঠে খাট বিছানা, খাওয়া দাওয়ার সচ্ছল বন্দোবস্ত করেছি তার কারণ, আমরা যতটা সইতে পেরেছি, তত কি আর এখ যারা সন্ন্যাসী হতে আসছে, তারা পার্‌বে ? আমরা ঠাকুরে জীবন দেখেছি, তাই দুঃখ কষ্ট বড় একটা গ্রাহ্যের ভেতর আন্‌তু না। এখনকার ছেলেরা তত কঠোর করতে পার্‌বে না। তা একটু থাক্‌বার জায়গা ও একমুঠো অন্নের বন্দোবস্ত করা- মোটা ভাত মোটা কাপড় পেলে, ছেলেগুলো সাধন ভজনে ম দেবে ও জীবহিতকল্পে জীবনপাত কর্‌তে শিখ্‌বে।"

শিষ্য। মহাশয়, মঠের এ সব খাট বিছানা দেখিয়া বাহিরে লোক কত কি বলে।

স্বামিজী। বল্‌তে দে না। ঠাট্টা করেও ত এখানকার কথা একবার মনে আন্‌বে ? শত্রুভাবে শীগ্‌গীর মুক্তি হয়। ঠাকুর বল্‌তেন, 'লোক না পোক', এ কি বল্লে, ও কি বল্লে; তাই শুনে বুঝি চল্‌তে হবে ? ছিঃ ছিঃ !

শিষ্য। মহাশয়, আপনি কখন বলেন, "সব নারায়ণ, দীন-দুঃখী আমার নারায়ণ"; আবার কখন বলেন, "লোক না পোক", ইহার অর্থ বুঝিতে পারি না।

স্বামিজী। সকলেই যে নারায়ণ, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু সকল নারায়ণে ত criticise (নিন্দা) করে না ? কৈ, দীন-দুঃখীরা এসে মঠের খাট ফাট দেখে ত criticise (নিন্দা) করে না ? সৎকার্য্য করে যাব—যারা criticise করবে, তাদের দিকে দৃক্‌পাতও কর্‌ব না—এই senseএ (ভাবে) "লোক না পোক" কথা বলা হয়েছে। যার

ঐরূপ রোক্ আছে, তার সব হয়ে যায়, তবে কারও কারও বা একটু দেরীতে, এই যা তফাৎ। কিন্তু, হবেই হবে। আমাদের ঐরূপ রোক্ (জিদ্) ছিল, তাই একটু আধটু যা হয় হয়েছে। নতুবা কি সব দুঃখের দিনই না আমাদের গেছে! এক সময়ে না খেতে পেয়ে রাস্তার ধারে একটা বাড়ীর দাওয়ায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম, মাথার ওপর দিয়ে এক পস্‌লা বৃষ্টি হয়ে গেল তবে হুঁশ হয়েছিল! অন্য এক সময়ে সারাদিন না খেয়ে কলিকাতায় একাজ সেকাজ করে বেড়িয়ে রাত্রি ১০।১১ টার সময় মঠে গিয়ে তবে খেতে পেয়েছি—এমন এক দিন নয়!

কথাগুলি বলিয়া, স্বামিজী অন্যমনা হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। পরে আবার বলিতে লাগিলেন—

"ঠিক্ ঠিক্ সন্ন্যাস কি সহজে হয়রে? এমন কঠিন আশ্রম আর নেই। একটু বেচালে পা পড়্‌লে ত একবারে পাহাড় থেকে খড়ে পড়ল—হাত পা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। একদিন আমি আগ্রা থেকে বৃন্দাবন হেঁটে যাচ্ছি। একটা কাণাকড়িও সম্বল নেই। বৃন্দাবনের প্রায় ক্রোশাধিক দূরে আছি, রাস্তার ধারে একজন লোক বসে তামাক খাচ্ছে, দেখে বড়ই তামাক খেতে ইচ্ছে হল! লোকটাকে বল্‌লুম, "ওরে ছিলিম্‌টে দিবি?" সে যেন জড় সড় হয়ে বল্‌লে, "মহারাজ, হাম্ ভাঙ্গি (মেথর) হ্যায়।" সংস্কার কিনা?—শুনেই পেছিয়ে এসে, তামাক না খেয়ে পুনরায় পথ চলতে লাগ্‌লুম। খানিকটা গিয়েই মনে বিচার এল,—তাইত, সন্ন্যাস

নিয়েছি ; জাত কুল মান—সব ছেড়েছি, তবুও লোকটা মেথর বলাতে পেছিয়ে এলুম ! তার ছোঁয়া তামাক খেতে পারলুম না ! এই ভেবে প্রাণ অস্থির হয়ে উঠ্‌ল, তখন প্রায় একপো পথ এসেছি। আবার ফিরে গিয়ে সেই মেথরের কাছে এলুম ; দেখি তখনও লোকটা সেখানে বসে আছে। গিয়ে তাড়াতাড়ি বল্‌লুম, —"ওরে বাপ, এক ছিলিম তামাক সেজে নিয়ে আয়।" তার আপত্তি গ্রাহ্য কর্‌লুম না। বল্‌লুম, ছিলিমে তামাক দিতেই হবে। লোকটা কি করে ?—অবশেষে তামাক সেজে দিলে। তখন আনন্দে ধূমপান করে বৃন্দাবনে এলুম। সন্ন্যাস নিলে জাতি বর্ণের পারে চলে গেছি কি না, পরীক্ষা করে আপনাকে দেখ্‌তে হয়। ঠিক ঠিক সন্ন্যাস-ব্রত রক্ষা করা কত কঠিন, কথায় ও কাজে একচুল এদিক্ ওদিক্ হবার যো নেই।"

শিষ্য। মহাশয়, আপনি কখন গৃহীর আদর্শ এবং কখন ত্যাগীর আদর্শ আমাদিগের সম্মুখে ধারণ করেন, উহার কোন্‌টি আমাদিগের মত লোকের অবলম্বনীয় ?

স্বামিজী। সব শুনে যাবি ; তার পর যেটা ভাল লাগে, সেটা ধরে থাক্‌বি—Bull dog এর (ডাল কুত্তার) মত কাম্‌ড়ে ধরে পড়ে থাক্‌বি।

বলিতে বলিতে শিষ্য-সহ স্বামিজী নীচে নামিয়া আসিলেন এবং কখন মধ্যে মধ্যে "শিব শিব" বলিতে বলিতে, আবার কখন বা গুন্ গুন্ করিয়া "কখন কি রঙ্গে থাক মা, শ্যামা সুধাতরঙ্গিনী" ইত্যাদি গান করিতে করিতে পদচারণা করিতে লাগিলেন।

একবিংশ বল্লী

স্থান—বেলুড় মঠ

বর্ষ—১৯০২

বিষয়

বেলুড় মঠে ধ্যান-জপানুষ্ঠান—বিদ্যারূপিণী কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণে আত্মদর্শন—ধ্যানকালে একাগ্র হইবার উপায়—মনের সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প অবস্থা—কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণের উপায়—ভাব-সাধনার পথে বিপদ—কীর্ত্তনাদির পরে অনেকের পাশব-প্রবৃত্তির বৃদ্ধি কেন হয়—কিরূপে ধ্যানারম্ভ করিবে—ধ্যানাদির সহিত নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানের উপদেশ।

শিষ্য গত রাত্রে স্বামিজীর ঘরেই ঘুমাইয়াছে। রাত্রি ৪টার সময় স্বামিজী শিষ্যকে জাগাইয়া বলিলেন, "যা, ঘণ্টা নিয়ে সব সাধু ব্রহ্মচারীদের জাগিয়ে তোল্।" শিষ্য আদেশমত প্রথমতঃ উপরকার সাধুদের কাছে ঘণ্টা বাজাইল। পরে তাঁহারা সজাগ হইয়াছেন দেখিয়া, নীচে যাইয়া ঘণ্টা বাজাইয়া সব সাধু ব্রহ্মচারী-দের তুলিল। সাধুরা তাড়াতাড়ি শৌচাদি সারিয়া, কেহ বা স্নান করিয়া, কেহ কাপড় ছাড়িয়া, ঠাকুরঘরে জপ ধ্যান করিতে প্রবেশ করিলেন।

স্বামিজীর নির্দ্দেশমত স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাণের কাছে খুব জোরে জোরে ঘণ্টা বাজানয় তিনি বলিয়া উঠিলেন, "বাঙ্গালের জ্বালায় মঠে থাকা দায় হল।" শিষ্য স্বামিজীকে ঐ কথা বলায়, স্বামিজী খুব হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বেশ করেছিস্।"

অতঃপর স্বামিজীও হাতমুখ ধুইয়া শিষ্যসহ ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ-প্রমুখ সন্ন্যাসিগণ ঠাকুরঘরে ধ্যানে বসিয়াছেন। স্বামিজীর জন্য পৃথক্ আসন রাখা ছিল; তিনি তাহাতে উত্তরাস্যে উপবেশন করিয়া শিষ্যকে সম্মুখে একখানি আসন দেখাইয়া বলিলেন, "যা, ঐ আসনে বসে ধ্যান কর্।" ধ্যান করিতে বসিয়া প্রথমে কেহ মন্ত্রজপ, কেহ বা অন্তর্যোগমুখে শান্ত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। মঠের বায়ুমণ্ডল যেন স্তব্ধ হইয়া গেল! এখনও অরুণোদয় হয় নাই, আকাশে তারা জ্বলিতেছে।

স্বামিজী আসনে বসিবার অল্পক্ষণ পরেই একেবারে স্থির শান্ত নিস্পন্দ হইয়া সুমেরুবৎ অচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার শ্বাস অতি ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল। শিষ্য স্তম্ভিত হইয়া স্বামিজীর সেই নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় অবস্থান নির্নিমেষে দেখিতে লাগিল। যতক্ষণ না স্বামিজী উঠিবেন, ততক্ষণ কাহারও আসন ছাড়িয়া উঠিবার [illegible]দেশ নাই! সেজন্য কিছুক্ষণ পরে তাহার পায়ে ঝিন্‌ঝিনি ধরায় উঠিবার ইচ্ছা হইলেও, সে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

প্রায় দেড় ঘণ্টা বাদে স্বামিজী "শিব শিব" বলিয়া ধ্যানোত্থিত হইলেন। তাঁহার চক্ষু তখন অরুণ-রাগে রঞ্জিত, মুখ গম্ভীর, শান্ত, স্থির। ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া স্বামিজী নীচে নামিলেন এবং মঠপ্রাঙ্গণে পদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে শিষ্যকে বলিলেন, "দেখ্‌লি—সাধুরা আজকাল কেমন জপ ধ্যান করে? ধ্যান গভীর হলে, কত কি দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

বরাহনগরের মঠে ধ্যান করতে করতে একদিন ঈড়া পিঙ্গলা নাড়ী দেখতে পেয়েছিলুম। একটু চেষ্টা কর্‌লেই দেখতে পাওয়া যায়। তারপর সুষুম্নার দর্শন পেলে, যা দেখতে চাইবি তাই দেখতে পাওয়া যায়। দৃঢ়া গুরুভক্তি থাক্‌লে, সাধন, ভজন, ধ্যান, জপ সব আপনা আপনি আসে, চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। "গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।"

অনন্তর শিষ্য তামাক সাজিয়া স্বামিজীর কাছে পুনরায় আসিলে তিনি ধূমপান করিতে করিতে বলিলেন, "ভিতরে নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মারূপ সিঙ্গি (সিংহ) রয়েছেন, ধ্যান-ধারণা করে তাঁর দর্শন পেলেই মায়ার দুনিয়া উড়ে যায়। সকলের ভেতরেই তিনি সমভাবে আছেন ; যে যত সাধন ভজন করে, তার ভেতর কুণ্ডলিনী শক্তি তত শীঘ্র জেগে ওঠেন। ঐ শক্তি মস্তকে উঠ্‌লেই দৃষ্টি খুলে যায়—আত্মদর্শন লাভ হয়।"

শিষ্য। মহাশয়, শাস্ত্রে ঐ সব কথা পড়িয়াছি মাত্র। প্রত্যক্ষ কিছুই ত এখনও হইল না।

স্বামিজী। 'কালেনাত্মনি বিন্দতি'—সময়ে হতেই হবে। তবে কারও শীগ্‌গীর, কারও বা একটু দেরীতে হয়। লেগে থাক্‌তে হয়—নাছোড়বান্দা হয়ে। এর নাম যথার্থ পুরুষকার। তৈলধারার মত মনটা এক বিষয়ে লাগিয়ে রাখ্‌তে হয়। জীবের মন নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, ধ্যানের সময়ও প্রথম প্রথম মন বিক্ষিপ্ত হয়। মনে যা ইচ্ছে উঠুক না কেন, কি কি ভাব উঠ্‌ছে, সে গুলি তখন স্থির হয়ে বসে দেখ্‌তে হয়। ঐরূপে দেখ্‌তে

দেখ্‌তেই মন স্থির হয়ে যায়, আর মনে নানা চিন্তাতর থাকে না। ঐ তরঙ্গগুলোই হচ্ছে—মনের সঙ্কল্পবৃত্তি ইতিপূর্ব্বে যে সকল বিষয় তীব্রভাবে ভেবেছিস্, তা একটা মানসিক প্রবাহ থাকে, ধ্যানকালে ঐগুলি তা মনে ওঠে। সাধকের মন যে ক্রমে স্থির হবার দিে যাচ্ছে, ঐগুলি ওঠা বা ধ্যানকালে মনে পড়াই তা প্রমাণ। মন কখন কখন কোন ভাব নিয়ে একবৃত্তি হয়—উহারই নাম সবিকল্প ধ্যান। আর মন যখন সর্ব্ববৃত্তিশূন্য হয়ে আসে—তখন নিরাধার এক অখণ্ড বোধস্বরূপ প্রত্যক্ চৈতন্যে গলে যায়। উহার নামই বৃত্তিশূন্য নির্ব্বিকল্প সমাধি। আমরা ঠাকুরের মধ্যে এ উভয় সমাধি মুহুর্মুহুঃ প্রত্যক্ষ করেছি। চেষ্টা করে তাঁকে ঐ সকল অবস্থা আন্‌তে হত না। আপনা আপনি সহসা হয়ে যেত। সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার! তাঁকে দেখে ত এসব ঠিক বুঝতে পেরেছি । প্রত্যহ একাকী ধ্যান কর্‌বি। সব আপনা আপনি খুলে যাবে। বিদ্যা-রূপিণী মহামায়া ভিতরে ঘুমিয়ে রয়েছেন, তাই সব জান্‌তে পাচ্ছিস্ না। ঐ কুলকুণ্ডলিনীই হচ্ছেন তিনি। ধ্যান কর্‌বার পূর্ব্বে যখন নাড়ীশুদ্ধ কর্‌বি, তখন মনে মনে মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনীকে জোরে জোরে আঘাত কর্‌বি আর বল্‌বি, "জাগ মা", "জাগ মা"! ধীরে ধীরে এ সব অভ্যাস করতে হয়। Emotional sideটে (ভাব-প্রবণতা) ধ্যানের কালে একেবারে দাবিয়ে দিবি। ঐটের

বড় ভয়। যারা বড় emotional (ভাবপ্রবণ), তাদের কুণ্ডলিনী ফড়্ ফড়্ করে ওপরে ওঠে বটে, কিন্তু উঠ্‌তেও যতক্ষণ নাব্‌তেও ততক্ষণ। যখন নাবেন, তখন একেবারে সাধককে অধঃপাতে নিয়ে গিয়ে ছাড়েন। এজন্য ভাব-সাধনার সহায় কীর্ত্তন ফীর্ত্তনের একটা ভয়ানক দোষ আছে। নেচে কুঁদে সাময়িক উচ্ছ্বাসে ঐ শক্তির উর্দ্ধগতি হয় বটে—কিন্তু স্থায়ী হয় না, নিম্ন-গামিনী হবার কালে জীবের ভয়ানক কামবৃত্তির আধিক্য হয়। আমার আমেরিকার বক্তৃতা শুনে সাময়িক উচ্ছ্বাসে মাগী-মিন্‌সেগুলোর মধ্যে অনেকের ভাব হত—কেউ বা জড়বৎ হয়ে যেত। আমি অনুসন্ধানে পরে জান্‌তে পেরেছিলাম, ঐ অবস্থার পরই অনেকের কাম-প্রবৃত্তির আধিক্য হত। স্থির ধ্যান ধারণার অনভ্যাসেই ওরূপ হয়।

শিষ্য। মহাশয়, এ সকল গুহ্য সাধন-রহস্য কোন শাস্ত্রে পড়ি নাই। আজ নূতন কথা শুনিলাম।

স্বামিজী। সব সাধন-রহস্য কি আর শাস্ত্রে আছে ?—এগুলি গুরু-শিষ্য পরম্পরায় গুপ্তভাবে চলে আস্‌ছে। খুব সাব-ধানে ধ্যান ধারণা কর্‌বি। সাম্‌নে সুগন্ধি ফুল রাখ্‌বি, ধুনা জ্বাল্‌বি। যাতে মন পবিত্র হয়, প্রথমতঃ তাই কর্‌বি। গুরু ইষ্টের নাম কর্‌তে কর্‌তে বল্‌বি—জীব জগৎ সকলের মঙ্গল হোক ! উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম অধঃ উর্দ্ধ সব দিকেই শুভ সঙ্কল্পের চিন্তা ছড়িয়ে তবে

স্ব

[illegible] ঐরূপ প্রথম প্রথম করতে হয়। তার [illegible] কোন মুখে বললেই হল) [illegible] সেইরূপ ধ্যান করবি [illegible] ঝঞ্ঝাট থাকে ত [illegible] একটা নিষ্ঠা না [illegible]?

এইবার স্বামিজী উপরে যাইতে যাইতে বলিতে লাগিলেন—“তোদের অল্পেই আত্মদৃষ্টি খুলে যাবে। যখন হেথায় এসে পড়েছিস, তখন মুক্তি ফুক্তি ত তোদের করতলে। এখন ধ্যানাদি করা ছাড়া আর্ত্তনাদপূর্ণ সংসারের দুঃখও কিছু দূর করতে বদ্ধপরিকর হয়ে লেগে যা দেখি। কঠোর সাধনা করে এ দেহ পাত করে ফেলেছি। এই হাড় মাংসের খাঁচায় আর [illegible]ন কিছু নেই। তোরা এখন কাজে লেগে যা, আমি একটু [illegible]ই। আর কিছু না পারিস্, এই সব যত শাস্ত্র ফাস্ত্র পড়্লি, [illegible] কথা জীবকে শোনাগে। এর চেয়ে আর দান নেই। জ্ঞান-দানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।”

দ্বাবিংশ বল্লী

স্থান—বেলুড় মঠ

বর্ষ—১৯০২

বিষয়

মঠে কঠোর বিধি-নিয়মের প্রচলন—"আত্মারামের কৌটা" ও উহার শক্তি পরীক্ষা—স্বামিজীর মহত্ত্ব সম্বন্ধে শিষ্যের প্রেমানন্দ স্বামীর সহিত কথোপকথন—পূর্ব্ববঙ্গে অদ্বৈতবাদ বিস্তার করিতে স্বামিজীর শিষ্যকে উৎসাহিত করা, এবং বিবাহিত হইলেও ধর্ম্মলাভ হইবে বলিয়া তাহাকে অভয়দান—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যবর্গ সম্বন্ধে স্বামিজীর বিশ্বাস—নাগ মহাশয়ের সিদ্ধ-সঙ্কল্পত্ব।

স্বামিজী মঠেই অবস্থান করিতেছেন। শাস্ত্রালোচনার জন্য মঠে প্রতিদিন প্রশ্নোত্তর ক্লাস হইতেছে। স্বামী শুদ্ধানন্দ, বিরজানন্দ ও স্বরূপানন্দ এই ক্লাসের ভিতর প্রধান জিজ্ঞাসু। ঐরূপে শাস্ত্রালোচনাকে স্বামিজী "চর্চ্চা" শব্দে নির্দ্দেশ করিতেন এবং "চর্চ্চা" করিতে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণকে সর্ব্বদা বহুধা উৎসাহিত করিতেন। কোন দিন গীতা, কোন দিন ভাগবৎ, কোন দিন বা উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের আলোচনা হইতেছে। স্বামিজীও প্রায় নিত্যই তথায় উপস্থিত থাকিয়া প্রশ্ন সকলের মীমাংসা করিয়া দিতেছেন। স্বামিজীর আদেশে একদিকে যেমন কঠোর নিয়মপূর্ব্বক ধ্যান-ধারণা চলিয়াছে, অপর দিকে তেমনি শাস্ত্রালোচনার জন্য ঐ ক্লাসের প্রাত্যহিক অধিবেশন হইতেছে। তাঁহার শাসন সর্ব্বথা শিরোধার্য্য করিয়া সকলেই তৎপ্রবর্ত্তিত

নিয়ম অনুসরণ করিয়া চলিতেন। মঠবাসিগণের আহার, শয়ন, পাঠ, ধ্যান—সকলই এখন কঠোর-নিয়মবদ্ধ। কাহারও কোন দিন ঐ নিয়মের একটু এদিক্ ওদিক্ হইলে, নীতিমর্য্যাদাভঙ্গের জন্য সেদিন তাহাকে মঠে ভিক্ষা দেওয়া বন্ধ হইয়া যায়। তাহাকে সেদিন পল্লী হইতে নিজে ভিক্ষা করিয়া আনিতে হয় এবং ঐ ভিক্ষান্ন মঠভূমিতে নিজেই রন্ধন করিয়া খাইতে হয়। আবার সংঘগঠনকল্পে স্বামিজীর দূরদৃষ্টি কেবলমাত্র মঠবাসিগণের জন্য কতকগুলি দৈনিক নিয়ম করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে অনুষ্ঠেয় মঠের রীতিনীতি ও কার্য্যপ্রণালীর সম্যগালোচনা করিয়া তৎসম্বন্ধে বিস্তারিত অনুশাসন সকলও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উহার পাণ্ডুলিপি অদ্যাপি বেলুড় মঠে সযত্নে রক্ষিত আছে।

প্রত্যহ স্নানান্তে স্বামিজী ঠাকুরঘরে যান, ঠাকুরের চরণামৃত পান করেন, শ্রীপাদুকা মস্তকে স্পর্শ করেন এবং ঠাকুরের ভস্মাস্থিসম্পুটীত কৌটার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন। এই কৌটাকে তিনি "আত্মারামের কৌটা" বলিয়া অনেক সময় নির্দ্দেশ করিতেন। এই সময়ের অল্পদিন পূর্ব্বে ঐ "আত্মারামের কৌটা"কে লইয়া এক বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হয়। একদিন স্বামিজী উহা মস্তকে স্পর্শ করিয়া ঠাকুরঘর হইতে বাহির হইতেছেন —এমন সময় সহসা তাঁহার মনে হইল, 'সত্যই কি ইহাতে আত্মারাম ঠাকুরের আবেশ রহিয়াছে? দেখিব পরীক্ষা করিয়া'— ভাবিয়া মনে মনে প্রার্থনা করিলেন, "ঠাকুর! যদি তুমি রাজধানীতে উপস্থিত অমুক মহারাজকে মঠে তিন দিনের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া লইয়া আইস, তবে বুঝিব, তুমি সত্যসত্যই এখানে

আছ।" মনে মনে ঐরূপ বলিয়া, তিনি ঠাকুরঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং ঐ বিষয়ে কাহাকেও কিছু বলিলেন না; কিছুক্ষণ পরে ঐ কথা একেবারে ভুলিয়া গেলেন। পরদিন তিনি কার্য্যান্তরে কয়েক ঘণ্টার জন্য কলিকাতায় যাইলেন। অপরাহ্ণে মঠে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন, সত্যসত্যই ঐ মহারাজা মঠের নিকটবর্ত্তী ট্রাঙ্ক্ রোড্ দিয়া যাইতে যাইতে পথে গাড়ী থামাইয়া, স্বামিজীর অন্বেষণে মঠে লোক পাঠাইয়াছিলেন এবং তিনি মঠে উপস্থিত নাই শুনিয়া, মঠ-দর্শনে অগ্রসর হন নাই। সংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র স্বামিজীর নিজ সঙ্কল্পের কথা মনে উদয় হইল এবং বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে নিজ গুরুভ্রাতৃগণের নিকট ঐ বিষয় জ্ঞাপন করিয়া তিনি "আত্মারামের কৌটা"কে বিশেষ সন্তর্পণে পূজা করিতে তাঁহাদিগকে আদেশ করিলেন।

আজ শনিবার। শিষ্য বৈকালে মঠে আসিয়াই স্বামিজীর ঐ সিদ্ধসঙ্কল্পের বিষয় অবগত হইয়াছে। স্বামিজীকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিবামাত্র সে জানিতে পারিল, তিনি তখনই বেড়াইতে বাহির হইবেন, স্বামী প্রেমানন্দকে সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিয়াছেন। শিষ্যের একান্ত বাসনা, স্বামিজীর সঙ্গে যায় —কিন্তু অনুমতি না পাইলে যাওয়া কর্ত্তব্য নহে ভাবিয়া বসিয়া রহিল। স্বামিজী আলখাল্লা ও গৈরিক বসনের কানঢাকা টুপী পরিয়া, একগাছি মোটা লাঠি হাতে করিয়া বাহির হইলেন— পশ্চাতে স্বামী প্রেমানন্দ। যাইবার পূর্ব্বে শিষ্যের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "চল—যাবি?" শিষ্য কৃতকৃতার্থ হইয়া স্বামী প্রেমানন্দের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।

কি ভাবিতে ভাবিতে স্বামিজী অন্যমনে পথ চলিতে লাগিলেন। ক্রমে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক্ রোড্ ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শিষ্য স্বামিজীর ঐরূপ ভাব দেখিয়া, কথা কহিয়া তাঁহার চিন্তা ভঙ্গ করিতে সাহসী না হইয়া, প্রেমানন্দ মহারাজের সহিত নানা গল্প করিতে করিতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মহাশয়, ঠাকুর—স্বামিজীর মহত্ত্ব সম্বন্ধে আপনাদের কি বলিতেন, তাহাই বলুন।" (স্বামিজী তখন কিঞ্চিৎ অগ্রবর্ত্তী হইয়াছেন।)

স্বামী প্রেমানন্দ। কত কি বল্‌তেন তা তোকে একদিনে কি বল্‌ব? কখনও বল্‌তেন, "নরেন অখণ্ডের ঘর থেকে এসেছে।" কখনও বল্‌তেন, "ও আমার শ্বশুর ঘর।" আবার কখনও বল্‌তেন, "এমনটি জগতে কখনও আসে নাই—আস্‌বে না।" একদিন বলেছিলেন, "মহামায়া ওর কাছে যেতে ভয় পায়!" বাস্তবিকই উনি তখন কোন ঠাকুর দেবতার কাছে মাথা নোয়াতেন না। ঠাকুর একদিন সন্দেশের ভিতরে করে উঁহাকে জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ খাইয়ে দিয়েছিলেন। পরে ঠাকুরের কৃপায় সব দেখে শুনে ক্রমে ক্রমে উনি সব মানলেন।

শিষ্য। আমার সঙ্গে নিত্য কত হাস্য পরিহাস করেন। এখন কিন্তু এমন গম্ভীর হইয়া রহিয়াছেন যে কথা কহিতে ভয় হইতেছে।

প্রেমানন্দ। কি জানিস্?—মহাপুরুষেরা কখন কি ভাবে থাকেন —তা আমাদের মনবুদ্ধির অগোচর। ঠাকুরের

জীবৎকালে দেখেছি, নরেনকে দূরে দেখে তিনি সমাধিস্থ হয়ে পড়তেন; যাদের ছোঁয়া জিনিষ খাওয়া উচিত নয় বলে অন্য সকলকে খেতে নিষেধ করতেন, নরেন তাদের ছোঁয়া খেলেও কিছু বল্‌তেন না। কখনও বল্‌তেন, "মা, ওর অদ্বৈতজ্ঞান চাপা দিয়ে রাখ—আমার ঢের কাজ আছে।" এসব কথা কেই বা বুঝবে—আর কাকেই বা বল্‌ব?

শিষ্য। মহাশয়, বাস্তবিকই কখন কখন মনে হয়, উনি মানুষ নহেন। কিন্তু—আবার কথাবার্ত্তা, যুক্তি-বিচার করিবার কালে মানুষ বলিয়া বোধ হয়। এমনি মনে হয়, যেন কোন আবরণ দিয়ে সে সময় উনি আপনার যথার্থ স্বরূপ বুঝিতে দেন না।

প্রেমানন্দ। ঠাকুর বল্‌তেন, "ও যখনি জান্‌তে পারবে—ও কে, তখনি আর এখানে থাক্‌বে না, চলে যাবে।" তাই কাজকর্ম্মের ভেতরে নরেনের মনটা থাক্‌লে, আমরা নিশ্চিন্ত থাকি। ওকে বেশী ধ্যান ধারণা কর্‌তে দেখ্‌লে আমাদের ভয় হয়।

এইবার স্বামিজী মঠাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইতে লাগিলেন। ঐ সময়ে স্বামী প্রেমানন্দ ও শিষ্যকে নিকটে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "কিরে তোদের কি কথা হচ্ছিল?" শিষ্য বলিল, "এই সব ঠাকুরের সম্বন্ধীয় নানা কথা হইতেছিল।" উত্তর শুনিয়াই স্বামিজী আবার অন্যমনে পথ চলিতে চলিতে মঠে ফিরিয়া আসিলেন এবং মঠের আমগাছের তলায় যে ক্যাম্পখাটখানি

কালে আরও কত আস্‌বে। ঠাকুর বল্‌তেন, “যে একদিনের জন্যও অকপট মনে ঈশ্বরকে ডেকেছে তাকে এখানে আস্‌তেই হবে।” যারা সব এখানে রয়েছে, তারা এক একজন মহাসিংহ; আমার কাছে কুঁচ্‌কে থাকে বলে এদের সামান্য মানুষ বলে মনে করিস্‌ নি। এরাই আবার যখন বাহির হবে তখন এদের দেখে লোকের চৈতন্য হবে। অনন্ত-ভাবময় ঠাকুরের শরীরের অংশ বলে এদের জান্‌বি। আমি এদের ঐ ভাবে দেখি। ঐ যে রাখাল রয়েছে, ওর মত Spirituality (ধর্ম্মভাব) আমারও নেই। ঠাকুর ছেলে বলে ওকে কোলে কর্‌তেন, খাওয়াতেন—একত্র শয়ন কর্‌তেন। ও আমাদের মঠের শোভা—আমাদের রাজা। ঐ বাবুরাম, হরি, সারদা, গঙ্গাধর, শরৎ, শশী, সুবোধ প্রভৃতির ম ঈশ্বরবিশ্বাসী দুনিয়া ঘুরে দেখ্‌তে পাবি কি না সন্দেহ। এরা প্রত্যেকে ধর্ম্মশক্তির এক একটা কেন্দ্রের মত। কালে ওদেরও সব শক্তির বিকাশ হবে।

শিষ্য অবাক্ হইয়া শুনিতে লাগিল; স্বামিজী আবার বলিলেন, “তোদের দেশ থেকে নাগ মশায় ছাড়া কিন্তু আর কেউ এল না। আর দু একজন যারা ঠাকুরকে দেখেছিল—তারা তাঁকে ধরতে পাল্লে না।” নাগ মহাশয়ের কথা স্মরণ করিয়া স্বামিজী কিছুক্ষণের জন্য স্থির হইয়া রহিলেন। স্বামিজী শুনিয়াছিলেন, এক সময়ে নাগ মহাশয়ের বাড়ীতে গঙ্গার উৎস

উঠিয়াছিল। সেই কথাটি স্মরণ করিয়া শিষ্যকে বলিলেন, "হাঁরে, ঐ ঘটনাটা কিরূপ বল্ দিকি ?"

শিষ্য। আমিও ঐ ঘটনা শুনিয়াছি মাত্র—চক্ষে দেখি নাই। শুনিয়াছি, একবার মহাবারুণী যোগে পিতাকে সঙ্গে করিয়া নাগ মহাশয় কলিকাতা আসিবার জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু লোকের ভিড়ে গাড়ী না পাইয়া তিন চার দিন নারায়ণগঞ্জে থাকিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন। অগত্যা নাগ মহাশয় কলিকাতা যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করেন ও পিতাকে বলেন, "মন শুদ্ধ হলে মা গঙ্গা এখানেই আস্‌বেন।" পরে যোগের সময় বাড়ীর উঠানের মাটি ভেদ করিয়া এক জলের উৎস উঠিয়াছিল,—এইরূপ শুনিয়াছি। যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকে এখনও জীবিত আছেন। আমার তাঁহার সঙ্গলাভের বহু পূর্ব্বে ঐ ঘটনা ঘটিয়াছিল।

স্বামিজী। তার আর আশ্চর্য্য কি ? তিনি সিদ্ধসঙ্কল্প মহাপুরুষ; তাঁর জন্য ঐরূপ হওয়া আমি কিছু আশ্চর্য্য মনে করি না।

বলিতে বলিতে স্বামিজী পাশ ফিরিয়া শুইয়া একটু তন্দ্রাবিষ্ট হইলেন।

তদ্দর্শনে শিষ্য প্রসাদ পাইতে উঠিয়া গেল।

ত্রয়োবিংশ বল্লী

স্থান—কলিকাতা হইতে মঠে নৌকাযোগে

বর্ষ—১৯০২

বিষয়

স্বামিজীর নিরভিমানিতা—কামকাঞ্চনের সেবা ত্যাগ না করিলে ঠাকুরকে ঠিকঠিক বুঝা অসম্ভব—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ ভক্ত কাহারা—সর্ব্ব-ত্যাগী সন্ন্যাসী ভক্তেরাই সর্ব্বকাল জগতে অবতার মহাপুরুষদিগের ভাব প্রচার করিয়াছেন—গৃহী ভক্তেরা ঠাকুরের সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহাও আংশিক ভাবে সত্য—মহান্ ঠাকুরের একবিন্দু ভাব ধারণ করিতে পারিলে মানুষ ধন্য হয়—সন্ন্যাসী ভক্তদিগকে ঠাকুরের বিশেষভাবে উপদেশ দান—কালে সমগ্র পৃথিবী ঠাকুরের উদারভাব গ্রহণ করিবে—ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত সাধুদের সেবা বন্দনা মানবের কল্যাণকর।

শিষ্য আজ বৈকালে কলিকাতার গঙ্গাতীরে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিতে পাইল, কিছুদূরে একজন সন্ন্যাসী আহীরি-টোলার ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি নিকটস্থ হইলে শিষ্য দেখিল, সাধু আর কেহ নন—তাহারই গুরু, স্বামী শ্রীবিবেকানন্দ।—স্বামিজীর বামহস্তে শালপাতার ঠোঙ্গায় চানাচুর ভাজা; বালকের মত উহা খাইতে খাইতে তিনি আনন্দে পথে অগ্রসর হইতেছেন। ভুবনবিখ্যাত স্বামিজীকে ঐরূপে পথে চানাচুর ভাজা খাইতে খাইতে আগমন করিতে দেখিয়া, শিষ্য অবাক্ হইয়া তাঁহার নিরভিমানিতার কথা ভাবিতে লাগিল।

পরে তিনি সম্মুখস্থ হইলে, শিষ্য তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া তাঁহার হঠাৎ কলিকাতা আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

স্বামিজী। একটা দরকারে এসেছিলুম। চল্, তুই মঠে যাবি ? চারটি চানাচুর ভাজা খা না ? বেশ মুন ঝাল আছে।

শিষ্য হাসিতে হাসিতে প্রসাদ গ্রহণ করিল ও মঠে যাইতে স্বীকৃত হইল।

স্বামিজী। তবে একখানা নৌকা ছ্যাখ্।

শিষ্য দৌড়িয়া নৌকা ভাড়া করিতে ছুটিল। ভাড়া লইয়া মাঝিদের সহিত দর দস্তর চলিতেছে, এমন সময় স্বামিজীও তথায় আসিয়া পড়িলেন। মাঝি মঠে পৌছাইয়া দিতে আট আনা চাহিল। শিষ্য দুই আনা বলিল। "ওদের সঙ্গে আবার কি দর দস্তর কচ্ছিস্ ?" বলিয়া স্বামিজী শিষ্যকে নিরস্ত করিলেন এবং মাঝিকে "যাঃ, আট আনাই দিব"—বলিয়া নৌকায় উঠিলেন। ভাটার প্রবল টানে নৌকা অতি ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং মঠে পৌছিতে প্রায় দেড় ঘণ্টা লাগিল। নৌকামধ্যে স্বামিজীকে একাকী পাইয়া, শিষ্য তাঁহাকে নিঃসঙ্কোচে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার বেশ সুযোগ লাভ করিল। এই বৎসরের (১৩০৯) ২০শে আষাঢ়েই স্বামিজী স্বরূপ সংবরণ করেন। ঐ দিনে গঙ্গাবক্ষে স্বামিজীর সহিত শিষ্যের যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাই অগ্র পাঠকগণকে উপহার দেওয়া যাইতেছে।

ঠাকুরের বিগত জন্মোৎসবে শিষ্য তাঁহার ভক্তদিগের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া যে স্তব ছাপাইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে প্রসঙ্গ উঠাইয়া স্বামিজী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই তোর রচিত স্তবে

যাদের যাদের নাম করেছিস্, কি করে জান্‌লি তাঁরা সকলেই ঠাকুরের সাঙ্গোপাঙ্গ ?

শিষ্য। মহাশয়, ঠাকুরের সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তদিগের নিকট এতদিন যাতায়াত করিতেছি ; তাঁহাদেরই মুখে শুনিয়াছি ইঁহারা সকলেই ঠাকুরের ভক্ত।

স্বামিজী। ঠাকুরের ভক্ত হতে পারে, কিন্তু সকল ভক্তেরা ত তাঁর (ঠাকুরের) সাঙ্গোপাঙ্গের ভেতর নয় ? ঠাকুর কাশীপুরের বাগানে আমাদের বলেছিলেন, "মা দেখাইয়া দিলেন, এরা সকলেই এখানকার (আমার) অন্তরঙ্গ লোক নয়।" স্ত্রী ও পুরুষ উভয় ভক্তদের সম্বন্ধেই ঠাকুর সেদিন ঐরূপ বলেছিলেন।

অনন্তর ঠাকুর নিজ ভক্তদিগের মধ্যে যে ভাবে উচ্চাবচ শ্রেণী নির্দ্দেশ করিতেন, সেই কথা বলিতে বলিতে স্বামিজী ক্রমে গৃহস্থ ও সন্ন্যাস-জীবনের মধ্যে যে কতদূর প্রভেদ বর্ত্তমান তাহাই শিষ্যকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন।

স্বামিজী। কামিনী-কাঞ্চনের সেবাও কর্‌বে—আর ঠাকুরকেও বুঝবে—এ কি কখনও হয়েছে ?—না, হতে পারে ? ও কথা কখনও বিশ্বাস কর্‌বিনি। ঠাকুরের ভক্তদের ভেতর অনেকে এখন "ঈশ্বরকোটি" "অন্তরঙ্গ" ইত্যাদি বলে আপনাদের প্রচার কর্‌ছে। তাঁর ত্যাগ বৈরাগ্য কিছুই নিতে পাল্লে না, অথচ বলে কিনা তারা সব ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্ত। ওসব কথা ঝেঁটিয়ে ফেলে দিবি। যিনি ত্যাগীর "বাদসা", তাঁর কৃপা পেয়ে কি কেউ

কখন কাম-কাঞ্চনের সেবায় জীবন যাপন কর্‌তে পারে ?

শিষ্য। তবে কি মহাশয়, যাঁহারা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ঠাকুরের ভক্ত নন ?

স্বামিজী। তা কে বল্‌ছে ? সকলেই ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করে Spiritualityর (ধর্ম্মানুভূতির) দিকে অগ্রসর হয়েছে, হচ্ছে ও হবে। তারা সকলেই ঠাকুরের ভক্ত। তবে কি জানিস্‌?—সকলেই কিন্তু তাঁর অন্তরঙ্গ নয়। // ঠাকুর বল্‌তেন, "অবতারের সঙ্গে কল্পান্তরের সিদ্ধ ঋষিরা দেহ ধারণ করে জগতে আগমন করেন। তাঁরাই ভগবানের সাক্ষাৎ পার্ষদ। তাঁদের দ্বারাই ভগবান্‌ কার্য্য করেন বা জগতে ধর্ম্মভাব প্রচার করেন।" এটা জেনে রাখ্‌বি—অবতারের সাঙ্গোপাঙ্গ একমাত্র তাঁরাই যাঁরা পরার্থে সর্ব্বত্যাগী—যাঁরা ভোগসুখ কাকবিষ্ঠার ন্যায় পরিত্যাগ করে "জগদ্ধিতায়" "জীবহিতায়" জীবনপাত করেন। // ভগবান্‌ ঈশার শিষ্যেরা সকলেই সন্ন্যাসী। শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীচৈতন্য ও বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ কৃপাপ্রাপ্ত সঙ্গীরা সকলেই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী। এই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীরাই গুরুপরম্পরাক্রমে জগতে ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার করে আস্‌ছেন। কোথায়, কবে শুনেছিস্‌—কামকাঞ্চনের দাস হয়ে থেকে মানুষ, মানুষকে উদ্ধার করতে বা ঈশ্বর লাভের পথ দেখিয়ে দিতে পেরেছে ? আপনি মুক্ত না

হলে অপরকে কি করে মুক্ত কর্‌বে? বেদ বেদান্ত ইতিহাস পুরাণ সর্ব্বত্র দেখ্‌তে পাবি—সন্ন্যাসীরাই সর্ব্ব-কালে সর্ব্বদেশে লোকগুরুরূপে ধর্ম্মের উপদেষ্টা হয়েছেন। History repeats itself—যথা পূর্ব্বং তথা পরম্—এবারও তাই হবে। মহাসমন্বয়াচার্য্য ঠাকুরের কৃতী সন্ন্যাসী সন্তানগণই লোকগুরুরূপে জগতের সর্ব্বত্র পূজিত হচ্ছে ও হবে। ত্যাগী ভিন্ন অন্যের কথা ফাঁকা আওয়াজের মত শূন্যে লয় হয়ে যাবে। মঠের যথার্থ ত্যাগী সন্ন্যাসিগণই ধর্ম্মভাব রক্ষা ও প্রচারের মহাকেন্দ্র-স্বরূপ হবে। বুঝ্‌লি?

শিষ্য। তবে ঠাকুরের গৃহস্থ ভক্তেরা যে তাঁহার কথা নানাভাবে প্রচার করিতেছেন, সে সব কি সত্য নয়?

স্বামিজী। একেবারে সত্য নয় বলা যায় না; তবে, তারা ঠাকুরের সম্বন্ধে যা বলে, তা সব partial truth (আংশিক সত্য)। যে যেমন আধার, সে ঠাকুরের ততটুকু নিয়ে তাই আলোচনা কর্‌ছে। ঐরূপ করাটা মন্দ নয়। তবে তাঁর ভক্তের মধ্যে এরূপ যদি কেহ বুঝে থাকেন যে, তিনি যা বুঝেছেন বা বল্‌ছেন, তাই একমাত্র সত্য, তবে তিনি দয়ার পাত্র। ঠাকুরকে কেহ বল্‌ছেন—তান্ত্রিক কৌল, কেহ বল্‌ছেন—চৈতন্যদেব 'নারদীয় ভক্তি' প্রচার করতে জন্মেছিলেন, কেহ বল্‌ছেন—সাধন ভজন করাটা ঠাকুরের অবতারত্বে বিশ্বাসের বিরুদ্ধ, কেহ বল্‌ছেন—সন্ন্যাসী হওয়া ঠাকুরের অভিমত

নয়, ইত্যাদি কত কথা গৃহী ভক্তদের মুখে শুন্‌বি—ও সব কথায় কান দিবিনি। তিনি যে কি—কত কত পূর্ব্বগ-অবতারগণের জমাটবাঁধা ভাবরাজ্যের রাজা, তা জীবনপাতী তপস্যা করেও একচুল বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। তাই তাঁর কথা সংযত হয়ে বল্‌তে হয়। যে যেমন আধার, তাঁকে তিনি ততটুকু দিয়ে ভরপুর করে গেছেন। তাঁর ভাবসমুদ্রের উচ্ছ্বাসের একবিন্দু ধারণা করতে পেলে, মানুষ তখনি দেবতা হয়ে যায়। সর্ব্বভাবের এমন সমন্বয় জগতের ইতিহাসে আর কোথাও কি খুঁজে পাওয়া যায়?—এই থেকেই বোঝ্‌ তিনি কে দেহ ধরে এসেছিলেন। অবতার বল্‌লে, তাঁকে ছোট করা হয়। তিনি যখন তাঁর সন্ন্যাসী ছেলেদের বিশেষভাবে উপদেশ দিতেন, তখন অনেক সময় নিজে উঠে চারদিক খুঁজে দেখ্‌তেন কোন গেরস্ত সেখানে আস্‌ছে কি না। যদি দেখ্‌তেন—কেহ নেই বা আস্‌ছে না, তবেই জ্বলন্ত ভাষায় ত্যাগতপস্যার মহিমা বর্ণন করতেন। সেই সংসার-বৈরাগ্যের প্রবল উদ্দীপনাতেই ত আমরা সংসারত্যাগী উদাসীন।

শিষ্য। গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে তিনি এত প্রভেদ রাখিতেন?

স্বামিজী। তা তাঁর গৃহী ভক্তদেরই জিজ্ঞাসা করে দেখিস্‌ না। বুঝেই ছ্যাখ্‌ না কেন—তাঁর যে সব সন্তান ঈশ্বরলাভের জন্য ঐহিক জীবনের সমস্ত ভোগ ত্যাগ করে পাহাড়ে পর্ব্বতে, তীর্থে আশ্রমে, তপস্যায় দেহপাত কর্‌ছে, তারা

বড়—না, যারা তাঁর সেবা, বন্দনা, স্মরণ, মনন কচ্ছে, অথচ সংসারের মায়া মোহ কাটিয়ে উঠ্‌তে পার্‌ছে না, তারা বড় ? যারা আত্মজ্ঞানে জীবসেবায় জীবনপাত কর্‌তে অগ্রসর, যারা আকুমার উর্দ্ধরেতা, যারা ত্যাগবৈরাগ্যের মূর্ত্তিমান চলদ্বিগ্রহ, তারা বড়—না, যারা মাছির মত একবার ফুলে বসে পরক্ষণেই আবার বিষ্ঠায় বস্‌ছে, তারা বড় ?—এসব নিজেই বুঝে ছাখ্‌।

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, যাঁহারা তাঁহার (ঠাকুরের) কৃপা পাইয়াছেন, তাঁহাদের আবার সংসার কি ? তাঁহারা গৃহে থাকুন বা সন্ন্যাস অবলম্বন করুন, উভয়ই সমান, আমার এইরূপ বলিয়া বোধ হয়।

স্বামিজী। //তাঁর কৃপা যারা পেয়েছে, তাদের মন, বুদ্ধি কিছুতেই আর সংসারে আসক্ত হতে পারে না। কৃপার test (পরীক্ষা) কিন্তু হচ্ছে—কাম-কাঞ্চনে অনাসক্তি। সেটা যদি কারও না হয়ে থাকে তবে সে ঠাকুরের কৃপা কখনই ঠিক ঠিক লাভ করে নাই। //

পূর্ব্ব প্রসঙ্গ এইরূপে শেষ হইলে শিষ্য অন্য কথার অবতারণা করিয়া স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, আপনি যে দেশ বিদেশে এত পরিশ্রম করিয়া গেলেন ইহার ফল কি হইল ?"

স্বামিজী। কি হয়েছে, তার কিছু কিছু মাত্র তোরা দেখ্‌তে পাবি। কালে পৃথিবীকে ঠাকুরের উদার ভাব নিতে হবে, তার সূচনা হয়েছে। এই প্রবল বন্যামুখে সকলকে ভেসে যেতে হবে।

ত্রয়োবিংশ বল্লী

শিষ্য। আপনি ঠাকুরের সম্বন্ধে আরও কিছু বলুন। ঠাকুরের প্রসঙ্গ আপনার মুখে শুনিতে বড় ভাল লাগে।

স্বামিজী। এই ত কত কি দিনরাত শুন্‌ছিস্। তাঁর উপমা তিনিই। তাঁর কি তুলনা আছে রে?

শিষ্য। মহাশয়, আমরা ত তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। আমাদের উপায়?

স্বামিজী। তাঁর সাক্ষাৎ কৃপাপ্রাপ্ত এই সব সাধুদের সঙ্গলাভ ত করেছিস্, তবে আর তাঁকে দেখ্‌লিনি কি করে বল্? তিনি তাঁর ত্যাগী সন্তানদের মধ্যে বিরাজ কর্‌ছেন। তাঁদের সেবা বন্দনা কর্‌লে, কালে তিনি revealed (প্রকাশিত) হবেন। কালে সব দেখ্‌তে পাবি।

শিষ্য। আচ্ছা মহাশয়, আপনি ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত অন্য সকলের কথাই বলেন। আপনার নিজের সম্বন্ধে ঠাকুর যাহা বলিতেন, সে কথা ত কোন দিন কিছু বলেন না?

স্বামিজী। আমার কথা আর কি বল্‌ব? দেখ্‌ছিস্ ত—আমি তাঁর দৈত্যদানার ভিতরকার একটা কেউ হব। তাঁর সামনেই কখন কখন তাঁকে গালমন্দ কর্‌তুম্। তিনি শুনে হাসতেন।

বলিতে বলিতে স্বামিজীর মুখমণ্ডল স্থির গম্ভীর হইল। গঙ্গার দিকে শূন্যমনে চাহিয়া কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল। নৌকাও ক্রমে মঠে পৌঁছিল। স্বামিজী তখন আপন মনে গান ধরিয়াছেন—

"(কেবল) আশার আশা, ভবে আসা, আসামাত্র সার হল।
এখন সন্ধ্যাবেলায় ঘরের ছেলে ঘরে নিয়ে চল।"—ইত্যাদি

গান শুনিয়া শিষ্য স্তম্ভিত হইয়া স্বামিজীর মুখপানে তাকাইয়া রহিল।

গান সমাপ্ত হইলে স্বামিজী বলিলেন, "তোদের বাঙ্গাল-দেশে সুকণ্ঠ গায়ক জন্মায় না। মা গঙ্গার জল পেটে না গেলে সুকণ্ঠ হয় না।"

এইবার ভাড়া চুকাইয়া স্বামিজী নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন এবং জামা খুলিয়া মঠের পশ্চিম বারান্দায় উপবিষ্ট হইলেন। স্বামিজীর গৌরকান্তি এবং গৈরিক বসন সন্ধ্যার দীপালোকে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।

চতুর্ব্বিংশ বল্লী

শেষ দেখা

স্থান—বেলুড় মঠ

বর্ষ—১৯০২

বিষয়

জাতীয় আহার, পোষাক ও আচার পরিত্যাগ দূষণীয়—বিদ্যা সকলের
কট হইতে শিখিতে পারা যায়, কিন্তু যে বিদ্যাশিক্ষায় জাতীয়ত্ব লোপ পায়,
াহার সর্ব্বথা পরিহার কর্ত্তব্য—পরিচ্ছদ সম্বন্ধে শিষ্যের সহিত কথোপকথন—
মিজীর নিকট শিষ্যের ধ্যানৈকাগ্রতা লাভের জন্য প্রার্থনা—স্বামিজীর শিষ্যকে
শীর্ব্বাদ করা—বিদায়।

আজ ১৩ই আষাঢ়। শিষ্য বালি হইতে সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে
ঠ আসিয়াছে। বালিতেই তখন তাহার কর্ম্মস্থান। অদ্য সে
াফিসের পোষাক পরিয়াই আসিয়াছে। উহা পরিবর্ত্তন করিবার
ায় পায় নাই। আসিয়াই স্বামিজীর পাদপদ্মে প্রণত হইয়া
তাঁহার শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করিল। স্বামিজী বলিলেন—
শল আছি। (শিষ্যের পোষাক দেখিয়া) তুই কোট প্যাণ্ট
রস্—কলার পরিস্ নি কেন?" ঐ কথা বলিয়াই নিকটস্থ
মী সারদানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার যে সব কলার
ছে, তা থেকে দুটো কলার একে কাল (প্রাতে) দিস্
" সারদানন্দ স্বামীও স্বামিজীর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া
লেন।

অতঃপর শিষ্য মঠের অন্য এক গৃহে উক্ত পোষাক ছাড়িয়া, হাত মুখ ধুইয়া স্বামিজীর কাছে আসিল। স্বামিজী তখন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আহার, পোষাক ও জাতীয় আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করলে, ক্রমে জাতীয়ত্ব লোপ হয়ে যায়। বিদ্যা সকলের কাছেই শিখ্‌তে পারা যায়। কিন্তু যে বিদ্যালাভে জাতীয়ত্বের লোপ হয়, তাতে উন্নতি হয় না—অধঃপাতের সূচনাই হয়।"

শিষ্য। মহাশয়, আফিস অঞ্চলে এখন সাহেবদের অনুমোদিত পোষাকাদি না পরিলে চলে না।

স্বামিজী। তা কে বারণ কর্‌ছে? আফিস অঞ্চলে কার্য্যানুরোধে ঐরূপ পোষক পরবি বৈ কি। কিন্তু ঘরে গিয়ে ঠিক বাঙ্গালী বাবু হবি। সেই কোঁচা ঝুলান, কামিজ গায়, চাদর কাঁধে। বুঝ্‌লি?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ।

স্বামিজী। তোরা কেবল সার্ট (কামিজ) পরেই এবাড়ী ওবাড়ী যাস্—ওদেশে (পাশ্চাত্যে) ঐরূপ পোষাক পরে লোকের বাড়ী যাওয়া ভারী অভদ্রতা—naked (নেংটো) বলে। সার্টের উপর কোট না পর্‌লে, ভদ্রলোকে বাড়ী ঢুকতেই দেবে না। পোষাকের ব্যাপারে তোরা কি ছাই অনুকরণ কর্‌তেই শিখেছিস! আজকালকার ছেলে-ছোক্‌রারা যে সব পোষাক পরে, তা না এদেশী—না ওদেশী, এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর স্বামিজী গঙ্গার ধারে একটু পদচারণা করিতে লাগিলেন। সঙ্গে কেবলমাত্র শিষ্যই রহিল। শিষ্য সাধন

সম্বন্ধে একটি কথা এখন স্বামিজীকে বলিবে কি না, ভাবিতে লাগিল।

স্বামিজী। কি ভাব্‌ছিস্? বলেই ফেল না। (যেন মনের কথা টের পাইয়াছেন!)

শিষ্য সলজ্জভাবে বলিতে লাগিল, "মহাশয়, ভাবিতেছিলাম যে, আপনি যদি এমন একটা কোন উপায় শিখাইয়া দিতেন, যাহাতে খুব শীঘ্র মন স্থির হইয়া পড়ে—যাহাতে খুব শীঘ্র ধ্যানস্থ হইতে পারি—তবে খুব উপকার হয়। সংসারচক্রে পড়িয়া সাধন ভজনের সময়ে মন স্থির করিতে পারা ভার।"

স্বামিজী শিষ্যের ঐরূপ দীনতা দর্শনে বড়ই সন্তোষ লাভ করিলেন বোধ হইল। প্রত্যুত্তরে তিনি শিষ্যকে সস্নেহে বলিলেন, —"খানিক বাদে আমি উপরে যখন একা থাক্‌ব, তখন তুই যাস্। ঐ বিষয়ে কথাবার্ত্তা হবে এখন।"

শিষ্য আনন্দে অধীর হইয়া, স্বামিজীকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতে লাগিল। স্বামিজী "থাক্ থাক্" বলিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে স্বামিজী উপরে চলিয়া যাইলেন।

শিষ্য ইত্যবসরে নীচে একজন সাধুর সঙ্গে বেদান্তের বিচার ারম্ভ করিয়া দিল এবং ক্রমে দ্বৈতাদ্বৈত মতের বাগ্‌বিতণ্ডায় ঠ কোলাহলময় হইয়া উঠিল। গোলযোগ দেখিয়া শিবানন্দ হারাজ তাহাদের বলিলেন, "ওরে, আস্তে আস্তে বিচার কর্; ামন চীৎকার কর্‌লে স্বামিজীর ধ্যানের ব্যাঘাত হবে।" শিষ্য ' কথা শুনিয়া স্থির হইল এবং বিচার সাঙ্গ করিয়া উপরে ামিজীর কাছে চলিল।

শিষ্য উপরে উঠিয়াই দেখিল, স্বামিজী পশ্চিমাস্তে মেজেতে বসিয়া ধ্যানস্থ হইয়াছেন। মুখ অপূর্ব্বভাবে পূর্ণ, যেন চন্দ্রকান্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ একেবারে স্থির—'যেন "চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে।" স্বামিজীর সেই ধ্যানস্থ মূর্ত্তি দেখিয়া সে অবাক্ হইয়া নিকটেই দাঁড়াইয়া রহিল এবং বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়াও, স্বামিজীর বাহ্য হুঁশের কোন চিহ্ন না দেখিয়া, নিঃশব্দে ঐ স্থানে উপবেশন করিল। আরও অর্দ্ধ ঘণ্টা অতীত হইলে, স্বামিজীর ব্যবহারিক রাজ্যসম্বন্ধীয় জ্ঞানের যেন একটু আভাস দেখা গেল; তাঁহার বদ্ধ পাণিপদ্ম কম্পিত হইতেছে, শিষ্য দেখিতে পাইল। উহার পাঁচ সাত মিনিট বাদেই স্বামিজী চক্ষুরুন্মীলন করিয়া শিষ্যের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "কখন্ এখানে এলি ?"

শিষ্য। এই কতক্ষণ আসিয়াছি।

স্বামিজী। তা বেশ। এক গ্লাস জল নিয়ে আয়।

শিষ্য তাড়াতাড়ি স্বামিজীর জন্য নির্দ্দিষ্ট কুঁজো হইতে জল লইয়া আসিল। স্বামিজী একটু জল পান করিয়া গ্লাসটি শিষ্যকে যথাস্থানে রাখিতে বলিলেন। শিষ্য ঐরূপ করিয়া আসিয়া পুনরায় স্বামিজীর কাছে বসিল।

স্বামিজী। আজ খুব ধ্যান জমেছিল।

শিষ্য। মহাশয়, ধ্যান করিতে বসিলে মন যাহাতে ঐরূপ ডুবিয়া যায়, তাহা আমাকে শিখাইয়া দিন।

স্বামিজী। তোকে সব উপায় ত পূর্ব্বেই বলে দিয়েছি, প্রত্যহ সেই প্রকার ধ্যান কর্‌বি। কালে টের পাবি। আচ্ছা, বল দেখি, তোর কি ভাল লাগে ?